মাড়োয়ারী মোজেইক

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

প্রাইমা পাবলিকেশন্‌স
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭

প্রকাশক : উপমা সেনগুপ্ত
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৭৭

প্রচ্ছদ : আশিস ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর :
সরস্বতী প্রেস
১২, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

সেই বিরল সাহিত্য-প্রতিভা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

যিনি আমাকে অনুজ হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন
তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

এবং

যিনি গ্রন্থখানি রচনায় সহায়তা ও প্রতিবন্ধকতা—দুই-ই করেছিলেন, আমার সহধর্মিণী—

শ্রীমতী সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়কে

গৌরচন্দ্রিকা : রবীন্দ্রনাথ একজনকে অটোগ্রাফ দিয়েছিলেন :

জীবনখাতার অনেক পাতাই এমনিতরো শূন্য থাকে,
আপন মনের ধেয়ান দিয়ে পূর্ণ করে নেও না তাকে।

মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের অ্যানাট্যামি বর্ণনায় এই ঋষি-বাক্যটিই বারবার মনে এসেছে। তবুও কিন্তু মোজেইক (সঠিক উচ্চারণ নাকি ম্যাজেই-ইক) জমাবার প্রচেষ্টা করেছি মূলত ভূয়োদর্শনের ভিত্তিতে। 'আপন মনের ধেয়ান' যেটুকু আছে তা পুরোপুরি না হলেও মোটামুটি ইতিহাসভিত্তিক।

আমি মাড়োয়ারীদের, বিশেষ করে কলকাতার মাড়োয়ারীদের, সঙ্গে দীর্ঘকাল মিশেছি এবং অনেকের সঙ্গেই অন্তরঙ্গভাবে। ওঁদের আমি পর্যবেক্ষণ করেছি বিভিন্ন অবস্থানক্ষেত্র থেকে—কখনো পড়শীর, কখনো গৃহশিক্ষকের, কখনো পারিবারিক বন্ধুর, কখনো তথাকথিত অর্থনৈতিক উপদেষ্টার, কখনো বা কোম্পানী ডিরেক্টরের। এই মোজেইক সেই ভূয়োদর্শিতারই প্রতিবিম্বন। মাঝে মাঝে অবশ্য পরদ্রব্য-শ্রুতিকেও উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছি—মোজেইক মানেই যে 'নানা রঙে বোনা'।

মূল প্রেক্ষাপট তিনশ' বছরের বৈশ্য ঘরানার শহর কলকাতা হলেও মাড়োয়ারী ঈথসের সঙ্গে আমার মুলাকাত হয়েছে অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও—বারাণসীতে, পুরীতে, সিমলায়, আসাম ও ডুয়ার্সের দুই চা-বাগানে নয়া দিল্লীতে এবং কলকাতার কাছাকাছি দে-গঙ্গায়।

অধিকাংশ স্থানে আসল নাম ব্যবহার করলেও কোন কোন জায়গায় নাম পালটিয়েও দিয়েছি, আবার অনেক ক্ষেত্রে নাম-পরিচয় উহ্যও রেখেছি।—বলতে পারেন ঝামেলাঝঞ্ঝাটের ভয়ে।

রচনা-শৈলীকে বোধহয় বৈঠকী গল্পের পর্যায়ে ফেলা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভাষায়, "হাসির সুরে হালকা গভীর সব কথা বলাই হ'ল বৈঠকী গল্পের সবচেয়ে বড় বাহাদুরি।" এই বাহাদুরি কতটা দেখাতে পেরেছি তা জানি না তবে যে বৈঠকী গল্পের শৈলী অনুসরণ করতেই প্রয়াসী হয়েছি, মনে করি। আবার রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলতে পারি, আপনি হেসে ঠাট্টা করে নিজের কথাটা ওড়াবার প্রচেষ্টাই করে গেছি।

তবে এই মোজেইক রচনায় ব্যান্টার থাকলেও বিদ্বেষ নেই, ফাঁক থাকলেও ফাঁকি দেবার চেষ্টা করিনি—মাড়োয়ারীদের আমি যেভাবে এবং যতটা দেখেছি সেইভাবে এবং ততটাই প্রকৃত জীবনীকারের মত—সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে এই মোজেইক বোনার প্রচেষ্টা করেছি।

এই প্রসঙ্গে ভাষার প্রশ্নও এসে পড়ে। বাস্তববাদিতার দাবি হলো ভাষার রদবদল যথাসম্ভব পরিহার করা। এই ব্যাপারে আমি বিশেষ অসুবিধাতেই পড়েছিলাম। কারণ, হিন্দি ভাষাতে আমার দখল মোটেই গর্বের বস্তু নয়,

আর মাড়োয়ারী বা মাউড়ী ভাষায় দখল আরও কম। তাই যে-রকম শুনেছি তাই উদ্ধৃত করবার দিকেই লক্ষ্য রেখেছি। তবুও কিন্তু ভুলভ্রান্তি—অসঙ্গতি থেকে গেছে। কারণ, আর সবাই-এর মত মাড়োয়ারীদের ক্ষেত্রেও কথ্য ভাষা ও সাধু ভাষা এক নয়। আমি কথ্য ভাষাই উদ্ধৃত করেছি, সাধুজনের ভাষার দিকে দৃক্পাতও করিনি। আবার কথ্য ভাষাও যে সাধুতার সঙ্গে অনুসরণ করতে পেরেছি তাও মনে হয় না—যেমন শব্দগুলো আলাদা হবে, না জুড়ে হবে সে ব্যাপারে নিয়মিত হতে পারিনি।

ভাষার প্রশ্নে সেই বহুবিদিত ঘটনাটি মনে পড়ছে : ঘোড়াগাড়ি থেকে ইংরেজ জেলা-শাসকের পত্নী নেমেছেন ছাতা হাতে নিয়ে। বাংলোয় ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের বাঙালী সহকারী পাশে দাঁড়ানো আরদালিকে নির্দেশ দিলেন : মেমসাহেবকো ছাতি পাকড়ো।

শুনে মেমসাহেব আঁতকে উঠেছিলেন কিনা তার বিবরণ নেই—ঘটনাটি এখানেই সমাপ্ত বলে জানি।

আমার হিন্দী বা মাউড়ীতে এরকম আঁতকে ওঠবার মত বোধহয় কিছু নেই। থাকলে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বাধিত হব। এবং পরবর্তী সংস্করণে (পরবর্তী সংস্করণ যদি হয়) তা শোধরাবার চেষ্টা করব।

বইখানি প্রকাশের ব্যাপারে আমি ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রকাশক শ্রীনারায়ণ সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী উপমা সেনগুপ্তর কাছে কৃতজ্ঞ এই কারণে যে, তাঁরা এই পরীক্ষামূলক গ্রন্থপ্রকাশে আগ্রহী হয়েছিলেন—এতো গল্প-উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী বা প্রচলিত অর্থে রম্য রচনা নয়। তবে বইখানা কোন্ শ্রেণীভুক্ত? উত্তরে আবার রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে পারি, 'তোমরা যা বলো তাই বলো'।

কথামুখ ঃ ভদ্রলোকের সঙ্গে কলাকার স্ট্রিটে এসেছিলাম সকাল ৯টা নাগাদ। ওঁরা বলেন কালাকার স্ট্রিট। বর্তমান নাম অবশ্য স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিট। অনেকদিন আগে ঐ ছাপ্পান্ন নম্বর বাড়িতেই একখানা চিঠি এসেছিল। ঠিকানা ছিল 56 Artiste Street, Calcutta। তখন পোস্টাল জোনের প্রবর্তন হয়নি। চিঠিখানা কিন্তু ঠিকই পৌঁছেছিল ঠিকানায়। ডাক-বিভাগের যে কর্মীর হাতে চিঠিখানা পড়েছিল তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংগ-দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তি কলাকারের ইংরেজী artiste শব্দটি ব্যবহার ক'রে ঠিকানা লিখেছেন। তাই চিঠিটা ডেড-লেটার অফিসের পরিবর্তে যথাস্থানেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে আর কোন বিভ্রান্তি না ঘটে তার জন্যে লালকালিতে এবং ইংরেজীতে কলাকার শব্দটি লিখেও দিয়েছিলেন।

কলাকার স্ট্রিট এসেছিলাম ভদ্রলোকের সঙ্গী হিসেবে। ভদ্রলোক একজন মাড়োয়ারী এবং আমার একরকম আধা বা আংশিক সময়ের নিয়োগকর্তা। পদবি মাধোপুরিয়াজী। তিনি এসেছিলেন ব্যাঙ্ককে তাঁদের কলাকার স্ট্রিটের একসময়ের বাড়ির অবশিষ্ট ঘরটির দখল দিতে। বাকী অংশের দখল ব্যাঙ্কেরই ছিল। প্রথমে ভাড়া নিয়ে ব্যাঙ্ক সেখানে একটি শাখা চালাচ্ছিল। ভাড়ার চুক্তির সময় ঐ একখানা ঘর মাধোপুরিয়াজী নিজেদের জন্যে রেখে দিয়েছিলেন। কিছু কাগজপত্র সেখানে ছিল, টেলিফোনও ছিল। হয়ত তাঁদের ইচ্ছে ছিল ঐ ঘরখানা থেকে কিছু কাজকারবার করবার। তা আর বিশেষ সম্ভব হয়নি, বোধহয় দরকারও হয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্ককেই সমস্ত বাড়িটা বেচে দিলেন। আজ ঐ বাকী ঘরটা দখল দেওয়ার দিন।

মাধোপুরিয়াজী নিজেই এসেছিলেন ঐসব কাগজপত্রের মধ্যে দরকারী যদি কিছু এবং যা-কিছু থাকে তা বেছে নেবার তদারকি করতে।—কর্মচারীরা ঐ-কাজ ঠিকমত পারবে না। আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন যদি এ-ব্যাপারে আমার সহায়তা লাগে তার জন্যে।

তিন-চারজন কর্মচারীর সাহায্যে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কাগজপত্র বাছাবাছি শেষ হ'ল। প্রত্যাবর্তনের জন্য আমরা গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাধোপুরিয়াজী একরকম স্বগতোক্তি করলেন: দাদাজী নে বানায়া, আভি সরকারকো!...

স্বগতোক্তির অর্থ বুঝলাম কিন্তু তাৎপর্য বুঝলাম না। ঠাকুরদার তৈরি বাড়ি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে বেচে তাঁর যে স্বগতোক্তি স্ফুরিত হল তা কি খেদ-ক্ষোভের প্রকাশ, না ব্যঞ্জনাবিহীন অভিব্যক্তি মাত্র—বুঝতে পারলাম না। অধিগ্রহণ বা হস্তান্তর কোনটাতেই মাড়োয়ারীদের বিশেষ ভাবান্তর ঘটে না, যদি অবশ্য বিনিময়ে নাফা থাকে। মাটির টান, ভিটের টান ইত্যাদি হ'ল সামন্ততান্ত্রিক সেন্টিমেণ্ট, বণিক-ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে তার অনস্তিত্বই লক্ষ্য করা যায়।

গাড়িতে বাকী সময়টা মাধোপুরিয়াজী চুপচাপই ছিলেন, আমিও কথাবলার চেষ্টা করিনি। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা—সেই অতীত দিনের কথা।...

পদসঞ্চার: ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঠিক আগের কথা। বড়লাট লর্ড ডালহৌসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলকে ডেস্প্যাচ্ পাঠালেন: বিভিন্ন কারণে ভারতে রেলপথ স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত। প্রথমত, এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বন্দরে কাঁচামাল নিয়ে যাবার সুবিধে হবে। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ পণ্যও সহজে এ-দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছুবে। তৃতীয়ত, রাজধানী কলকাতা থেকে সমগ্র ব্রিটিশ ভারত শাসন করাও সহজ হবে। চতুর্থত, সমগ্র উপমহাদেশে কোম্পানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আরও সুযোগ ঘটবে।

বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল ডালহৌসীর প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। স্থাপন করা হ'তে লাগল ভারতে রেলপথ। পূর্ব ও উত্তর ভারতে এক লম্বা রেলপথ তৈরি হ'ল—কলকাতা থেকে গাজিয়াবাদ। নাম দেওয়া হ'ল ই. আই. আর.—ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে। এই রেলপথেই সোয়াই-

মাধোপুর থেকে একদিন কলকাতায় এসে হাজির হ'লেন দুই ভাই—রামকুমার ও শ্রীকুমার মাধোপুরিয়া।

হাওড়া স্টেশনে নেমে মাধোপুরিয়া ভ্রাতৃদ্বয় ঘাটে লোটাকম্বল রেখে গঙ্গাজীতে স্নান করলেন। স্নানান্তে সেখানেই প্রেমসে ভজন। তারপর কিছু ভোজন—হয়ত কিংবদন্তী অনুসারে ছাতু ও কাঁচালংকা, যা তাঁরা গামছায় বেঁধে দেশ থেকে যাত্রা করেছিলেন। ইতিমধ্যে কাঁচালংকা নিশ্চয়ই কিছুটা শুকিয়ে গিয়েছিল।

তখনও পনটুন ব্রিজ তৈরি হয়নি। তাই তাঁরা খেয়ায় গঙ্গা পার হয়ে কলকাতা পৌছে দেশওয়ালী ভেইয়ার ঠিকানা খুঁজে বড়বাজারের কাছাকাছি নেবুতলায় গিয়ে পৌছুলেন।

দেশওয়ালী ভেইয়া রামকুমারজী ও শ্রীকুমারজীকে খাতির করে রাখলেন। মাড়োয়ারীদের মধ্যে গোষ্ঠীপ্রীতি যে বিশেষ প্রবল!

কয়েকদিনের মধ্যেই দেশওয়ালীই ধান্ধার ঘুঁতঘাঁত শিখিয়ে দিলেন। দু'ভাই-ই শুরু করলেন দালালি। একজন কাপড়ার, আর একজন মশল্লাকা।

তারপর একদিন দেখা গেল রাজাকাটরায় একজনের কাপড়ের দোকান, পোস্তায় অপরজনের মশলার। মাধোপুর থেকে দু'ভাই-এরই পরিবারও কলকাতা চলে এল।

বড়ভাই রামকুমারের পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি গোদ (দত্তক) নিলেন ছোটভাই শ্রীকুমারের জ্যেষ্ঠপুত্রকে (জ্যেষ্ঠপুত্রকে গোদ নেওয়া প্রথাসম্মত, এমনকি মাড়োয়ারীদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিতও বলা চলে)।

দু'ভাইয়ের পরবর্তী পুরুষ কিনলেন যথাক্রমে নেবুতলা ও কলাকার স্ট্রিটের জমি। বাড়ি তৈরি হ'ল তার পরবর্তী পুরুষে। একই পিতার দুই পুত্র দুটি আলাদা আলাদা পরিবারের 'কর্তা' হয়ে দুটি আলাদা বংশ প্রতিষ্ঠা করলেন, অবশ্য রয়ে গেলেন একই বংশোদ্ভূত—স্ব-গোত্রীয়। দু'জনেরই পদবি মাধোপুরিয়া।

ইতিহাসের একখানা পৃষ্ঠা হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল: নবাব সিরাজদৌলা ও তাঁর পূর্বপুরুষদের ধনাগারপতি ও উত্তমর্ণ-প্রধান জগৎ

শেঠ—জগতের শেঠ বা শ্রেষ্ঠ। ঐতিহাসিক লিখেছেন: জগৎ শেঠ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, পারিবারিক পদবি বা উপাধি। বংশ-পরম্পরায় মুর্শিদাবাদ নবাবদের ধনাগারপতি ও রাজ্যের মহাজনদের মধ্যে প্রধান ঐ পদবিটি ব্যবহার করতেন। পদবিটি আবার নবাবের দেওয়া নয়, মোঘল দরবার থেকে পাওয়া। জগৎ শেঠরা রাজপুতানা থেকে এসেছিলেন।

ঐতিহাসিকের আরও বিবরণ হ'ল যে, মুর্শিদাবাদে বিভিন্ন দেশের বণিকরা ব্যবসা করত—আর্মানি, উজ্জিনিয়া (উজ্জয়িনী থেকে আগত), মাড়োয়ারী প্রভৃতি। ইংরেজ শাসন কায়েম হবার পর সুবে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হ'লে এঁদের অনেকেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে কলকাতায় এসে খুঁটি গেড়েছিলেন।

তাহলে ত' সব মাড়োয়ারী রামকুমার-শ্রীকুমারের মত লর্ড ডালহৌসীর উদ্যোগে নির্মিত রেলপথে রাজপুতানা থেকে কলকাতায় আসেননি—এসেছিলেন অনেক আগেই—নৌকো চড়ে, হাঁটাপথে, আর তাদের শামিল হয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের স্বজাতীয় বণিকরা! সবারই বর্গনাম মাড়োয়ারী—ওঁরা নিজেরা বলেন, মাড়বারী। মাড়োয়ারী ভাষায় এবং হিন্দিতেও 'ও' হ'ল 'ব'।

বিস্তারণ: কলাকার স্ট্রিট পেরিয়ে বিবেকানন্দ রোড হয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দিয়ে আসছিলাম। ফায়ার ব্রিগেড পেরোতেই মাধোপুরিয়াজী ড্রাইভারকে বললেন: অফিস যায়ুংগা।—ড্রাইভার যথাসময়ে টেরিটি-বাজারের পথ ধরল। মাধোপুরিয়াজীর অফিস বি. বা. দী. বাগে—উনি তিনটে লিমিটেড কোম্পানির কর্ণধার। বর্তমান বাসস্থান হ'ল আলিপুর—অতি অভিজাতদের আস্তানা। তবে সেখান থেকে প্রাচীন সামন্ত-তান্ত্রিক আভিজাত্য বিদায় নিচ্ছে, এবং তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে বুর্জোয়া আধুনিক জীবনধারা।

গাড়ি থেকে নামবার সময় মাধোপুরিয়াজী আমাকে বললেন, We meet again this evening—trust you are coming there, Professor.

মনে পড়ল সল্টলেকে সন্ধ্যায় ওঁর মুনিমের বাড়িতে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে অনুষ্ঠান—অর্থাৎ পার্টি। অবশ্যই যাওয়া উচিত। বললাম, Of course.

I will then send you a car,—আশ্বাস দিলেন মাধোপুরিয়াজী।

ড্রাইভারকে আমায় বাড়ি পৌঁছে দিতে নির্দেশ দিয়ে অফিসের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন মাধোপুরিয়াজী।

সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সময়ে অন্য এক ড্রাইভার অন্য এক গাড়ি নিয়ে এসেছিল। ফেরার সময়ও গাড়ি তৈরি ছিল। মাড়োয়ারীদের ড্রাইভাররা সাধারণত মনিব জাতীয়দের সামনে মুখ খোলে না। কিন্তু এই কারণেই হয়ত মনের মত লোক পেলে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। এই ড্রাইভারের বোধহয় সেই ভাবান্তরই ঘটেছিল। গাড়িতে ওঠার পর সে আমাকে বললে: প্রফেসার সাহাব। আপ এতনা তুরন্ত নিকাল আয়ে!

তুরন্ত আবার কোথায়—অনেকক্ষণই ত ছিলাম! বললাম: কেঁও! আট বাজ গিয়া, পারটিভি খতম হো চুকা।

এইবার ড্রাইভার একটু হেসে বলল: নেহি জী। আসলি মজা আব শুরু হোগা।

—আসলি মজা! মতলব?

এবার সে আরও বেশি হাসির সঙ্গে একবার পেছনে আমার দিকে মুখ ফেরাল এবং তারপর বলল: সরাব আওর কোক্‌শ্রাস্ত্রকা পিকচার···

একটু চমকে না উঠে পারলাম না—মদ্যপান ও ব্লু-ফিল্ম। জিজ্ঞাসা করলাম: তুমহে কেইসে মালুম?

—ম্যয় নে শুনা থা। উসকে আলাবা রূপ সিং ভি আ গিয়া। আপ উসকো জানতে নেহি?

রূপ সিং এসেছে দেখেছিলাম আর তাকে চিনতামও। ধারণা ছিল রূপ সিং বিলিতি চোরাই মদ ও বিদেশী অশ্লীল সাহিত্যের কারবারী, কিন্তু তার সঙ্গে যে ব্লু-ফিল্মও যোগ করেছে তা জানতাম না।···আর একটা কারণেও বিস্ময় খানিকটা রয়ে গেল এবং তা প্রকাশ না করে

পারলাম না : মুনিমজীকা ঘরমে এইসি কামকাজ !···

ড্রাইভার আমার বিস্ময়ের প্রতিবাদই করল : কৌন আপকো বোলা হ্যায় কি ইয়ে মুনিমজীকা কোঠি ?

—তব ?

তব-এর উত্তর না দিয়ে ড্রাইভার বলল : ম্যয় নে শুনা থা এহি কোঠিমে এক গেস্ট হাউস বনেগা কম্প্‌নিকা। মুনিম-উনিম সব ঝুট। বড়াবাজার ছোড়কে মুনিমজী হিয়াঁ থোড়ি না আয়গা। আসলি বাত ইয়ে হ্যায় কি মজা লুঠনেকো লিয়ে ইয়ে মাকান লিয়া।···

অনুসন্ধিৎসাকে আর প্রশ্রয় দিলাম না। হঠাৎ মনে হ'ল অপরের ড্রাইভারের সঙ্গে কেচ্ছার আলোচনা আমার পক্ষে যেন মর্যাদাহানিকর। এই জনগণতান্ত্রিক যুগেও এ-ব্যাপারে একটা ব্যবধান থাকা উচিত। তখন বলেই ফেললাম : ছোড়ো সব গন্ধী বাৎ। ড্রাইভার একটু যেন অবাক হয়ে গেল কিন্তু চুপ করেই রইল। আমি অবশ্য তার সব কথাই বিশ্বাস করলাম। অভিজাত মাড়োয়ারী সমাজে সরাব ত বটেই, অশ্লীল সাহিত্য ও ব্লু-ফিল্ম জেঁকে বসেছে। আর তার বিস্তারও ঘটছে অপেক্ষাকৃত অভাজনদের মধ্যে। অপরদিকে বসতি-বিস্তারণও চলেছে ব্যাপকভাবে—বড়বাজার থেকে আলিপুর, আলিপুর থেকে লেকটাউন, সল্টলেক। সল্টলেক আরও সমৃদ্ধ হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা না-হচ্ছে বাগানবাড়ির ব্যবস্থা ওখানেই থাক না ; ফুর্তি করার জন্য কিছুটা নির্জনতা অবশ্যই দরকার !

যাঁরা সল্টলেকে যেতে চান না বা সেখানে জায়গা পান না তাঁরা ঠাকুরপুকুর বারাসাত দত্তপুকুরের দিকে ঝুঁকেছেন। ওখানেও উইক-এণ্ড কাটাবার জন্যে কান্ট্রি-হাউস নন্দ নয় !

দর্শনে বলে গতিই জীবন। মাড়োয়ারীদের জীবনদর্শনের মূলকথা হল আহরণ ও বিস্তারণ। বিস্তারণ শব্দটি হয়ত ব্যাকরণসম্মত নয়, কিন্তু মাড়োয়ারীদের জীবনদর্শনের প্রতিফলন এই শব্দটির মধ্যেই সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এদিক থেকে তাঁরা দিগ্বিজয়কারীদেরই গোষ্ঠীভুক্ত।

নাম-পরিচয় : শরতের এক অপরাহ্নে চারজনের দলটি তল্পিতল্পা নিয়ে নৌকা থেকে বাবুঘাটে নামল। তারা এসেছিল বারাণসী থেকে। মুলুক থেকে বারাণসী পর্যন্ত উটের পিঠে ও পদব্রজে। বাবুঘাটে নেমে তারা এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। সামনে দিয়ে যাচ্ছিল দুজন গোরা সৈনিক। তারা বোধহয় বায়ু-সেবনে বেরিয়েছিল। চারজনের মধ্যে একজন সাহস করে এগিয়ে এসে গোরাদের জিজ্ঞাসা করল : বাঁশতলা কিধার কাম্‌পানি সাহাব ? ময় হুঁয়া যায়ু।

কাম্‌পানি সাহাব মানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেব। ঠিক বুঝতে না পেরে সাহেবদের একজন প্রতিপ্রশ্ন করল : Which place did you say ? এবার সেই আগন্তুক ভাবলে সাহেব বুঝি জিজ্ঞারা করছে কোথা থেকে আসছ। উত্তর দিল : মাড়বার সে কাম্‌পানি সাহাব।— Marbar ! Where is it ?—এই ছিল গোরা সাহেবের এবারের জিজ্ঞাসা। প্রশ্নটির উত্তরে লোকটি এবার বলল : হামলোগ সব মাড়বার রয়নেওয়ালা—হামলোগ সব মাড়বারী।

এইভাবেই বোধহয় মাড়োয়ারী বা মাড়বারী শব্দটির উৎপত্তি। দলটি এসেছিল মাড়বার থেকে কলকাতায় ভাগ্যান্বেষণে। তখন সমগ্র যোধপুরের বিকল্প নাম ছিল মাড়বার। আকবরের সময় থেকে মাড়বার-রাজ ছিলেন মোঘল সম্রাটদের অতি অন্তরঙ্গ। মাড়বার রাজকুমারী যোধাবাই ছিলেন আকবরের প্রধানা বেগম। বর্তমানে মাড়োয়ার বা রাজস্থানী ভাষায় মাড়বার একটা বড় রেল-জংশন মাত্র। মাড়োয়ার থেকে এসেছিল তাই নাম হয়ে গেল মাড়োয়ারী, যেমন পেশোয়ার থেকে আগতদের বলা হয় পেশোয়ারী অথবা আফগান দেশের যে-ই এল সে-ই রাজধানী কাবুলের নামানুসারে আখ্যা পেল কাবুলিওয়ালা বলে। হয়ত জগৎ শেঠের বংশও মুর্শিদাবাদে এসেছিল যোধপুর বা মাড়বার থেকে এবং তখন থেকেই মাড়োয়ারী শব্দটির পরিচিতি।

না, ঠিক জানা যায় না। তবে বর্গনাম বা জেনেরিক নাম হিসেবে মাড়োয়ারী যে ভুল তাতে সন্দেহ নেই। বাঙালী ওড়িয়া অসমীয়া মারাঠি গুজরাটি বললে কাকে বা কাদের বোঝান হচ্ছে তা অনুমান করতে দেরী

হয় না, কিন্তু মাড়োয়ারী বলতে রাজওয়াড়ার দেশের কোন অঞ্চলের লোক তা' সনাক্ত করা যায় কি? জয়পুর না মেবার, যোধপুর না বিকানীর, সোয়াই-মাধোপুর না ডুংগরগড়, না ক্ষেত্রী-র? বর্তমানের এবং টড্ সাহেবের বর্ণনা অনুসারে এঁরা সবাই রাজস্থানী।

তবুও মাড়োয়ারী শব্দটিই বেশি পরিচিত। প্রথম প্রথম যাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন তাঁরা মাড়োয়ারী অভিধাটিকেই মেনে নিয়েছিলেন। তাই নাম দিয়েছিলেন, মাড়োয়ারী হাসপাতাল (বর্তমান নাম বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মাড়োয়ারী হাসপাতাল), মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি, মাড়োয়ারী চেম্বার অফ কমার্স (বর্তমান নাম ভারত চেম্বার অফ কমার্স), মাড়োয়ারী বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি। অনেকে পদবি হিসেবেই বর্গনাম মাড়োয়ারী গ্রহণ করেছেন।

মেড়ুয়া, মেড়ো (পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় মাউড়া) প্রভৃতি শব্দ বোধহয় এই মাড়োয়ারীরই অপভ্রংশ। পরশুরাম তাঁর 'চিকিৎসা সংকটে' এই তুচ্ছার্থক অর্থেই 'মেড়ো' শব্দটি ব্যবহার করেছেন—'ব্যাটা মেড়োর পেটে হাত বুলিয়ে খায়'।

ভাষা: মাড়োয়ারীদের স্থানিক ভাষাও মাড়োয়ারী আখ্যা পেয়েছে। আয়কর বিভাগে মাড়োয়ারীদের ভাষা বিকৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে মাড়োয়া বা মাওড়ীতে। আয়কর অফিসারদের অনেক ক্ষেত্রেই এই মাওড়ী ভাষা শিখতে হয়, যদিও তা সংবিধানের অষ্টম তপশীলের ১৫টি ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। শিখতে হয় এই কারণে যে মাওড়ী ব্যবসায়ীদের ভাষা—এক বিরাট ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এই ভাষাতেই হিসাবপত্র রাখেন। স্মর্তব্য যে ইংরেজীও অষ্টম তপশীলভুক্ত নয়।

মাড়োয়ারীরা মাওড়ী ছাড়াও সমানভাবে হিন্দি ব্যবহার করেন, আর উচ্চশ্রেণীর মাড়োয়ারীদের মধ্যে ইংরেজী তো আছেই। সম্প্রতি ইংরেজীর দিকে তাঁদের ঝোঁক বিশেষ বেড়ে গেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণ কমেছে মাওড়ী ও হিন্দির প্রতি। প্রখ্যাত নোপানী পরিবারের একটি ছেলেকে অনুরোধ করেছিলাম আমাকে কয়েকটি মাড়োয়া বা মাওড়ী শব্দ দিয়ে সাহায্য করতে। সে যে অসমর্থ তা জানিয়েছিল এই

বলে : I have not even nodding acquaintance with the dialect, Sir. *But if you require them badly, my father* may help you.

ছেলেটির বাবা ঠিক সে যুগের না হলেও আগের যুগের লোক—যখন অভিজাত মাড়োয়ারীরা মাওড়াও শিখতেন, হিন্দিও শিখতেন। এখন ঐসব ঘরের মাড়োয়ারী ছেলেমেয়েরা পড়ে প্রধানত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। সেখানে দায়ে পড়ে হিন্দিটা শিখতে হয় এবং শেখার জন্য রাখতে হয় গৃহশিক্ষক। ইংরেজীর জন্যে গৃহশিক্ষকের ততটা প্রয়োজন হয় না।

আগের যুগের সব মাড়োয়ারীই কিছু কিছু বাংলা শিখতেন। কারণ, তাঁদের বাঙালীদের সঙ্গে এবং বাঙালীদের মাধ্যমেই সাহেবদের সঙ্গে ব্যবসা করতে হ'ত। তাঁদের কেউ কেউ হেয়ার-হিন্দু স্কুলেও পড়তেন: এখন হেয়ার-হিন্দুর দিকে ঝোঁক একদম নেই। কারণ, ওসব জায়গায় বাংলা-মিডিয়াম।

এখনও অবশ্য তাঁদের অনেকে বাংলা বলতে শেখেন, ঠিক বাংলা শেখেন তা বলা যায় না। তাঁদের বাংলা বলা শিখতে হয়, কারণ তাঁরা ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীর কাছে খরিদ্দার প্রভুর সমান। প্রভুর ভাষা শিখতে হয় বৈকি!

অবশ্য মাড়োয়ারীরা যখন বাংলা শেখেন তখন তাঁরা আর সবাইকেই পেছনে ফেলে এগিয়ে যান—বাঙালীদের সঙ্গে সমতালে বাংলা বলেন। শুধু বাংলা নয়, উড়িষ্যায় ওড়িয়া, আসামে অসমীয়া, গুজরাটে গুজরাটি, এমন কি দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে ওঁরা এত সহজে নেপালী ভাষা আয়ত্ত করেন যে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। নাগাভূমিতেও ওঁদের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে স্থানিক ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে শুনেছি।

ব্যবসায়ীরা ছাড়াও অবাঙালীর মুখনিঃসৃত বলে ধরা যাবে না এমন বাংলা বলে থাকেন বাঙালী পাড়ার অনেকদিন ধরে বসবাসকারী মাড়োয়ারীরা, বিশেষ করে তাঁদের ছেলেমেয়েরা। দেগঙ্গার একটা জায়গায় পিকনিকে গিয়েছিলাম। সেই পিকনিক স্পটে আরও দু'তিনটি দল পিকনিক করতে এসেছিল। একটি দল থেকে চার-পাঁচটি মেয়ে

আমাদের কাছে এল আলাপ করতে। আলাপ হ'ল। শুনলাম ওরা এসেছে ভবানীপুর থেকে, কয়েকটি পরিবার একসঙ্গে। দুটি মেয়ে পড়ে হাজরা রোডের ন্যাশনাল হাই স্কুলে, অন্য তিনটি মেয়ে যোগমায়া দেবী কলেজে।

তখনও কিছু বুঝতে পারিনি—সোজা বাংলায় আলাপ, বাঙালী বলেই ধরেছিলাম। এমন সময় দূর থেকে তাদেরই একজন কেউ ডাকলেন: গুড়িয়া! তুম লোক ইধার আও।—মেয়েগুলো প্রস্থানের উদ্যোগ করল। একজনকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার নাম? মেয়েটি উত্তর দিল: অপর্ণা শিগাতিয়া।

—শিগাতিয়া! তবে তোমরা···

—হ্যাঁ, আমরা সবাই মাড়োয়ারী।

অবাক হলাম কিন্তু জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না: এত ভাল বাংলা শিখলে কি করে?

সহজ ও সংক্ষিপ্ত উত্তরই পেলাম: কেন, এতদিন বাঙালী পাড়ায় আছি বলে।

না ভেবে পারলাম না, অবাঙালী পাড়ায় থাকলে আমরা কি এত সহজে এবং পারদর্শিতার সঙ্গে তাদের ভাষা আয়ত্ত করতে পারি? এত-দিন ত মাড়োয়ারীদের সঙ্গে মিশছি, হিন্দি কি ভালভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছি, মাড়োয়ারী তো দূরের কথা!

ভবানীপুর থেকে আগত ঐ পিকনিক পার্টির মেয়েরা কেউ পড়ে ন্যাশনাল হাই স্কুলে, কেউ বা কোন বাঙালী স্কুলে। অভিজাত মাড়োয়ারী-দের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের এই রকম স্কুলে পাঠানর কথা কল্পনাই করা যায় না। শুধু নামে ইংলিশ-মিডিয়াম হলেই চলবে না, সাহেবী গন্ধও থাকা চাই। এদিক দিয়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্কুলগুলোই কাম্য। তবে মেয়েদের জন্যে মডার্ন হাই স্কুল চলতে পারে। বিড়লা-পরিচালিত হলেও তা' সাহেবী গন্ধে ভরপুর।

কলকাতায় যদি সুবিধে না হয় তবে তাঁরা ছেলেমেয়েদের পাঠান কোন শৈলশহরের আবাসিক স্কুলে। রাজস্থানের বনস্থলী বালিকা

বিদ্যালয়ের প্রতিও খানিকটা ঝোঁক দেখা যায়। তবে তার চেয়ে দার্জিলিং লরেটো বা কার্শিয়াং ডাওহিল স্কুলের আকর্ষণ তাঁদের কাছে বেশি। বনস্থলীতে হয়ত সবকিছু শিখবে কিন্তু ইংরেজী উচ্চারণ ও আদবকায়দা ততটা চোস্ত হবে না।

ছেলেদের জন্যে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া স্কুলের প্রতি একটা আকর্ষণ আছে, তবে তা কলকাতার কোন ভাল ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে বা কোন শৈলসহরের স্কুলে ঢুকতে না পারলে। ডুন স্কুলের একটা নামডাক আছে সত্যি, সেখানকার বিশেষ বাণিজ্যিক ঐতিহ্য নেই—অর্থাৎ ঐ বিদ্যালয় থেকে খুব বড় একটা সংখ্যায় শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা বেরিয়ে আসেননি। তবে ডুনের ছাপ চলতে পারে।

পদবি-পরিচয়ঃ আমার পাশে ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের সামনে বসেছিল এক তরুণ বাঙালী কর্মচারী। ঘন্টি বেজে উঠতে সেই ফোন ধরেছিল। 'হ্যাল্লো' বলার আগেই ওদিক থেকে শোনা গেল : হেলো, ডাবরিওয়াল্লা-বাবু···তারপর তরুণটি রিসিভার কানে লাগানোতে আর কিছু সুস্পষ্ট-ভাবে শুনতে পেলাম না, তবে বুঝতে পারলাম উত্তেজিত সংলাপ চলছে।

তরুণটি জিজ্ঞাসা করেছিল : কোন রাবরিওয়ালা ?

উত্তরে কান ও রিসিভারের ফাঁক দিয়ে কর্ণভেদী প্রতিবাদ বেরিয়ে এল : রাবরিওয়ালা নেহি, ডাবরিওয়াল্লাবাবু···আপকা বেংককা··· সংলাপের আর কিছু শোনা গেল না।

ম্যানেজার নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আঁচ করেছিলেন। তাড়াতাড়ি রিসি-ভারটা তরুণের কাছ থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে বললেন : Yes, Mr. Dabriwal ! So nice to hear your voice.

ওধার থেকে আবার সেই কর্কশ কণ্ঠস্বর, যার দরুণ ম্যানেজার সাহেব রিসিভারটা কান থেকে দূরে সরিয়ে নিলেন, ওধারের বক্তব্য আমারও শ্রুতিগোচর হল : ম্যয় অপারেটর হুঁ ! লাইন রাখ্খিয়ে, বাবুসে বাদ করাতা হ্যায়।

তরুণটি সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনে হ'ল, সে যেন

একটু অনুতপ্ত—সঙ্কুচিত। হয়ত' ভেবে থাকবে আজকের ইউনিয়নবাজীর যুগেও ডাবরিওয়ালাকে রাবরিওয়ালা বলে উপহাস করা উচিত হয়নি। হয়ত ডাবরিওয়ালাজী ব্যাংকের একজন বড় কাস্টোমার, ব্যাংক জাতীয়-করণের আগে যাঁদের বলা হত constituents। এখন, বেসরকারি ব্যাংকে তাই বলা হয়!

ডাবরিওয়ালা স্থানোদ্ভূত পদবির অন্যতম। স্থানটি হ'ল রাজস্থানের পিলানির কাছে, যা বিড়লাদের প্রযুক্তি বিদ্যালয়ের জন্যে বিখ্যাত। বিড়লারা এখান থেকেই এসেছিলেন। ডাবরি থেকে আগত বলেই পদবি ডাবরিওয়ালা। ঝুনঝুন্ থেকে আগতের পদবি হল ঝুনঝুনওয়ালা, জয়পুর থেকে আগতদের জয়পুরিয়া, রাজগড় থেকে আগতদের রাজ-গড়িয়া, কনৌড় থেকে আগতদের কানোরিয়া, আজমীর থেকে আগতদের আজমেরা, চুড়ু থেকে আগতদের চোড়োরিয়া, কাজারী থেকে আগতদের কাজারিয়া, ইত্যাদি। এছাড়া আছেন বিড়লা, বাংগড়, জালান, নোপানী, গোয়েঙ্কা, সারাওগী, আলমল, রুংতা, চৌধুরী, লাইলা, শেঠিয়া, লোধা, গোধা, চনচনিয়া, মোতা, লাহনা, রাণাসরিয়া, ছাবারিয়া, সাকসেরিয়া, পাতোদিয়া, বাফনা, ভিয়ানিওয়ালা, তিবড়েওয়ালা ইত্যাদি—আর আছেন মূল গোষ্ঠী অনুসারে অগ্রবাল, মাহেশ্বরী ও ওসওয়াল।

লক্ষণীয় যে অধিকাংশের বেলাতেই পদবি শেষ হচ্ছে 'আ' দিয়ে। 'আ' এর প্রতি মাড়োয়ারীদের যেন একটি স্বাভাবিক টান আছে। উচ্চারণের সময় ওঁরা কৃষ্ণকে বলেন কৃষ্ণা। একবার এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিলাম। খানিকক্ষণ আলাপের পরই একজন ভৃত্যকে আদেশ দিলেন: কৃষ্ণাকো বুলাও।—একটু অবাক না হয়ে পারলাম না—এমন কোন বিষয়ে আলাপ হচ্ছে না যাতে কোন মহিলাকে ডাকার প্রয়োজন হ'তে পারে! কৃষ্ণা যখন এল তখন দেখলাম কৃষ্ণা নয় কৃষ্ণ—ভদ্রলোকের পুত্র।

আ-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকলেও মাড়োয়ারীদের পদবি পার্শিদের মত পেশা অনুসারে নির্ধারিত নয়। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পে পরশুরাম যে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের চরিত্র অঙ্কন করেছেন তা বেশ

খানিকটা কষ্টকল্পিত। ভদ্রলোকের নাম দিয়েছেন গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া। অর্থাৎ যার পেশা বাটপারি। এই রকম পদবি মড়োয়ারীদের নেই।

অনেক সময় তাঁদের পদবি ইংরেজী শৈলীর অনুসরণে সামান্য পরিবর্তিতও হয়েছে—যেমন অগ্রবাল হয়েছে আগরওয়াল, সারবগী হয়েছে সারাওগী। কিন্তু ভারতীয় ভাষায় লেখার সময় তার আদিরূপই রয়ে গেছে—বাঙালীদের মত মুখোপাধ্যায় মুখার্জি বা গঙ্গোপাধ্যায় গাঙ্গুলী হয়নি।

জাতবিচারঃ অগ্রবাল, মাহেশ্বরী ও ওসওয়াল হ'ল বর্ণের নাম। এঁরা সবাই বৈশ্য। ব্রিটিশ লর্ডদের মত মাড়োয়ারী বৈশ্যদের মধ্যেও শ্রেণী-ভেদ বা জাতপাতের বিচার আছে। সব থেকে উঁচুশ্রেণীর ব্রিটিশ লর্ড হ'লেন ডিউক, তারপর পর্যায়ক্রমে মার্কিস, আর্ল, ভাইকাউন্ট ও ব্যারন। একশ্রেণী থেকে পরের শ্রেণীতে উন্নীত হওয়াও সম্ভব। যেমন মাউন্ট-ব্যাটেন ভাইকাউন্ট থেকে আর্ল মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলেন।

মাড়োয়ারীদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু শ্রেণীর বা উচ্চবর্ণের বৈশ্যরা হলেন অগ্রবালরা। জগৎ শেঠরা এই বর্ণভুক্তই ছিলেন। তারপর আছেন ওসওয়াল এবং তারপর বোধহয় মাহেশ্বরী। 'বোধহয়' বললাম এই কারণে যে ওসওয়াল ও মাহেশ্বরীর মধ্যে কোন্ বর্ণ উচ্চতর তা নিয়ে মতবিরোধ আছে—যেমন বাঙালীদের মধ্যে কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যে বর্ণের উচ্চতা-সামান্যতায় দু'পক্ষেরই দাবি সমান প্রবল। তবে ব্রাহ্মণরা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ তা যেমন বাঙালী কায়স্থ ও বৈদ্য দু'বর্ণই মেনে নিয়েছেন, তেমনি অগ্রবালরা অন্য দুই বৈশ্য বর্ণের চেয়ে উঁচু তা' নিয়ে মতবিরোধ নেই। আবার অগ্রবালরা বৈশ্যই—ব্রাহ্মণদের কাছাকাছিও নন। ব্রাহ্মণ যাঁরা তাঁদের পদবি শর্মা, ভোজগ ইত্যাদি। অনেক সময় এঁদের পূজারীও বলা হয়। এঁদের মধ্যে আবার যাঁরা দৈনন্দিন নয়, বিবাহ ইত্যাদি বিশেষ পূজানুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন তাঁরা পণ্ডিত বলে খ্যাত। তাঁদের সম্মান প্রাত্যহিক পূজারীদের ওপর।

বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ ছাড়াও যে-সব মাড়োয়ারী কলকাতায় আছেন তাঁরা

হলেন ক্ষত্রিয় ও মহারাজ। ক্ষত্রিয়দের ওঁরা বলেন ছত্রী। এঁদের সাধারণ পদবি টাকরা বা টাগরা। টাকরা হল ঠাকুরের অপভ্রংশ—তুচ্ছাত্মক অর্থে ব্যবহৃত। ওঁরা ডাকেন 'এই টাকরা'! সম্ভ্রান্ত হলে বলা হয় ঠাকুর—যেমন ঠাকুর বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ, ঠাকুর ত্রিভুবননারায়ণ সিং। সকলেই ক্ষত্রিয় ও ঠাকুর।

মহারাজরা রাজাটাজা কিছু নন, পাচক মাত্র। প্রথমবার আমি মহারাজের উল্লেখে অবাক হয়েই গিয়েছিলাম। ফ্যান্সী লেনে একটা অফিসে আমার অবস্থানের সময় শুরু হয় প্রবল বৃষ্টিপাত। থামবার কোন লক্ষণ নেই। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম চারিদিক জলময়, রাস্তায় অসংখ্য গাড়ি প্রায় নিশ্চল। যাঁর কাছে গিয়েছিলাম তিনি বললেন: Professor, I'm afraid you con't go. Take your lunch here—বলেই তিনি ঘন্টি বাজালেন। বেয়ারা ঢুকতেই বললেন: মহারাজকো বোলো, এক আওর আদমিকা খানা বানানা হ্যায়। প্রফেসর সাব ভি খায়েংগে।

মহারাজ কে? পাকশালার পরিচালক, না কারও নাম? পরে জেনেছিলাম প্রত্যেক পাচকই মহারাজ। আগেকার দিনে মাড়োয়ারী মহারাজ ছাড়া আর কারও পাক-করা খাদ্য অন্তত প্রবীণারা গ্রহণ করতেন না। সেসব দিন অবশ্য চলে গেছে। এখন রাঁধতে জানলে আর অচ্ছুৎ না হ'লেই হ'ল। আর কেই বা জানছে, পাচক সত্যিই ব্রাহ্মণ কিনা—জনউ (পৈতে) ঝোলালেই হল! পরিচারক-পরিচারিকা আর আগের মত সুলভ নয়।

বর্ণভেদের দরুণ অগ্রবাল, ওসওয়াল ও মাহেশ্বরীর মধ্যে বিয়েশাদি অসবর্ণ বিবাহ বলে গণ্য। প্রাচীনপন্থীরা এখনও একে ঠিক অনুমোদন করেন না। এই কারণে 'রাজবংশীয়' (মাড়োয়ারীদের মধ্যেই বিড়লা পরিবারকে বলা হয় রাজবংশ—দ্য রয়াল ফ্যামিলি) বিড়লাদের পক্ষেও অগ্রবাল সম্প্রদায় থেকেও সুপাত্র খুঁজে পেতে কিছুটা অসুবিধে হয়। বাংগড়দেরও ঐ একই অসুবিধে, কারণ তাঁরাও মাহেশ্বরী।

মাড়োয়ারীদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের এক প্রকারভেদ হ'ল জৈনী-

সনাতনীর মধ্যে উদ্বাহ। একে ঠিক অসবর্ণ বিবাহ না ব'লে আন্তঃ-ধর্মগোষ্ঠী বিবাহ inter-sect marriage বলা উচিত।

মাড়োয়ারী বৈশ্যদের মধ্যে ধর্মগোষ্ঠী মোটামুটি দু'টি : সনাতনী বা মার্কামারা সনাতন হিন্দু-ধর্মাবলম্বী, আর জৈন—ওঁরা নিজেরা বলেন জৈনী। এই সনাতনী ও জৈনীর মধ্যে বিয়েশাদি মাড়োয়ারী সমাজের সমগ্রের ঠিক অনুমোদন পায় না। তবে বর্ণ ও ধর্মগোষ্ঠী দুই ক্ষেত্রেই কঠোরতা কমে আসছে—অগ্রবাল, ওসওয়াল ও মাহেশ্বরীদের মত সনাতনী ও জৈনীদের মধ্যে ভেদাভেদ-সচেতনতা ক্রমশ তিরোহিত হচ্ছে। যুগধর্ম ছাড়াও এর পিছনে আছে গোষ্ঠীবৈশিষ্ট্য—ethos of the clan। ব্যবসায়ীরা তাঁদের কন্যাদের জন্য ব্যবসায়ী ঘরের পাত্রই খোঁজেন, চাকরিজীবী গোষ্ঠী থেকে নয়। তাই জলে জল বাঁধে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা বড় বড় ব্যবসায়ীদের ঘরেই কুটুম্বিতা করতে চান। সুতরাং জাতপাতের প্রতিবন্ধকতা অনেক সময়ই অতিক্রান্ত হয়, এবং সহজেই।

প্রসঙ্গত জৈন পদবির সকলেই মাড়োয়ারী নন—যেমন মাড়োয়ারী নন সাহু জৈন পরিবারের লোকেরা। ওঁরা উত্তরপ্রদেশের নাজিবাবাদের কাছ থেকে এসেছেন। এই জন্যে রাজস্থানের প্রতি ওদের তেমন কোন টান নেই, যে টান মাড়োয়ারীদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিভাত।

কুলধর্ম : কথা হচ্ছিল এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের শিক্ষার ব্যাপারে। ছেলেটির নাম প্রবীন, ডাক নাম পাপু। সে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি. কম. অনার্স পার্ট ওয়ান পাশ করেছে ভালভাবেই। জিজ্ঞাসা করেছিলাম : পাপু আরও পড়বে ত? নিশ্চয়ই পার্ট টু' দেবে।

—নেহি জী, ভদ্রলোক যেন এক অস্বাভাবিক প্রস্তাব পেয়েছেন, সেইভাবেই উত্তর দিলেন।

—তব কেয়া করেগা?

—কেঁও বিজনেস!—ভদ্রলোকের যেন আরও অবাক হবার পালা। তারপর একটু সামলে জ্ঞানগর্ভ সত্যপ্রকাশ,—আওর পড়নেসে কেয়া

হোগা ?—তারপর একটু পরে,—শেরকা বাচ্চা মাসই খায়গা, ঘাস ত নেহি খায়গা।···

এখানে মাস হল বিজনেস, আর ঘাস হল নোকরি। শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজে প্রথম বর্ষে পড়ে এমন একটি মেয়ের আমার কাছে কিছু জানতে আসবার কথা ছিল। যেদিন আসবার কথা ছিল সেদিন সে এল না, এল ক'দিন পরে অবশ্য খবর দিয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম, ঃ এ ক'দিন কি হয়েছিল ? উত্তর পেলাম, তাদের পারিবারিক ব্যবসায়ের শাড়ির প্রদর্শনীতে সে ক'দিন ব্যস্ত ছিল—কলেজেও যেতে পারেনি। মন্তব্য করলাম ঃ লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বিজনেস নিয়ে মাথা ঘামাও···শেষ করার আগেই মেয়েটি বলল ঃ What are you saying, Sir! বানিয়াকি বেটী বিজনেস নেহি করেগী ! নোকরি ঢুঁড়েগী ?

না, ব্যবসায়ী মাড়োয়ারীরা নোকরি করতে চায় না। করতে বাধ্য হলেও মাস খাবার দিকে ঝোঁকে, নিরামিষ নোকরির প্রতি তাদের মোটেই আকর্ষণ নেই। বাঙালী ছেলেরা এক চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরিতে যাবার চেষ্টা করে for better prospects—অনেক সময় সোজাসুজি সে কথা লিখেও দেয়, মাড়োয়ারী এক ব্যবসা ত্যাগ করে অন্য এক ব্যবসায়ে যাবার প্রচেষ্টা সব সময়ই করে for larger profit.

প্রাচীনকালে শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে পেশ ও পেশা অনুসারেই বর্ণ চিহ্নিত হয়েছিল। পণ্ডিতরা বলেন, প্রাচীন সভ্যতার রথ যারাই চালনা করেছে তাদের সকলের মধ্যেই শ্রমবিভাগ ও বর্ণভেদ প্রথার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়—এদিক দিয়ে ভারত চীন ঈজিপ্ট সবই সমান।

বস্তুত, শ্রমবিভাগ হ'ল মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের অন্যতম সূত্র। যেদিন মানুষ গাছ থেকে নেমে এল—অর্থাৎ ক্রম-বিকাশের ধারা বেয়ে বানর-জীবন অতিক্রম করে পৃথিবীতে মানুষ বলে পরিচিত হল সেদিন থেকে সে একক ভাবে নয়, সমাজের সভ্য হিসেবেই জীবনধারণের সমস্যার সম্মুখীন হ'ল। এই সমস্যা সমাধানের সূত্র ছিল তিনটি—ধর্ম, কর্তৃত্ব ও কর্মবিভাগ।

ধর্মীয় ও কর্তৃত্বের অনুজ্ঞা বলে মানুষকে নির্দিষ্ট কাজকর্ম করতে হত,

আর এই সব কাজকর্মের সমন্বয় সাধন করত ধর্মীয় বা ঐহিক কর্তৃত্ব। কর্মবিভাগ হয়ত কারো নির্দেশে সৃষ্টি হয়নি, হয়ত হয়েছিল স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা হিসেবে বংশপরম্পরার মাধ্যমে। এবং তা ধারণ করেছিল সংহত রূপ। তখন কর্মবিভাগ পরিণত হয়েছিল কুলধর্মে।

বর্ণভেদপ্রথা কোন কোন ক্ষেত্রে ছিল কঠোর, আবার কখনো বা শিথিল। ঠিক ভারতীয় বর্ণভেদপ্রথার কঠোরতার জন্যে নয়, কর্ম বা পেশার প্রাপ্তিযোগের পরিমাণের জন্যেই মাড়োয়ারী বৈশ্যরা বৈশ্যই রয়ে গিয়েছেন। শের মাসই খাবে, ঘাস কখনই খাবে না! উপরন্তু, এই কারণেই অন্যান্য বর্ণের লোকেরা বানিয়াবৃত্তির দিকে ঝুঁকেছেন। জাতপাতের দিক থেকে অবশ্য এঁরা ছত্রী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। বৈশ্যদের সঙ্গে এঁদের প্রস্তাব-প্রস্তুতির মাধ্যমে বিয়েশাদি হয় না।

শেঠ-শেঠানী বাবুজী-বিম্নিজী : শেঠ হ'ল শ্রেষ্ঠীর চলতি রূপ—অর্থ বৈশ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—জমিদারদের মধ্যে মহারাজার মতই। এই অতি-সম্মানসূচক প্রি-ফিক্স হয় রাজপ্রদত্ত, না-হয় জনসাধারণের কাছ থেকে পাওয়া। কলকাতার শেঠদের মধ্যে শেঠ সূরজমল জালান ও নাগরমল জালান, শেঠ মাগ্‌নিরাম বাংগড়, শেঠ ওঙ্কারমল জাঠিয়া, শেঠ আনন্দি-লাল পোদ্দার, শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া, শেঠ শান্তিপ্রসাদ জৈন হ'লেন সবিশেষ প্রখ্যাত। এঁদের মধ্যে শান্তিপ্রসাদজী অবশ্য সাহু নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন—সাহু শান্তিপ্রসাদ জৈন।

অনেক সময় শ্রেষ্ঠীরা শেঠ বলে অভিহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার-প্রদত্ত খেতাবও ব্যবহার করেছেন—যেমন স্যার শেঠ হুকুমচাঁদ জৈন এবং শেঠ স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা। এ দু'জনের একজন শেঠ শব্দটি ব্যবহার করেছেন স্যার-এর আগে, অন্যজন স্যার-এর পরে। কয়েকজন রায় বাহাদুর ও রায় সাহেবও ছিলেন।

বর্তমানে অবশ্য এসব খেতাব অচল। নয়া জমানায় পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ খেতাবও মাড়োয়ারীরা কিছু কিছু পেয়ে থাকেন, তবে বেশি নয়। কারণ এগুলো হ'ল বিদ্যাবিষয়ক অথবা অনুরূপ উৎকর্ষের জন্যে। আর

মাড়োয়ারীরা এতে খুব একটা উৎসাহিতও নন। কারণ, নামের সঙ্গে এগুলো ব্যবহার করা যায় না। তাই শেঠ অভিধাটির প্রতি তাঁদের আকর্ষণ রয়েই গেছে। এই কারণে ডাকসাইটে শেঠের সংখ্যা বিশেষ কমে গেলেও 'শেঠ' শব্দটি মোটেই অপ্রচলিত হয়নি। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর মুনিম-কর্মচারীরা এখনও খাতির করে মনিবকে 'শেঠজী' বলে সম্বোধন ও উল্লেখ করে থাকেন। পরিবারের লোকেরাও বাদ যান না। ছেলে বাপকে 'শেঠজী' বলে সম্বোধন করছেন, তা আমি নিজে শুনেছি। অনেক সময় যাঁরা কাজ বাগাতে আসেন তাঁরাও 'শেঠজী' বলে সম্বোধনের সুযোগ নেন।

বিড়লা বাংগড় জালান গোয়েঙ্কা সাহু-জৈন প্রভৃতি অভিজাত মাড়োয়ারীদের ক্ষেত্রে শেঠের পরিবর্তে 'বাবু' অভিধাই বেশি ব্যবহৃত। বৃদ্ধ কর্মচারীরা মালিক-বংশোদ্ভূত বাচ্চা ছেলেকেও 'বাবু' বলে উল্লেখ ও সম্বোধন করে থাকেন, অবশ্য তক্তে আসীন হবার পর—অর্থাৎ পড়তে পড়তেই হোক বা পড়া শেষ করেই হোক, অফিসে এসে চেয়ারে-চেম্বারে বসবার পর। এই 'বাবু' সম্বোধন ইংরেজদের লেগ্যাসি, অনেকটা ইংরেজী এস্কোয়ার-এরই মত। বাবুর সঙ্গে অনেক সময় আসল নামের পরিবর্তে আগুক্ষরই ব্যবহৃত হয়—যেমন বি. ডি. বাবু, এস. কে. বাবু ইত্যাদি।

ইংরেজ আমলের প্রথম যুগ থেকেই বড় মাপের বাঙালীদের নামের সঙ্গে 'বাবু' যোগ করে তাঁদের সম্মান বা শ্রদ্ধা জানান হ'ত। কিন্তু 'বাবু' থাকত আসল নামের আগে, পরে নয়। যেমন বাবু নবকৃষ্ণ দেব, বাবু রাধাকান্ত দেব, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। সেদিনও জমিদার-দের নামের আগে 'বাবু' যোগ করা হ'ত—বাবু দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, জমিদার মহাশয় সমীপেষু, ইত্যাদি। অভিজাত মাড়োয়ারীদের 'বাবু' বসে আসল নামের পরে কিন্তু পদবির সঙ্গে সম্পর্কবিহীনভাবে—যেমন কে. কে. বাবু বিড়লা, বিড়লাবাবু কখনই বলা হয় না। পদবিই যদি ব্যবহার করতে হয় তবে বলা হয় জী—বিড়লাজী, বাংগড়জী, গোয়েঙ্কাজী। জী আবার মাঝেও ঢোকান হয়—যেমন শ্যামসুন্দরজী কানোরিয়া। এ হ'ল অতি বিনয় বা অতি শ্রদ্ধার নিদর্শক—বাংলায় শ্রীশ্রী শ্রীলের মত।

বাঙালীদের ক্ষেত্রে মাড়োয়ারীরা যখন 'বাবু' শব্দটি ব্যবহার করেন তখন তা হয় পদবির শেষে—যেমন মুখার্জিবাবু, বাসুবাবু (বসুবাবু) ইত্যাদি, অথবা কর্মস্থলে পদাধিকার অনুসারে—যেমন অ্যাকাউট্যান্টবাবু ও ক্যাশিয়ারবাবু।

বাবুয়ানীরা সম্বোধিত হন বিন্নিজী বলে—বড়া বিন্নিজী, ছোটা বিন্নিজী ইত্যাদি। অনেক সময় বড়া-ছোটা দ্বারা ঠিক পার্থক্য নির্দেশ করা সম্ভব না হ'লে স্বামীর নাম বা অদ্যক্ষর ধরে এবং তার সঙ্গে বাবু যোগ করে বিন্নিজীকে নির্দেশ করা হয়—দয়ারামবাবুকা বিন্নিজী, অথবা ডি. কে. বাবুকা বিন্নিজী···।

আবার বড় বড় পরিবারের কর্ত্রীস্থানীয়া মহিলাদের বলা হয় বহুজী—প্রাচীনতমা বিন্নিজী। এই রকম ক্ষেত্রে পরিবারের কর্তা শেঠ আখ্যা পেয়ে থাকেন। শুধু শেঠজী, নামটাম কিছু নয়। শেঠজীর অর্ধাংগিনীকে বহুজীর বিকল্পে শেঠানী বলাও রীতিসম্মত, এবং তা প্রচলিত।

এই রকম এক শেঠ ছিলেন রামলাল গোলছা—কলকাতার নন, নেপালের। অবশ্য কলকাতাতেও গোলছা পরিবারের গদি ও ডেরা আছে। তাঁদের এই কলকাতার ডেরাতেই আমার যাতায়াত ছিল।

রামলালজী ছিলেন একেবারে স্বয়ম্ভূ। ওসওয়াল সম্প্রদায়ের লোক। বিকানীর থেকে নেপালের বিরাটনগরে গিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। প্রথমে ছোট্ট একখানা মুদিখানার দোকান, তা থেকে কাঠমাণ্ডুতে বড় দোকান, বেয়াজের কারবার, এজেন্সি গ্রহণ, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর গোলছা পরিবারের পত্তন।

কলকাতার অভিজাত পল্লীর এক বহুতল বাড়িতে দু'টো ফ্ল্যাট নিয়ে তাঁর ডেরা, আর অন্যতম ব্যবসা-কেন্দ্র ব্রাবোর্ন রোডে তাঁর শাখা-অফিস। তিনি কাঠমাণ্ডু ও কলকাতার মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করতেন।

একদিন সকালে তাঁর কলকাতার ফ্ল্যাটে গেছি। তখন তার প্রাতর্ভোজনের সময়। অনুরোধ করলেন প্রাতর্ভোজনে তাঁকে সঙ্গ দিতে। টেবিলে সব ভোজ্য এল। আমরা দু'জন কিন্তু ডিশ তিনখানি। তিনখানি পাত্রেই ভোজ্য পরিবেশিত হল। পরিবেশনের পরই শেঠ রামলালজী

একখানি ডিশ নিয়ে উঠে গিয়ে দেয়ালের কাছে দাঁড়ালেন। দেওয়ালে এক মাড়োয়ারী মহিলার প্রতিকৃতি—বেশ বড় তৈলচিত্র। বিড়বিড় করে কি ব'লে তাঁকে ডিশের প্রাতরাশ উৎসর্গ করলেন—ভক্ত যেভাবে দেবতাকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন ঠিক সেইভাবে।

টেবিলে ফিরে আসার পর আমার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির জবাবেই শেঠ রামলাল গোলছাজী উচ্চারণ করলেন একটিমাত্র শব্দ : শেঠানী।

পরে শুনেছিলাম শেঠজী বিপত্নীক। তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটেছিল ২৪-২৫ বছর আগে। তখন রামলালজীর অবস্থা মোটেই রমরমা হয়নি। ফলে তিনি শেঠ আখ্যা পাননি এবং তার পত্নীও শেঠানীর স্তরে উন্নীত হননি। এটি বোধহয় ছিল শেঠজীর মনোকষ্টের অন্যতম কারণ। তাই তিনি বহুদিন পরে প্রয়াতা পত্নীকে 'শেঠানী' বলেই উল্লেখ করতেন।

কিছুদিন পরে কথায় কথায় আমি রামলালজীকে বলেছিলাম, শেঠানীর নামে একটা হাসপাতাল বা প্রসূতিসদন করে দিন না কেন? কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে চেয়ে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : ম্যয় নে ভি শোচা থা কি কই কুছ করেগা। লেকিন বহুৎ খর্চ্।—কথা আর বাড়াইনি।

আর একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের ৩৫ বছর বয়সে পত্নীবিয়োগ ঘটলেও তিনি দ্বিতীয়বার ফেরার[১] বাঁধনে পড়তে চাননি। কারণ ছিল মাতৃহারা সন্তান তিনটিকে মানুষ করা। মহৎ উদ্দেশ্য ও অনন্যসাধারণ ত্যাগ, সন্দেহ নেই!

একদিন তিনি এই ব্যাপার নিয়ে নানাভাবে খেদ প্রকাশ করছিলেন : এতদিন সঙ্গিনীবিহীন—মনের কথা বলবার লোক নেই, ছেলেমেয়েরা সব বড় হ'য়ে গেছে—তাদের নিজেদের সংসার হয়েছে, প্রয়াতা সহধর্মিণীর ভোগজাত কিছুই হয়নি—তাঁর জন্যে কিছু করাও হয়নি।

এইবার আমি তাঁকে থামিয়ে বললাম : তব উনকে লিয়ে কুছ কিজিয়ে···

—কর ত' দিয়া।

১. সাতপাকের

—কেয়া কর দিয়া ?

ব্যাখ্যা করলেন ভদ্রলোক : রাজগড়ে তাঁদের পৈতৃক বাড়ির একাংশে ধর্মশালা করে দিয়েছেন। নাম দিয়েছেন দুর্গাদেবী ধর্মশালা।

—রাজগড়ে ধর্মশালা! ওখানে কি কাজে আসবে ?

—কেঁও ?—হুঁয়া ত বহুৎ সরকারি করমচারী আতা হ্যায়।

ভাল কথা। তবুও জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না : আওর কুছ করনেকা লিয়ে শোচতা হ্যায় ?

—আওর কুছ।—এবার ভদ্রলোকেরই বিস্ময়ের পালা। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে দিয়ে তিনি বললেন : আওর কেয়া করে গা ? তাজমহল বানায় গা ? ম্যয় তো রাজা-বাদশা হ্যায় নেহি। পইসা বরবাদ করনেসে কেয়া ফয়দা ?

তবু কিন্তু শেঠানীদের নামে হাসপাতাল-ধর্মশালা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়—যেমন রানী বিড়লা কলেজ, মহাদেবী বিড়লা স্কুল, জওহরী দেবী কলেজ অফ্ হোম সায়েন্স ইত্যাদি। তবে সংখ্যা কম। আর সবই মোটা-মুটি বিড়লাদের। পয়সা ত বরবাদ করবার জন্যে নয়। ঐ রোগেই ত সামন্ততন্ত্র ভুগেছিল—শেষ হয়ে গিয়েছিল।

লাখটাকিয়া-পাঁচটাকিয়া : ধান্ধা শব্দটি মাড়োয়ারী মহলে বিশেষ প্রচলিত, বাঙালী মহলেও প্রচলিত হয়ে উঠেছে। বাংলায় ধান্ধার অন্যতর আভিধানিক অর্থ কাজকর্মের সন্ধানে ঘোরা (আর একটি অর্থ ধাঁধা)। মাড়োয়ারীদের কাছে ধান্ধার তাৎপর্য হ'ল কাজ বাগানো বা বাগানোর প্রচেষ্টা। অতএব, নোকরি-ধান্ধা একসঙ্গে ব্যবহৃত হলেও, নোকরি জোটানো বা জোটাবার প্রয়াস, দালালি, অর্ডারের জন্যে ঘোরা, পাওনা টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা, ছেলেমেয়েদের ভাল স্কুলকলেজে ঢোকানোর সাধনা, জমিজায়গার ব্যবস্থা করা, ফ্ল্যাটের মালিক হওয়ার জন্যে প্রযত্ন, প্লেন-ট্রেনের টিকিট যোগাড় করা, ব্যবসাবাণিজ্য চালানো বা অনুপ্রবেশের জন্য অভিযান, এমনকি রাজনীতি করা—সবই ধান্ধার প্রজাতি। লক্ষ্য একটাই—রূপেয়া বানানো বা বাঁচানো। ভাল স্কুলকলেজে পড়ালে পাত্র

হিসেবে পুত্রের বাজার-দাম বাড়বে, আর কন্যাসন্তানের জন্মদানের জন্যে খেসারতের পরিমাণ কমবে। তাছাড়া পুত্র বা কন্যার উচ্চতর ঘরে বিয়ে দিতে পারলে জাতেও ওঠা যাবে। তাতে ব্যবসায়-সংযোগের সুযোগ ঘটতে পারে। সম্বন্ধী (বৈবাহিক) কি সম্বন্ধীকে না টেনে পারেন? একটা এজেন্সি, কিছু শেয়ার, ডিরেক্টরশিপ, পার্টনারশিপ—কুছ-না-কুছ তো মিলেগাই। অতএব, ছেলেমেয়েদের জন্যে ধান্দার অঙ্গীভূত হ'ল নামী স্কুলকলেজের ছাপ। ব্যবসা যে মাড়োয়ারীদের কুলধর্ম।

প্লেন-ট্রেনের টিকিট পাওয়া মানে হ'ল বিজনেস ট্রিপ-এ সফল হওয়া। সুতরাং তাও ধান্ধা। জমিজায়গা ফ্ল্যাটবাড়ি ইত্যাদি যোগাড়ের চেষ্টাও ধান্ধার সামিল। কারণ, সবক্ষেত্রে ভালভাবে থাকার জন্যে নয়, ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্যে। একে বলা হয় To have a good address—অর্থাৎ কর্জ পাবার জন্যে, এজেন্সি জোগাড়ের জন্যে, বড় খদ্দের ধরবার জন্যে, সমাজে উঁচু জায়গায় পৌঁছুবার জন্যে নিজস্ব বাড়ি-ফ্ল্যাটের দরকার হয়। এবং তা যত অভিজাত পল্লীতে হয় ততই ভাল। আলিপুর রোড বা কুইন্স পার্কের নাম করলে অপরপক্ষের মূল্যায়নে যতটা ওঠা সম্ভব, বি. কে. পাল এভিনিউ বা বড়বাজারের কোন গলির নাম করলে ততটা মোটেই সম্ভব নয়। এই রকম কোন অভাজন অলি-গলির নাম করে সেখানে আসার জন্যে কোন কর্জদাতা বা বড় ব্যাঙ্ক অফিসারকে নেমতন্ন করলে যে উত্তর আশা করা যায় তা হ'ল : Not this time, please. May be some other time—বা ওঁদের ভাষায় : ইস্ দফে নেহি। বাদমে দেখুঙ্গা।

কলকাতার বাইরেও এরকম হয়। হয়ত বোম্বাইয়ের মহালছমী মন্দিরের কাছে বা চৌপাট্টায় দু'জন ব্যবসায়ীর মধ্যে দেখা হ'য়ে গেল। একজন অপরজনকে অভিবাদন করে জিজ্ঞাসা করলেন : কব্ আয়া?

—পরশো—প্রত্যভিবাদন করে জবাব দিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি। এবার তিনিই প্রশ্ন করলেন : কাঁহা উতরা?

যদি শোনেন কোন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর হোটেলে, তবে তিনি তড়িঘড়ি বিদায় নেবার চেষ্টায় বলবেন : আচ্ছা, বাদমে ফির মিলুঙ্গা।—

আর যদি উত্তর আসে ওবেরয়ে বা তাজে, তবে পকেট-ডাইরি বের করে জিজ্ঞাসা করবেন, Room No ?

এর ওপরও যদি উত্তর হয় নিজের কুঠিতে বা বাংলোয় বা ফ্ল্যাটে তবে তো কথাই নেই—মূল্যায়নে একবারে সিঁড়ির সবচেয়ে ওপরের ধাপে। জ্যাকুলিন কেনেডির দ্বিতীয় পতি অ্যারিস্টটল সোক্রেটিস ওনেসিস তাঁর উইলে উপদেশ দিয়েছিলেন : Have a good address. One should prefer an attic room in a seven-star hotel to the best suite in a three-star one. মাড়োয়ারীদের কাছে ওনেসিসের এই উপদেশ নতুন কিছু নয়—ব্যবসাবাণিজ্যের শুরু থেকেই তাঁদের জ্ঞানের অঙ্গীভূত।

তাই অভিজাত পল্লীতে গিয়ে বাসা বাঁধার তাৎপর্য হ'ল জাতে ওঠা—অভিজাতদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেষির সুযোগ পাওয়া।

এই কারণেই কলকাতার মাড়োয়ারীরা রোটারি ক্লাবের সদস্য হ'তে বিশেষ আগ্রহান্বিত। আবার রোটারি ক্লাবের মধ্যে 'রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা'ই বাঞ্ছনীয়—সেখানেই বড় বড় আদমিকা মিছিল। অভাবে অন্য রোটারি ক্লাব, লায়নস্ ক্লাবও চলতে পারে।

একইভাবে ব্যবসায়ী বা বিজনেস্‌ম্যান থেকে শিল্পপতিতে পরিণত হওয়াও মর্যাদাবৃদ্ধির—জাতে ওঠার শামিল।

গোষ্ঠীবিচারে মাড়োয়ারীদের মধ্যে পর্যায় হ'ল নোকর, মুনিম, খুচরা বেপারী, দালাল, থক্ বেপারী, বেয়াজ-কারবারি এবং ইংরেজী অভিধা অনুসারে মার্চেন্ট ও ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। এছাড়া আছেন কিছু কিছু পেশাদার—পণ্ডিত ও পূজারী, উকিল, বৈদ ও ডাক্তার এবং অ্যাকাউন্টট্যান্ট।

নোকর হ'ল গৃহভৃত্য থেকে সাদা কলারের কর্মচারী পর্যন্ত, আর মুনিম হলেন বিশ্বস্ত কর্মচারী—অনেক প্রাচীন জমিদারদের দেওয়ান পদাধিকারীর (বা সদর নায়েবের) মত। দেওয়ানপদের মত মুনিমপদও অনেক ক্ষেত্রে পুরুষানুক্রমিক।

মুনিমদের সঙ্গে কর্তা থেকে বাড়ির সবাই সৌহার্দ্য বজায় রেখে

চলার চেষ্টা করেন। একজন সেক্রেটারি গেলে আর একজন সেক্রেটারি আসবে, একজন চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছেড়ে গেলে আর একজন যোগাড় হবে, কিন্তু মুনিমজী চলে গেলে তাঁর জায়গায় আর একজনকে পাওয়া শুধু কঠিনই নয়, একরকম অসম্ভব। অধিকাংশ সময়ই মুনিমপদ যে পূর্ণ বিশ্বস্ততার। সব গোপনীয় ব্যাপারের ডুপ্লিকেট চাবিকাঠি থাকে তাঁরই কাছে। মুনিম আবার এদিকওদিক করার মেকানিজ্‌মও বটে। অতএব, মুনিম গেলে মুনিম পাওয়া মুশকিল। হ্যাঁ, মুনিমকে ওঁরা 'জী' —'মুনিমজী' বলেই সম্বোধন ও উল্লেখ করে থাকেন।

মুনিমজী যাতে ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে চলে না যান তার জন্যে মাড়োয়ারীরা সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করেন। অনেক সময় তাঁদের কিল খেয়েও কিল চুরি করতে হয়।

একবার এক তথাকথিত শেঠ আমাকে অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে এক বেসরকারি ব্যাঙ্কের বড়বাজার শাখায় যেতে একটা বেশ মোটা অঙ্কের (অন্তত আমার কাছে) টাকার হদিসে সহায়তা করতে। ব্যাপারটা ছিল এই রকম : ব্যাঙ্ক থেকে তাঁদের এক ট্রাস্টের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট-এর লেনদেনের হিসেব আনার পর দেখা গেল যে চল্লিশ হাজার টাকা হাপিস —ক্যাশ-চেকে কে তা তুলে নিয়েছে। ব্যাঙ্কে প্রতিবাদ জানানো হল। ব্যাঙ্ক জানালে, ঠিকই আছে—চেকে কোন গরমিল নেই। শেঠ আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন চেকটা নিজে দেখতে।

চেকের সই মিলিয়ে শেঠ বা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না— একেবারে হুবহু শেঠেরই দস্তখত। শেঠ কিন্তু নিশ্চিত যে দস্তখত জাল।

ফিরে এসে ঠিক হ'ল যে ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। তার জন্যে প্রথমে থানায় যে এফ. আই. আর. করা দরকার, তাও করা হবে।

দু'দিন বাদে গিয়ে শুনলাম কিছুই করা হয়নি, কারণ দস্তখত জাল করার সন্দেহ পড়েছে মুনিমজীর ভাঞ্জার[১] ওপর।

খানিকটা প্রতিবাদের ভাব নিয়ে শেঠকে বললাম : কোই অ্যাকশান্ নেহি লিয়া ?

১. ভাগনে

ধীরে ধীরে শেঠ উত্তর দিলেন : লেনেসে মুনিমজীকো ছোড়নে পড়তা।

মুনিমজীর সেই ভাঙ্গা নিজে থেকেই কাজ ছেড়ে দিয়েছিল—কেউ কোন ইঙ্গিত করেনি।

মুনিমজী যেমন নোকরশ্রেণীর মধ্যে প্রধানতম, বিপরীত দিকে তেমনি ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিম্নতম স্তরের হলেন খুচরা বেপারী। ওঁদের ভাষায় তারা দুকানদার। তবে আধা-অভিজাত ঘরের বৌ-ঝিরাও আজকাল শাড়ির দুকান দিচ্ছেন। ফলে দুকানদারিও আভিজাত্যের ছাপ পাচ্ছে। যেমন ভাবে জাতে উঠছে আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা—interior decoration.

দালাল নানা ধরনের—কাপড়ের দালাল, চিনির দালাল, হরেক রকম পণ্যের দালাল এবং বিয়েশাদির দালাল—ঘটক। দালাল ত বটেই—ক্রেতাবিক্রেতাদের সংযোগসাধন ত দালালেরই কাজ। মাড়োয়ারীদের বিয়েশাদি এখন বহুলাংশে কেনাবেচার ব্যাপার।

থক্ বেপারী বা হোলসেলাররা বণিক বা মার্চেন্টদের কাছাকাছি কিন্তু ঠিক মার্চেন্ট নন। মার্চেন্টরা একটু উঁচুস্তরের—কিছু আমদানি-রপ্তানি ও এজেন্সির কাজ করে থাকেন। লিমিটেড কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীতে বণিক বা মার্চেন্টদের নাম পাওয়া যায় কিন্তু বেপারীর নাম দেখাই যায় না।

পরিশেষে আছেন ব্রিটিশ ডিউকদের মত রাজবংশোদ্ভূত শিল্পপতিরা—দ্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিস্টস্। আবার ডিউক অব ওয়েলিংটনের মত দু'চার জন রাজবংশোদ্ভূত না হয়েও যেমন ডিউক, তেমনি জাতে-ওঠা শিল্পপতিরাও আছেন। এঁরা বেপারী থেকে বণিক এবং বণিক থেকে ইণ্ডাসট্রিয়ালিস্টস্ হয়েছেন ধাপে ধাপে উঠে। বর্তমানে কলকাতার বেশ কয়েকজন মাড়োয়ারী শিল্পপতির পূর্বপুরুষ অভিজাত মাড়োয়ারী-ভবনের মুনিমই ছিলেন।

এই বণিক ও শিল্পপতিরাই লাখটাকিয়া বা লাখটাকার কারবারী বলে অভিহিত, আর সবাই পাঁচটাকিয়া—পাঁচ টাকার পসারী।

'লাখটাকিয়া' ও 'পাঁচটাকিয়া' শব্দ দু'টি প্রথম শুনি দিল্লীগামী রাজধানী এক্সপ্রেসে। বাঁদিকের সিটে ছিলেন এক বৃদ্ধ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। তিনি আধ-বসা আধ-শোওয়া অবস্থায় ভালই ঘুমলেন দেখলাম। মুশকিল বাঁধল সকালে বাথরুম ব্যবহার নিয়ে। দু'দুবার তিনি সব বাথরুমের দরজা ঢুঁড়ে ফিরে এলেন। তারপর বিরক্তি প্রকাশ : কেঁও আদমিলোক এইসা চেয়ার-কারমে যাতা, মালুম নেহি।

আমিও জবাব না দিয়ে পারলাম না : আপ স্লিপার মে যানে সকৃতা।

—নেহি বাবু,—ভদ্রলোক সখেদে বললেন,—উয় সব বড়া আদমি কা লিয়ে—লাখটাকিয়া কা লিয়ে। ম্যায় তো সিরফ্ পাঁচটাকিয়া।

তখনি ভদ্রলোকের কাছে শুনেছিলাম শব্দ দু'টোর অর্থ। লক্ষ্য করেছিলাম ভদ্রলোকের হাতে দুটি দামী আংটি। একটি তো হীরের বটেই, দাম লাখ টাকাও হতে পারে।

আজকের দিনে লাখটাকিয়া ও পাঁচটাকিয়া শব্দ দু'টি তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে—এক লাখ টাকায় একটা দোকানও খোলা যায় না, শিল্প-স্থাপন তো দূরের কথা, আর পাঁচ টাকায় ফেরি করবার মুড়ি-চানাও হয় না। তবুও শব্দ দুটো অপ্রচলিত হয়নি। অনেক সময় হয়ত হঠাৎ-হওয়া বাবুদের ঠাট্টা করে বলা হয় লাখটাকিয়াবাবু।

আগেকার দিনে বাঙালীদের মধ্যে নায়েব থেকে জমিদার হওয়ার দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। তবে ব্যাপার হ'ল যে, নায়েব জমিদার হওয়ার পর উভয়ের মধ্যে পারস্পরিকতা—আনুগত্য-অনুগ্রহের সম্পর্ক আর থাকত না। বরং দেখা যেত একপক্ষের তাচ্ছিল্যের এবং অপরপক্ষের বিদ্বেষ-অসূয়ার ভাব। মাড়োয়ারীদের ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটে না। মুনিম থেকে বণিক শিল্পপতি লাখটাকিয়া হওয়ার পরও পূর্বের মালিকের কাছ থেকে অনুগ্রহ সহায়তা তাঁরা পেয়ে থাকেন, আর প্রাপকের মধ্যে আনু-গত্য মোটামুটি অটুটই থাকে।

এই দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার অন্যদের বেলাতেও লক্ষ্য করা যায়। অবসর গ্রহণের পর বড় বড় ব্যাঙ্ক-অফিসার বড় বড় শিল্প-ভবনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীতে স্থান আশা করতে পারেন, পুলিশ

অফিসার সিকিউরিটির কাজ পেতে পারেন, আয়কর অফিসার কোম্পানির আয়করের ব্যবস্থার কাজে নিযুক্ত হতে পারেন। বিড়লা এবং অন্যান্যদের অনেক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীতে আছেন প্রাক্তন ব্যাঙ্ক অফিসার, সিকিউরিটিতে প্রাক্তন পুলিশ অফিসার, এবং আয়কর শাখায় প্রাক্তন আয়কর অফিসার। ব্যবস্থাটি উপযোগমূলক—ইউটিলিট্যারিয়ান, সন্দেহ নেই এবং উভয় পক্ষেই। দেওয়া-নেওয়ার আর একটু বিস্তারও বলা যায়।

শিল্পপতি বলে পরিগণিত হওয়া শুধু যে মর্যাদাবৃদ্ধির জন্যই তা নয়, এর ব্যবহারিক উপযোগও আছে। একবার এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ডুয়ার্সে এক চা-বাগান কেনবার দিকে ঝুঁকেছিলেন। যে চা-বাগান নিয়ে কথা চলছিল তার ব্যালান্স সিট থেকে দেখা গেল সংস্থাটির প্রায় রুগ্ন অবস্থা, আর লাভক্ষতির হিসেবে একটানা চার বছর ঘাটা। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: আপ উয় বাগিচা কেঁও লেনে মাংগতা? ভদ্রলোক উত্তর দিয়েছিলেন: কেয়া কিয়া যায়গা? মেরা পতিকো[1] শাদি লেকে বাৎচিৎ চলতা হ্যায়। ইণ্ডাস্ট্রি নেহি রয়নেসে বড়া ঘরকা লেড়কা নেহি মিলতা।

আর একটি ঘটনা। মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের একে একে সবকিছু বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি কিন্তু আঁকড়ে রইলেন তাঁর ছোট্ট প্ল্যাস্টিক কারখানাটিকে। আমার কাছে ব্যাপারটা একটু অযৌক্তিকই মনে হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম: দোকান ঘরবাড়ি সবকিছু বেচে তিনি শুধু ঐ কারখানাটি ধরে রইলেন কেন? উত্তর পেয়েছিলাম: তুকান রয়নেসে বাহারকা লোক বুলেগা তুকানকারকা কোঠি, কিরায়া দেনেসে বুলেগা কিরিয়াদার—কোঁই-ত' ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট নেহি বলেংগে—মার্কিট সে রূপেয়া উধার[2] নেহি মিলেগা।

সত্যিই বাজার বা মার্কিট থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে শিল্পপতিরাই অগ্রগণ্য—ঋণদাতৃর কাছে কুলীন পাত্রের সমান।

১. পুতি—পৌত্রী, ২. ধার—ঋণ

কর্মভূমি : *শিল্পের পরই মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের আকর্ষণ শেয়ার-বাজারের প্রতি—ফটকার বা সাট্টার কারবারে ওঁদের বিশেষ উৎসাহ।* অন্তত কলকাতায় হেন মাড়োয়ারী নেই বললেই হয় যিনি শেয়ার-বাজারের কিছুটা খরবাখবর না রাখেন, এবং তাল বুঝে লগ্নী বা শেয়ার কেনাবেচার কাজ না করেন। আবার তাঁদের initial allotment-এর দিকে ঝোঁক খুব প্রবল। এ ব্যাপারে তাঁদের অবশ্য দেশীর চেয়ে বিদেশী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানই বেশি পছন্দ।

একবার আমার এক আংশিক নিয়োগকর্তার বড়ভাই একখানা ফর্ম ধরিয়ে দিয়ে আমাকে কতকটা অনুজ্ঞার সুরেই বললেন : ফারম্ ভরিয়ে জী…।

তাকিয়ে দেখলাম নামকরা এক বহুজাতিক সাবান-টুথপেস্ট কোম্পানির নতুন বিলি-করা শেয়ার কেনার জন্য আবেদনপত্র। সংক্ষেপে প্রশ্ন করলাম : কেঁও? উত্তর পেলাম : এলাটমেণ্ট মিলনে সক্‌তা। জানালাম, আমার শেয়ার কেনার ইচ্ছে নেই। ভদ্রলোক বললেন : আপকা লিয়ে নেহি, হামকো লিয়ে—হামই রূপেয়া দেগা। কুচ এলাটমেণ্ট মিলনে কো বাদমে বেচ দুংগা…নাফা বাঁট লুংগা।…

ফর্ম ভরে দিলাম। নাফার অংশও পেয়েছিলাম, তবে তা অতি সামান্য—ফর্ম ভরা ও সই করার মেহ্নতের দাম থেকে হয়ত কিছুটা বেশি।

কয়েক মাস পরে আমারই চোখে পড়ল এক মাঝারি ভারতীয় কোম্পানির নতুন ইস্যুর ঘোষণা। শেঠ ভদ্রলোককেই জিজ্ঞাসা করলাম, এবারও তিনি আবেদন করতে ইচ্ছুক কি না। ভদ্রলোক উত্তর দিলেন : নেহি জী। ইস্ মাফিক কম্পানিমে কোই ভরোসা নেহি।

কলকাতার মাড়োয়ারীদের শিল্প-সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে ইংরেজরা পাত-তাড়ি গুটোবার পর। স্বাধীনতার আগে বিড়লারাই বা কি ছিলেন? শুধু শিল্প-সাম্রাজ্য নয়, শেয়ার-বাজারও অনুরূপভাবে এসেছে মাড়োয়ারীদের আধিপত্যে—মোটামুটি সব বড় বড় শেয়ার-ডিলারই আজ মাড়োয়ারী।

এই কারণেই মাড়োয়ারী ছেলেছোকরারা নোকরি-ধান্ধার ফাঁকে

ফাঁকে শেয়ার-বাজারে ঢুঁ মারে। কিছুদিন আগে থেকে ভবিষ্যৎ শেয়ার-ডিলারদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্যে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জে একটা সংস্থা খোলা হয়েছে। তাতে ৩০ জনের মত শিক্ষার্থী নেওয়া নয়। এর মধ্যে অন্তত ২৫ জনই মাড়োয়ারী।

শেয়ার-বাজারের মত অন্যান্য জায়গাতেও শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা আছে। এখানেও মাড়োয়ারী ছেলেরা ঢোকে নোকরি বা ধান্ধা করতে করতে। এই শিক্ষানবিশীর ক্ষেত্র দালালি থেকে ম্যানুফ্যাক্‌চারিং—যা-কিছু হতে পারে। এতে বর্তমানে হয়ত ক্ষতি হয়, কিন্তু জাতে ওঠবার—লাখটাকিয়া হবার বিরাট সম্ভাবনা।

এই প্রসঙ্গে একজন প্রবীণ মাড়োয়ারী—শ্রীরামচন্দ্রজী আমাকে একটা গল্প বলেছিলেন—

এক দেশের রাজপুত্রের দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। রাজপুত্র দু'জনকেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি রাজা হ'লে তাদের প্রত্যেককে একদিনের জন্যে রাজা করবেন।

রাজপুত্র রাজা হ'লে দু'বন্ধুই একদিন এল তাঁকে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে। রাজা তখন বললেন : নিশ্চয়ই। তোমাদের একজন কাল, আর একজন পরশু রাজা হ'য়ো।

তারা খুশি হল, প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ধন্যবাদ দিল।

কিন্তু কে প্রথম রাজা হবে তা নিয়ে দাঁড়াল সমস্যা। মন্ত্রীই করলেন সে-সমস্যার সমাধান। তিনি দু'জনকে কয়েক হাত দূরে দূরে দাঁড়াতে বললেন। তারপর কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা চেয়ে নিয়ে ওপর দিকে সোজা করেই ছুঁড়ে দিলেন। টাকাটা যার দিকে একটু ঘেঁসে পড়ল সেই ঘোষিত হল প্রথম দিনের রাজা।

সকাল হতেই রাজপ্রাসাদ থেকে চতুর্দোলা গিয়ে তাকে নিয়ে এল। প্রাসাদে ঢুকেই সোজা স্নানাগারে। সেখানে দু'জন নাই[১] তৈরি। একজন সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল ক্ষৌরকর্ম, ক্ষৌরকর্ম হ'য়ে গেলে পর অপরজন ডলাইমলাই। তাতেই ঘণ্টা দু'য়েক কেটে গেল। তারপর রাজভোগের

---

১. নাপিত

জলযোগ। এত খাবার সে কি আর জীবনে দেখেছে! ডলাইমলাই, স্নান এবং জলযোগে গুরুভোজনের দরুণ একদিনের রাজার নিদ্রাকর্ষণ হ'ল। মন্ত্রীই পরামর্শ দিলেন: মহারাজ একটু বিশ্রাম করুন। রাজশয্যা, এক পরিচারিকার বীজন এবং আর এক পরিচারিকার পদসেবা—একদিনের রাজা সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন। তা'ছাড়া আগের দিন উত্তেজনায় রাত্রে ভাল ঘুমও হয়নি।

মহারাজের ঘুম আর ভাঙতে চায় না। বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙিয়ে মন্ত্রীই আবার রাজভোগে বসালেন। খাবার বিশেষ স্পৃহা ও ক্ষমতা না থাকলেও রাজা রাজভোগকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারলেন না। তারপর আবার নিদ্রা।

রাত্রে মন্ত্রী আর নিদ্রা ভাঙালেন না। নৈশ রাজভোগ মাঠে মারা গেল।

ভোর না হতেই শয়নকক্ষের ভৃত্য তাকে ঠেলা দিয়ে তুলে দিল: উঠ জী। আপকা রাজ খতম হো গিয়া।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মহারাজ ভৃত্যের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন: কেইসা লৌটেগা?

—কেঁও? পয়দল পর।

মনভরা আপসোস নিয়ে, পায়ে হেঁটেই ভূতপূর্ব একদিনের রাজাকে বাড়ি ফিরতে হ'ল—আহা, অন্তত কিছুক্ষণও যদি দরবারে বসতে পারা যেত তা'হলে বদলে কিছু নজরানা নিয়েও ফেরা সম্ভব হত।

সেদিনই অপর বন্ধুর রাজা হওয়ার পালা। প্রাসাদ থেকে যে চতুর্দোলা তাকে নিতে এসেছিল তাকে সে ফিরিয়ে দিলে। বললে: আদত নেহি। পয়দল যায়ুংগা।

প্রাসাদে এসে অনুরোধ সত্ত্বেও সে স্নানাগারের দিকে গেল না। বললে: আস্নান করকে আয়া, নাশতা ভি। সুতরাং সোজা দরবারে বসবে।

মন্ত্রী আপত্তি করলেন—এক প্রহর শেষ হওয়ার আগে ত' দরবার বসবে না। মহারাজ নির্দেশ দিলেন: ঢোল বাজা দেও। সবকো আভি

আনে বোলো।

তাই করা হ'ল।

রাজসভায় তিনি লোকের অভিযোগ, দুঃখদুর্দশার কথা শুনলেন। অভিযোগের প্রতিকার আর অভাবীদের মধ্যে প্রাপ্ত নজরানার টাকা বিতরণ করতেই বেলা দ্বিপ্রহর হ'ল।

তারপর কয়েকখানি চাপাটি ও একটু সব্‌জি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সেরে মন্ত্রী এবং আর আর সভাসদ নিয়ে বসলেন খাস দরবারে। জেনে নিলেন রাজ্যের অবস্থার কথা, পাশাপাশি সব রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কের কথা, শেঠদের আচার-আচরণের কথা···।

সন্ধ্যা হতেই মন্ত্রীকে তিনি জানিয়ে দিলেন এইবার বাড়ি ফিরবেন।

—কেঁও মহারাজ,—মন্ত্রী বিস্ময়ে প্রকাশ করলেন, দিন ত' খতম নেহি হুয়া!

—কাম তো খতম হো গিয়া,—জবাব দিলেন মহারাজ।

ফেরবার জন্য আবার চতুর্দোলার ব্যবস্থা হ'ল। মহারাজ তা ফিরিয়ে দিলেন—পদব্রজেই বাড়ির দিকে রওনা হলেন—কোন রক্ষীকেও সঙ্গে আসতে দিলেন না।

পরদিন আসল রাজার দেওয়ান-ই-খাসে দ্বিতীয় দিনের রাজার ডাক পড়ল।

প্রাসাদে ঢোকবার সময় সে দেখে প্রথম দিনের রাজা বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে ফিরছে।

—কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করলে দ্বিতীয় দিনের রাজা।

উত্তর পেল: রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এসেছিল, প্রহরীরা ঢুকতেই দেয়নি।

দেওয়ান-ই-খাসে ছিলেন মাত্র রাজা ও মন্ত্রী। রাজাই প্রথমে সাদর অভ্যর্থনা করলেন তাঁর অন্যতর জিগরি দোস্তকে, তারপর মন্ত্রী পাড়লেন আসল কথা: আপনি খুব হুঁশিয়ার ব্যক্তি। আমাদের ইচ্ছা আপনি ডিপ্‌টি উজির হোন।

সবিনয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে রাজার জিগরি দোস্ত, বললে:

বহুৎ ধন্যবাদ। লেকিন ময় বাপদাদাকো কামই করুংগা।

—হ্যাঁ, বলনে ভুল গিয়া থা,—রামচন্দ্রজী সংবাদ পরিবেশন করলেন, সেকেণ্ড লেড়কা থা বানিয়াকা বাচ্চা, আর পহলেওয়ালা তালুকদার কা বেটা।

মন্ত্রী সতর্ক করে দিলেন, বাপদাদার কামমে বহুৎ জোখিম—রিক্স…।

তবুও সে উপমন্ত্রিপদের প্রলোভন ত্যাগ করে ঝুঁকিই নিল—বাপ-দাদার কামেই লেগে গেল বানিয়াকা বাচ্চা। রাজা হ'য়ে একদিনের মধ্যেই সে অনেক কিছু শিখেছিল, বহুৎ গুডউইল ভি বানায়া থা। পাঁচ বছরের মধ্যেই সে হয়ে উঠল রাজ্যের প্রধান শেঠ—রাজাসে 'জগৎ শেঠ' টাইটেল ভি মিল গিয়া। অপর একদিনের রাজাঠো উনকা পাস নোকরি লে লিয়া—সবকুছ খতম হোনে কা বাদ উনকা নোকরি লেনে পড়া। এই রকমই আশু প্রাপ্তির প্রলোভন ছেড়ে ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাড়োয়ারীতনয়সাধারণ।

পঞ্চাশের দশকের কথা। এক চিনির কোম্পানিতে পাশাপাশি কাজ করত দু'জন মাড়োয়ারী তরুণ। দু-জনেই বেতন পেত ২৫০ টাকা করে। তখনকার দিনে টাকাটা মোটেই অল্প নয়। আমরাই কলেজ শিক্ষক হিসেবে প্রারম্ভিক বেতন পেতাম ১০০ + ২৫ = ১২৫ টাকা করে। অর্থাৎ মূল বেতন ১০০ টাকা আর মাগ্‌গি ভাতা ২৫ টাকা—দু'য়ে মিলে ১২৫ টাকা। এর ওপর অবশ্য ছিল (রাজকীয়) সরকারি ভরতুকি বা মাগ্‌গি ভাতা—১০ টাকা। সুতরাং আমাদের প্রাপ্তি দাঁড়াত ১৩৫ টাকায়। সে তুলনায় চিনি কোম্পানিতে ২৫০ টাকা নিশ্চয়ই কম নয়।

তরুণ দুজনের একজনের কাছে প্রস্তাব এল এক বৈদ্যুতিক পাখা কোম্পানির এজেন্সির ওয়ার্কিং পার্টনার হবার। প্রস্তাবে প্রাপ্তি সম্বন্ধে ধারা ছিল যে, যতদিন পর্যন্ত এজেন্সির একটা পরিমাণ মুনাফা না হচ্ছে, ততদিন নতুন ওয়ার্কিং পার্টনার মাসিক ১৫০ টাকা করে পাবে।

তরুণটি লাফিয়ে উঠল—মাসিক ১০০ টাকা করে আয় হ্রাসকে সে গ্রাহ্যই করল না। স্থায়ী নোকরি ছেড়ে এজেন্সীর কাজের ঝুঁকিকেও আমল দিল না। সহকর্মী অপর তরুণটি সতর্ক করে দিলে সে উত্তর

দিল : আপ নোকরি কর। ম্যয় যা রয়া হুঁ। অপর তরুণটিও মাড়োয়ারী, কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ার অতটা সাহস নিশ্চয়ই তার ছিল না।

অংশীদার হিসেবে যোগদান করার পর তরুণটি এজেন্সির দোকান থেকে ফাঁকে ফাঁকে নির্মাতার ফ্যাক্টরী যেতে শুরু করল। উদ্দেশ্য কাজ শেখা, আর মিস্ত্রি-মেকানিকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

কাজ শিখে সে খুলল ছোট্ট একটা কারখানা। তা ক্রমশ বড় হতে লাগল। আজ তিনি সেই প্রখ্যাত বৈদ্যুতিক পাখা কোম্পানীর—খৈতান ফ্যানের কর্ণধার শ্রীকৃষ্ণ খৈতান—দেশজোড়া নামের এক শিল্পপতি। ঝুঁকি নেওয়া, ঝাঁপিয়ে পড়া বৈশ্যদের মজ্জাগত, বিশেষ করে মাড়োয়ারীদের। নোকরির প্রতি বিতৃষ্ণা আর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এতটা দেখা যায় না।

চিনি কোম্পানীর যে অন্য তরুণটি শ্রীকৃষ্ণ খৈতানকে নোকরি ছেড়ে ফ্যান কোম্পানীর এজেন্সি নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল সে ব্যতিক্রম—জাতের কুলাংগার বলা চলে। অবস্থাগতিকে ঘাস খেতে বাধ্য হলেও মাংসের গন্ধ শের কা বাচ্চার নাকে এলে সে ঘাস ফেলে সেই-দিকে ধাবমান হতে ইতস্তত করে না। নোকরি করলে যে স্বজাতির ঘর থেকে মনোমত ছোকরিও পাওয়া যায় না!

কোন্ কোন্ ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতি মাড়োয়ারীদের বেশি ঝোঁক? বলা যায়, এ ব্যাপারে বিশেষ বাছবিচারের প্রশ্ন তাঁদের কাছে নেই। তবে যেসব প্রস্তুতকরণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জীবহত্যা জড়িত সেই সব প্রস্তুতকরণের কাজ মাড়োয়ারীরা সাধারণত এড়িয়েই চলেন। এক্ষেত্রে নবীনরা এগুতে চাইলেও প্রবীণদের জন্যে তা সম্ভব হয় না।

এক মাড়োয়ারী পরিবারের যৌথ ব্যবসা ভাগ হয়ে যাবার পর এক শরিক আরম্ভ করলেন পোশাকের সঙ্গে চর্মজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি। অফিসের পাশেই গুদাম ঘর। সেখান থেকে মাল প্যাক করা হত। অন্যান্য শরিকরা চামড়ার কারবার অপছন্দ করলেও মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা আপিল করলেন চর্মরপ্তানিকারী শরিকদের পিতার কাছে—যিনি বহুদিন আগেই ব্যবসা থেকে বানপ্রস্থ

নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা—চর্মজাত দ্রব্যের রপ্তানি বন্ধ করবার তোড়জোড় হতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু রপ্তানি বন্ধ হয়নি। গুদামঘর অন্যত্র সরে গিয়েছিল। চোখে না দেখায় এবং নাকে গন্ধ না আসায় এবার আর আবেদন করা হল না। পুরোদমেই চামড়ার রপ্তানি চলতে লাগল। না, বর্তমান পুরুষরা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ আর বিশেষ মানছেন না!

চামড়ার মত কোহল পানীয়ের উৎপাদন ও ব্যবসায়ে নামতে মাড়োয়ারীরা অনেকেই অনিচ্ছুক। শ ওয়ালেশ কোম্পানীর শেয়ারের একটা মোটা অংশ হস্তগত করেছিলেন বাঙ্গড়রা। মদ তৈরীর সঙ্গে জড়িত হতে হবে বলে তাঁরা সেই শেয়ার আর শেষ পর্যন্ত রাখলেন না—প্রবীণরা রাখতে দিলেন না। কোম্পানী অন্য হাতে—সিদ্ধি মন্নুবান ও কিশোর ছাবরিয়ার[১] হাতে চলে গেল, যদিও বা কোম্পানীর বাড়িঘর জমিজায়গার বেশ কিছুটা বাঙ্গড়দের হাতেই রইল।

কলকাতার বই-এর ব্যবসায়ে মাড়োয়ারীদের সাক্ষাৎ বড় একটা পাওয়া যায় না, যদিও বা তাঁরাই হলেন বড় বড় কাগজের কলের মালিক। মিল থেকে কাগজ সোজা ডিলার বা পাইকারদের হাতে আসে না, আসে এজেন্সির মারফত। এজেন্টদের অধিকাংশই মাড়োয়ারী-মালিকদের আত্মীয়স্বজন। এই ব্যবস্থায় স্বজন-পোষণের সব সুবিধেই ভোগ করা যায়। এর দরুণ আবার কাগজের দালালিতে মাড়োয়ারী-দের সংখ্যা বাড়ছে।

শুধু কাগজের নয়, অন্যান্য পণ্যের দালালিতেও ক্রমশ মাড়োয়ারীদের আধিপত্য বিস্তার হচ্ছে। চিনি চা কাঁচাপাট সুতো ঋণ ইত্যাদিতে মাড়োয়ারীদের দালালি একরকম একচেটিয়া প্রকৃতির। চিনি চা সুতো ইত্যাদির ক্ষেত্রে বলা যায় যে, ঐ সব কারখানা বা বাগান অধিকাংশই মাড়োয়ারীদের। আসাম ও ডুয়ার্সের চা-বাগানের অন্তত তিন-চতুর্থাংশ মাড়োয়ারীদের—সাহেবদের হাত থেকে তাঁদের হাতেই গিয়ে পড়েছে।

১. দুই সহোদর ভাই

অনুরূপভাবে পশ্চিমবাংলার ৪৪টার মত চালু পাটকলের ৩০টার মত মাড়োয়ারীদের দখলে। তবে পাটকল অন্যতম রুগ্ন শিল্প। তাই সুযোগ পেলেই তাঁরা পাটকল হস্তান্তরিত করে দেন। এইভাবে পাটকলের ক্ষেত্রে নিয়মিত মালিক বদল হচ্ছে। বিক্রেতারা পাটকল শিল্পের মায়া ত্যাগ করেছেন, ক্রেতারা কিন্তু এখনও মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

কয়লাখনি শিল্পের জাতীয়করণ হবার আগে তাদের অধিকাংশের মালিক ছিলেন মাড়োয়ারীরাই। কোক কয়লাখনি ও জ্বালানি কয়লা-খনি রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর একজন ভূতপূর্ব মাড়োয়ারী খনি-মালিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ভদ্রলোকের দু'রকম কয়লারই খনি ছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর ভদ্রলোককে বিশেষ দুঃখিত হতে দেখলাম না। তিনি সংলাপের সমাপ্তি টানলেন এই বলে: We've lost a fortune no doubt. But with the compensation we get, we'll aquire something else, may be a couple of tea gardens or mica mines.

অধিগ্রহণ, ব্যবসায়-বিস্তৃতিকরণ মাড়োয়ারীদের ধর্ম। একটা গেল তাতে কি হয়েছে, আরেকটা ধরা যাবে—Business of the Marowaris is business.

সংবাদপত্রের ব্যবসায়ে মাড়োয়ারীদের বিশেষ অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে কলকাতার সংবাদপত্রে বিশেষ নয়, কলকাতার বাইরের। বেনেট কোলম্যান গ্রুপের মালিক সাহু জৈনরা। অবশ্য তাঁরা ঠিক মাড়োয়ারী নন। অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণকুমার বিড়লা (মিঃ কে. কে. বিড়লা) দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'হিন্দুস্তান টাইমস্' ও হিন্দি 'হিন্দুস্থান'-এর মালিক। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বিশ্বামিত্র' ও 'সন্মার্গ'-এর মালিকও মাড়োয়ারী—কলকাতায় এত হিন্দি ভাষাভাষী, হিন্দি দৈনিক না হলে চলে! আর কলকাতায় মাড়োয়ারী ছাড়া হিন্দি দৈনিক বের করবে কে?

মুদ্রণ-শিল্পেও মাড়োয়ারীরা ক্রমশ ঢুকে পড়ছেন, তবে হাতে টাইপ বসানো বা হ্যাণ্ড-কম্পোজের প্রেস নয়—অফসেট মেসিনের প্রেস। বই-টই বড়-একটা ছাপতে চান না। কারণ, প্রকাশকদের অধিকাংশই বাঙালী এবং প্রতিষ্ঠান বিশেষ ক্ষুদ্র। তার চেয়ে ব্যালান্স সীট, স্টেশনারি

ইত্যাদির ছাপার কাজ নেওয়াই ভাল! যেহেতু লিমিটেড কোম্পানীর অধিকাংশই জাতভাইদের হাতে, সেইহেতু কাজ পাওয়া সোজা। রেটও ভাল, আর বিলের টাকা আদায় করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

সম্প্রতি মাড়োয়ারীরা কনস্ট্রাক্‌শন বা গৃহনির্মাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বলা চলে। কিছুদিনের মধ্যে যেসব বহুতল গৃহ নির্মিত হয়েছে বা যেগুলো নির্মীয়মান তাদের অধিকাংশেরই প্রমোটার মাড়োয়ারী। সিন্ধি বাঙালী গুজরাটী পাঞ্জাবীরাও এদিকে ঝুঁকেছেন সত্যি, কিন্তু তার আগেই কাজ অনেকটা ফর্সা হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে একজন মাড়োয়ারী ডন কুইটোর লেখক সারভ্যানটিসের সুবিখ্যাত উক্তিটি পুনরুদ্ধার করেছিলেন : It is the early bird that catches the worms তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন : Do you know any person who has a plot of land or old building to sell in Calcutta proper?

Why in Calcutta alone?—জিজ্ঞাসা না করে পারিনি। ভদ্রলোক কারণও ব্যাখ্যা করেছিলেন সম্যকভাবে : কলকাতা করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট লোকদের সঙ্গে জানাচিনা হয়ে গেছে; আলিপুর কোর্ট, সিটি সিভিল কোর্টেরও অলিগলি ভালভাবে জানা আর অধিকাংশ স্থলেই পাড়ার মাস্তানদের দৌরাত্ম্য কম।—তারপর নিজেই প্রশ্ন করেছিলেন কৌন যায়গা বারিকপুর-শ্রীরামপুর মে লড়নে কো লিয়ে? Who is going to tame the mustans of those places?

পার্ক সার্কাসের কাছে এক বহুতল বাড়ির পাঁচতলা থেকে নির্মাণকার্য করপোরেশন আটকে দিয়েছিল। নির্মাতা নাকি স্যাংসান এড়িয়ে কাজ করছিলেন। করপোরেশন লোক বসিয়ে দিল যাতে লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ না চলে।

লুকিয়ে লুকিয়েই কাজ চলত, তবে দিনের বেলা নয়—রাত্রে। দিন-রাত্রি চৌকিদারির ব্যবস্থা। রাত্রে চৌকিদারির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা হয় থাকত না, না হয় দেখেও দেখত না। নিশ্চয়ই বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে আলিপুর কোর্টে করপোরেশনের বিরুদ্ধে ইনজাংশনের

আবেদনও করা হয়েছিল। আবেদনের শুনানি হবার আগেই আটতলার নির্মাণকার্য শেষ। আর ১৫ দিন ইনজাংশানের মধ্যে কাজ একেবারে নিষ্পন্ন।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হল—করপোরেশনের প্ল্যানের কিছুটা রদবদল করে দিল। মূল মামলা আর উঠল না।

এইভাবে ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের ব্যাপারে মাড়োয়ারীরা বিশেষ পারদর্শী। কিন্তু এসব বোধহয় সামন্ততন্ত্র থেকে আহৃত। রাতারাতি পাঁচিল তোলা, পুকুর কাটা বা বোজানো, কোর্ট-কাছারিতে তদ্বিরের ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্যাকার্য সামন্ততান্ত্রিক আচরণের অঙ্গীভূত। মাড়োয়ারীরা তা ভালভাবেই আয়ত্ত করেছেন।

এই তদ্বিরের একটা সম্প্রসারণ হল রাজনৈতিক রাজধানী দিল্লী এবং আর্থিক রাজধানী বোম্বাই-এ সংযোগকারী কর্মচারী—কন্ট্যাক্ট-ম্যান রাখার ব্যবস্থা। দিল্লী ও বোম্বাই-এ প্রায় সব মাঝারি মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরই কন্ট্যাক্ট-ম্যান আছেন, আর বড়দের আছে অফিস।

চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিবেশনায় আগে মাড়োয়ারীদের ছিল বিশেষ আগ্রহ—আগেকার দিনের প্রযোজকদের অধিকাংশ না হলেও অনেকেই ছিলেন মাড়োয়ারী। বর্তমানে কিন্তু এই ব্যবসায়ে কলকাতার মাড়োয়ারীদের আগ্রহ ও অনাগ্রহ দুইই দেখা যায়। কারণ ত্রিবিধ:

প্রথমত, কলকাতায় আর সর্ব-ভারতের জন্য কমার্শিয়াল ফিল্ম বিশেষ তৈরি হয় না। দ্বিতীয়ত, বাংলা ফিল্মের বাজারও বিশেষ সংকুচিত। তৃতীয়ত, ভিডিও পাইরেসির দরুণ লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যায়। আজ যে ঘরে ঘরে ভিডিও-ক্যাসেটে ফিল্ম দেখার ব্যবস্থা।

কথা হচ্ছিল লাড্ডুগোপাল বাজোরিয়ার সঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্পের অবস্থা নিয়ে। তিনি একজন চলচ্চিত্র পরিবেশক, মাঝে মাঝে প্রযোজকের ভূমিকাতেও নামেন। বলছিলেন লাড্ডুগোপালজী: সত্যজিৎ রে, মৃণাল সেন, গৌতাম ঘোষ কা পিকচার কৌন্ লেগা? মেট্রোমে রিলিজ হোনে সে দো উইক হাউসফুল,···লেকিন ঐ টাইম মেটিয়াবুরুজমে? কুত্তা ঘুমেগা হাল পর।···এক দো এওয়ার্ড জরুর মিলেগা···লেকিন

উস্‌মে ফয়দা কেয়া···নুকসান জরুর হোগা···আপকো মালুম হ্যায় সত্যজিৎ রে কা পিকচার কোই হাউস লেনে নেই মাংতা।···তবে কিছু কিছু বাংলা পিকচারে বোক্‌স ওফিস সাকসেস দেখা যায়···তারুণ মজুমদার, তাপন সিনহা কো পিকচার থোড়া কুছ নিশ্চিত হ্যায়···দো-এক নয়া ছোকরা ভি আয়া—সুজিত গুহা, আঞ্জন চৌধুরী···উনকো পিকচার পাবলিক মাংতা।···লেকিন কাম পুরা নেহি হোতা—the return on capital একদম কমি হ্যায়।

Return on capital! একেবারে বাণিজ্যিক অর্থনীতির কথা। লাড্ডুগোপালজী বাণিজ্যিক অর্থনীতি পড়েছেন বলে মনে হয় না, কিন্তু দেখলাম, শাস্ত্রের ঐ গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটি জানেন। শুধু লাড্ডুগোপাজী কেন, সব মাড়োয়ারীই জানেন—হতে পারে সব ব্যবসায়ীই।

এ বিষয়ে চলচ্চিত্র পরিচালকরাও ওয়াকিবহাল। এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী আমার মাধ্যমে মৃণাল সেনের কাছে একরকম প্রস্তাবই পাঠিয়েছিলেন একটা ফিল্ম তৈরীর জন্যে। সব শুনে মৃণাল সেন বলেছিলেন: ছেড়ে দিন। শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই ওরা পিছিয়ে যাবে, না হয় এমন ফিল্ম করতে বলবে যা আমি পারব না—পাঁচটা নাচ, ছ'টা গান···তিনটে মারামারি···না, আমার দ্বারা হবে না।

আরেকটি বিবরণ। এক বেশ বড় শিল্প-ভবনের একজন নবীন কর্তা ফিল্ম প্রযোজনার দিকে ঝুঁকেছিলেন। প্রবীণদের তাতে ঘোর আপত্তি। শেষ পর্যন্ত তাঁরা কিন্তু নিমরাজী হলেন! কর্তা—অর্থাৎ অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের কর্তা—জিজ্ঞাসা করলেন: কেতনা কা বাজেট?

উত্তর পেলেন: পাঁচ-সাত লাখ রূপেয়া হোগা। সম্মতি দেওয়ার সঙ্গে কর্তা এক সর্ত আরোপ করলেন: পরন্তু তুম স্টুডিও কা আশপাশ নেহি ঘুমোগে। নবীন কর্তা রাজী হলেন। শুরু হল চলচ্চিত্র নির্মাণ।

কিছুদিন পরে শুনলাম নির্মাণকার্য বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ? কারণ নবীনটি নাকি স্টুডিওতে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। পরিবারের একজন প্রবীণের ভাষায়—ছোকরা ছোকরিবাজী চালু কর দিয়া থা। উসিকো লিয়ে, বাবু, হামলোগ রূপেয়া দেনা বন্ধ কর দিয়া···three-four lakhs

gone down the drain…যানে দিজিয়ে, ছোকরা ত' বাচ গয়া।

ছোকরা বেঁচেছিল কিনা জানি না, তবে পরিবারটি কয়েক লক্ষ টাকা গচ্চা দিয়ে যে একজন উঠতি সদস্যকে বাঁচাবার প্রচেষ্টা করেছিলেন তা তাঁদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যেরই পরিচায়ক।

একটি পরিবার কিন্তু পারেনি। তিনভাই-এর একজন বোম্বাই-এর রুপোলি পর্দার এক নায়িকার পাল্লায় পড়েছিল। বাবা-ভাইদের শত প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছুই হয়নি। তখন তাকে কিছু ব্যবসা ও টাকা দিয়ে আলাদা করে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সে সর্বস্বান্তই হয়।

মোটকথা ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের অন্যতম সূত্র হল একরকম বিপথগামিতার ভয়। জে. কে. শিল্প-ভবনের একজন বড় একজিকিউটিভ আত্মারাম সারাওগীর সহপাঠী ছিলেন ভুটানের বিদেশ-মন্ত্রী লনপো দাবা সেরিং। মন্ত্রী মহাশয় ভারতের বিভিন্ন বৌদ্ধ-তীর্থস্থান দর্শনের জন্যে হাওড়া স্টেশনে ডুন এক্সপ্রেসের সেলুনে বসে-ছিলেন। আর আমরা এসেছিলাম তাঁকে শুভযাত্রা জানাতে। কথায় কথায় মন্ত্রী মহাশয় আত্মারামজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: What things do you exactly produce?

আত্মারামজী উত্তর দিয়েছিমেন: All that's permitted to be produced in the private sector here—তারপর একটু থেমে, excepting of course film-making, distillation and export of frog legs.

আত্মারামজীর উক্তি হয়ত জে. কে. এবং অন্যান্য কয়েকটি ভবন সম্পর্কে সত্যি, কিন্তু সাধারণভাবে কলকাতার মাড়োয়ারীদের সম্পর্কে নয়। তাঁরা স্বল্পকালীন মূলধন কোনো কিছুতেই লগ্নি করতে পিছপা নন—চলচ্চিত্র নির্মাণ বা ব্যাঙের পা রপ্তানিতেও নয়।

অন্দর মহল—পুজাপাঠ: মাড়োয়ারীদের অন্দর মহল বহুজী-বিন্নিজী, মুন্নামুন্নি, আয়া-দাইয়া, নোকর-নোকরানী, মহারাজ এবং পূজারী-পণ্ডিতের মহল। এর মধ্যে পূজারী-পণ্ডিতেরা মোটামুটি আংশিক

সময়ের জন্য অন্দরমহলের অধিবাসী—তাঁরা সময়মত আসেন এবং পূজার্চনা সেরে চলে যান। কয়েকটি বড় বড় ভবনে অবশ্য তাঁরা স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠানও করেন। এই সব ভবনে স্বভাবতই পূজার্চনার পরিমাণ বেশি।

এই বেশিকম অবশ্য মাড়োয়ারীদের নিজেদের মধ্যে তুলনার মাপকাঠিতে। অর্থাৎ, মাড়োয়ারীদের মধ্যে সাধারণভাবে ভক্তিরসের প্রবাহ বিশেষ প্রবল। এবং এর প্রকাশস্বরূপ তাঁদের প্যানথীআন্ দেবদেবীতে ভরা। তবে সবাই সমান ভক্তি-অর্ঘ্য-পূজা পাননা—এ ব্যাপারে মাড়োয়ারীদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদাত্মক আচরণ লক্ষ্য করা যায়, এবং তার মূলে কাজ করে দোকানদারির দৃষ্টিভংগি।

অর্থনীতির জনক বলে অভিহিত অ্যাডাম স্মিথ ইংরেজদের 'a nation of shop-keepers'—দোকানদারদের জাতি বলে অভিহিত করেছেন। এবং স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মকে এই দোকানদারির সর্বগ্রাসী মোটিফ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে উপদেশ দিয়েছেন। মাড়োয়ারীদের জীবনবেদই হল এই দোকানদারির ধর্ম। এবং এই কারণেই তাঁদের বিশাল প্যানথীআন্ বিরতিবিহীন ভাবে বিশালাকার হচ্ছে।

প্রত্যেক মাড়োয়ারীর গৃহে একটা করে দেবস্থান থাকবেই। ঘরে সম্ভব না হলে খন্দ বা কুলুংগিতে ব্যবস্থা করা হয়। দেবতাকে ওরা বলেন ভগবান। ভগবানের আরাধনা গৃহস্থালি ও ধান্ধা—দুই-এর অন্তর্ভুক্ত বলে ভগবান বাসগৃহের মত দপ্তর-দোকানেও বিরাজ করেন। এবং ভক্তের পূজা পেয়ে থাকেন। এ-ব্যাপারে নিরীশ্বরবাদী জৈন এবং বহুপূজক সনাতনীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বললেও চলে।

অপরিহার্যভাবে অবস্থান করেন এবং পূজা পেয়ে থাকেন এক ভগবান ও এক ভগবতী—সিদ্ধিদাতা গণেশজী এবং ধনৈশ্বর্য প্রদায়িনী লছমীজী। মূর্তি বা প্রতিকৃতি রূপে এই দুই দেবদেবী গৃহে, দপ্তর-দোকানে, এমনকি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারে অধিষ্ঠান করবেনই। এঁদের পূজা করে তবেই ভক্ত দৈনন্দিন কার্যাকার্য শুরু করেন।

অন্যান্য ভগবান ও ভগবতী থাকতে পারেন এবং থাকেনও, গণেশ ও লক্ষ্মী অবশ্য ব্যতিক্রমবিহীন। একবার ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দ মিশনের স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজ (কেষ্ট মহারাজ) লোয়ার রডন ষ্ট্রীটে এক ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারে ঢুকে নির্বাক বিস্ময়ে চারদিকে তাকিয়ে মন্তব্য করেছিলেন : একি আপনার চেম্বার, না ঠাকুরঘর !

ম্যানেজিং ডিরেক্টর হেসে উত্তর দিয়েছিলেন : যো ভি সমঝ লিজিয়ে।

অধিষ্ঠাতা-অধিষ্ঠাত্রী ভগবান-ভগবতী শুধু পুজো পেয়ে থাকেন বললে ভুল হবে, নিষ্ঠার সঙ্গেই পেয়ে থাকেন এবং পরিবারস্থ সকলের কাছ থেকে।

আমি দেখেছি, মধ্যবিত্ত মাড়োয়ারীদের একটি স্কুলে-পড়া ছেলে স্কুলে যাবার আগেই ঠাকুর-পুজো করছে। তার আগেই তার বাবা ও দাদা ঐ নিত্যকর্ম সেরে নিয়েছেন। পুরুষদের হয়ে গেলে তারপর মেয়েদের পালা। তারা তখন বিগ্রহ বা প্রতিকৃতির (দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারও হতে পারে) সামনে এসে বসেন এবং পূজার পালা শেষ করে চলে যান। মেয়েদের মধ্যে যারা স্কুলকলেজে পড়ে তাদেরও এই ধর্মানুষ্ঠান থেকে অব্যাহতি নেই। গোপালের বেগারের মত তারাও যাত্রার জন্যে তৈরি হবার আগে বা তৈরি হয়েই ভগবান-ভগবতীর কাছে অন্তত কয়েক মিনিট প্রণিপাত করে তবেই যাত্রার উদ্যোগ করে বা পা বাড়ায়।

শ্বেতাম্বর জৈনদের পদ্ধতি একটু ভিন্ন। তাঁরা নিরীশ্বর হয়েও দেয়ালে রক্ষিত ভগবান মহাবীর এবং বর্তমান আচারিয়ার প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রণাম করেন। প্রণামের মন্ত্র নিশ্চয়ই আছে, বিড়বিড় করে তাও বলেন, কিন্তু কি বলেন তা ঠিক জানি না।

দেয়ালে ভগবান মহাবীর ও আচারিয়া ছাড়া অন্য প্রতিকৃতি থাকতে পারে এবং থাকেও। কারণ, মাড়োয়ারীদের প্যানথীঅান্ যে বহুধাবিস্তৃত ! তবে বাঙালীর লৌকিক দেবতার বিশেষ অনুপ্রবেশ ঘটেনি। এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক লৌকিক দেবদেবীকে দো নম্বরী বলে বর্ণনা করেছিলেন। গণেশজী ও লছমীজী এবং পরম্পরাক্রমে পারিবারিক ভগবান-ভগবতী ছাড়াও ঠাকুরঘর বা খন্দ-দেয়ালে

যাঁদের প্রায়শই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন তিরুপতিনাথ বরাহরূপী বালাজী, দক্ষিণ ভারত ও পুষ্করের বৈকুণ্ঠনাথ, ভোলেবাবা অর্থাৎ কাশীর বিশ্‌ওয়ানাথজী এবং মুরলীধরজী। সম্পতি বাবা তারক-নাথও মাড়োয়ারী-গৃহে পদসঞ্চার শুরু করেছেন। আবার ইস্‌কনের দৌলতে একা মুরলীধর নন, রাধাকৃষ্ণের যুগল প্রতিকৃতিও ঘরে ঘরে শোভা পাচ্ছে। কিছুদিন আগে থেকে সন্তোষী মায়ের পদধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। তবে বাঙালীদের মত খাদ্যের ব্যাপারে বাছবিচার করে শুক্রবার পালন মাড়োয়ারী মেয়েরা বড় একটা করেন না। অপরদিকে কিন্তু অনেক সনাতনী মাড়োয়ারীর কাছে শুক্রবারই ধর্মবার। ঐদিন তাঁদের কারণ পান বা অন্যপ্রকার উচ্ছৃংখলতা একদম বারণ। কেউ কেউ অবশ্য এই সংযম সাধনা করেন শুক্রবারের বদলে মঙ্গলবার।

এইভাবে অসংখ্য ভগবান-ভগবতীর অবস্থানের জন্যে মাড়োয়ারীদের মধ্যে কারা বৈষ্ণব বা কারা শৈব তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবে বিষ্ণু-উপাসকদের সংখ্যাই বেশি মনে হয়। বালাজী, বৈকুণ্ঠনাথ প্রভৃতি বিষ্ণুরই রূপ। মাড়োয়ারীদের দেওয়ালির শুভেচ্ছা কার্ডে হয় লছমী, না হয় গণেশজী, না হয় বিষ্ণুরই প্রতিকৃতি থাকে।

কোন কোন পরিবারে অবশ্য শিবমূর্তির—শিবলিঙ্গ নয়—দেবাদিদেব মহাদেবের মূর্তির প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। বিড়লা-দের বেলভিউ নার্সিং হোম, ক্যালকাটা মেডিক্যাল ইনস্‌টিটিউট (ক্যাল-কাটা হসপিটাল), অফিস-দপ্তর ইত্যাদিতে মহাদেব মূর্তিই বিরাজমান! এক্ষেত্রে শিবকে সংহারের দেবতা রূপে কল্পনা না করে মঙ্গলময় হিসেবেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মূর্তির সঙ্গে যেন প্রার্থনা জুড়ে আছে: সব শিবময় হোক, সব আধিব্যাধির অবসান হোক (আর বোধহয় অন্যরকম মনস্কামনা পূর্ণ হোক)।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, মাড়োয়ারীদের ঘরে সেই সব ভগবান-ভগবতীই প্রাধান্য পেয়েছেন যারা আশু বরদানে সমর্থ বলে পরিবারের ধারণা এবং ধারণার কারণ হল, ঐ পূজ্য দেবতাকে অবলম্বন করে পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। অন্যান্য দেবদেবী পরধর্মের মত ভয়াবহ

না হলেও ততটা পূজ্য নন। এক প্রথম শ্রেণীর মাড়োয়ারী পরিবারে দেখেছি মহাদেব মূর্তি রয়েছেন ঠাকুরঘরের এক কুলুঙ্গিতে, সেখানেই ফুল ছুঁড়ে দিয়ে পুজো করা হয়—নামিয়ে এনে নয়।

এ সম্পর্কে আলোচনা করায় ঐ বাড়িরই একজন গৃহশিক্ষক মন্তব্য করেছিলেন: The presiding deity is more efficacious, বুঝলে না!

গৃহশিক্ষকটি দর্শনের ছাত্র, এবং এই দর্শন হল প্রয়োগশাস্ত্র বা কার্যকারিকার দর্শন—প্রাগমেটিজম। প্রাগমেটিজমের বিচারেই বোধহয় মাড়োয়ারীদের ঘরে কালীজীর উত্তরোত্তর বর্ধমান হারে অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর এই কালী হলেন ভবতারিণী বা দছছিনা কালী নন, কালীঘাটের কালী বা কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন কালী—যেমন সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর কালী।

কালীঘাটে আমি বছরে একবার করে যাই পারিবারিক পুজো দিতে। পরপর দু'বছর মন্দিরে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কালীঘাটে তিনি কি নিয়মিত আসেন এবং উত্তর পেয়েছিলাম, নিয়মিত নয়, ফি রোজ—ডেইলি।

আমার এক চেনা মাড়োয়ারী তরুণ প্রতি শুক্রবার সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর কালীবাড়ী যাবেই। একবার গাড়ীতে ঐ পথে যেতে যেতে কালীবাড়ীর সামনে লম্বা লাইনের পিছন দিকে তাকে দেখে একটু দূরে গাড়ী থামালাম। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দেখি এক পূজারী গোছের লোক তাকে কিউ থেকে বের করে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। আর মিনিট দুয়েক পরেই দেখি সে ফিরে আসছে—পূজার্চনা সমাপ্ত।

কয়েকদিন পরে তার সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কে তাকে লাইন থেকে বের করে মন্দিরের ভেতর নিয়ে গিয়েছিল?

উত্তর পেয়েছিলাম, কেন! হেড পূজারীর অ্যাসিস্ট্যান্ট। তারপরেই পাল্টা প্রশ্ন: Who would keep on standing in the queue? I have made arrangement with them—whenever come first serve.

—তবে লাইনে দাঁড়িয়েছিলে কেন ?

—Just to test whether they would spot me out and take in. That's the arrangement with them.

ছেলেটির মনস্তত্ত্বের এই দিকটায় বোধহয় দোকানদারি ছাড়াও সামন্ততান্ত্রিকতার ছোঁয়া আছে। জানি বৈশ্যরা ধর্মাচরণ ব্যাপারেও বন্দোবস্ত করে চলেন। আর মনে পড়ল আমাদের জমিদার-অধ্যুষিত গণ্ডগ্রামে সরস্বতী পুজোর আগের দিন নিজের কানে শোনা এক জমিদার-বাবুর তাঁর কুল-পুরোহিতের প্রতি অনুজ্ঞা : ঠাকুর মশাই ! আমার বাড়ির পুজোটা আগে হওয়া চাই—ছেলেপিলেরা বেশিক্ষণ উপবাস করে থাকতে পারবে না···ভুলে যাবেন না দশ ঘরের পুজো করলেও আপনি আমাদেরই কুল-পুরোহিত।

এই 'কুল পুরোহিতে'র ইন্টোনেশনটি আমার ভাল লাগেনি—সেই ছেলেবেলাতেও তা আমার কাছে প্রভুত্বব্যঞ্জক বলেই মনে হয়েছিল। মাড়োয়ারী ছেলেটিরও *just to test*-এর মধ্যে যেন প্রভুত্বের গন্ধ পেয়েছিলাম।

কোম্পানী আমলের সাহেবরা কালীঘাটের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বলতেন Kali, the terrible। স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি কালীকে ভয়ংকরী রূপেই আরাধনা করেছেন। মাড়োয়ারী (কালীপূজক) নবদীক্ষিতদের কাছে কালীঘাট বা সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর কালী ভয়ংকরী নন, বরদাত্রী—যেন লছমীজীরই আরেকটি রূপ।

এ প্রসঙ্গে আলোচনা ওঠাতে একজন মধ্যবিত্ত মাড়োয়ারী ভদ্রলোক উক্তি করেছিলেন : কেঁও নেহি ? আপকা মোহনবাগান-ইষ্টাবেঙ্গল ম্যাচকা দিন দোনো টিম কালীঘাট যাতা নেই ? কিস লিয়ে যাতা—বলিয়ে !

শ্রীচৈতন্যদেব মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই ব্যাপারে বোধহয় তাঁর সব চেয়ে বড় অবদান হল ধর্মানুষ্ঠানকে পথে নামান—নগর-সংকীর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে আপামরসাধারণের মধ্যে ভক্তিরস বিতরণ।

পথে প্রেম বিলোনোর পথে যতই প্রতিবন্ধকতা—আঘাত আসুক না কেন, পরম তিতিক্ষার সঙ্গে তাকে উপেক্ষা করে আঘাতকারীকে আলিঙ্গন করতে হবে—এই ছিল চৈতন্যদেবের ধর্মপ্রচার-রীতির আত্মিক বৈশিষ্ট্য। বলা যায়, এ হল অহিংস অভিযানের চরম দৃষ্টান্ত। এদিক দিয়ে শ্রীচৈতন্যকে মহাত্মা গান্ধীর পূর্বসূরী বলে গণ্য করা যায় না কি ?"

মাড়োয়ারীরা পথেঘাটে মাঠে-ময়দানে ধর্মানুষ্ঠানের পক্ষপাতী, কিন্তু পুরোপুরি অহিংস পদ্ধতিতে নয়। তাঁদের ধর্মীয় জুলুসের সঙ্গে থাকে 'পিতল আঁটা লাঠি কাঁধে' কোঠি-কারখানার দারোয়ান এবং কয়েকজন বন্দুকধারীও। আরও সঙ্গে থাকে পুলিশ—পুলিশকে আগেভাগেই খবর দিয়ে ঠিকমত বন্দোবস্ত করে রাখা হয়।

জুলুসের চেয়ে সমাবেশের দিকেই মাড়োয়ারীদের ঝোঁক বেশি। সমাবেশ হয় অনুমতি-প্রাপ্ত ময়দানের কোন স্থানে প্যাণ্ডেল করে, অথবা সমাবেশ যদি স্বল্পজনের জন্যে হয় তবে কোন নামকরা সভাঘরে। এই সেদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে হরি-গীতা-রামায়ণ প্রচার সমিতির অধিবেশনে প্রতিদিন গড়ে এক লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল। সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় এঁদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন ছিলেন মাড়োয়ারী এবং তাঁদের মধ্যে আবার মহিলার সংখ্যাই ছিল বেশি।

মহিলাদের সংখ্যাধিক্যের জন্যেই সমাবেশের আগে বা পরে জুলুস বের করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবুও হরি-গীতা-রামায়ণ প্রচার সমিতির অধিবেশন শেষে জুলুস বেরিয়েছিল এবং তার শেষভাগে ছিল মোটর-গাড়ির এক বিরাট শোভাযাত্রা। মহিলাদের অধিকাংশ মোটরগাড়িতে সেই জুলুসে যোগ দিয়েছিলেন। সমাবেশ ও জুলুসের অসংখ্য মোটর-গাড়ীর মধ্যে শৃংখলার জন্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই রকম যথাযোগ্য ব্যবস্থাই করা হয় যখন মাড়োয়ারী মন্দিরের অধিষ্ঠাতা বিগ্রহ পথ-পরিক্রমায় বের হন। তখন অবশ্য পদচারীর সংখ্যাই বেশি হয় এবং পদচারিণী বড় একটা নজরে পড়ে না।

পূজাপার্বণ : পূজাপাঠ এবং পূজাপার্বণ সম্পূর্ণ সমার্থক শব্দ নয়।

কারণ, অন্তত বাংলায় পার্বণ বলতে বোঝায় কোন-না-কোন উৎসব। এবং এই উৎসব অন্তত পরোক্ষভাবে আনন্দধারার ইঙ্গিত বহন করে। বাঙালীদের দোল-দুর্গোৎসব বা পৌষ পার্বণে এই ইঙ্গিত নেই কি?

মাড়োয়ারীদের পার্বণ-সংখ্যা সীমিত—দেওয়ালি এবং ভাইদুজ বা ভাইফোঁটা। এর মধ্যে আবার দেওয়ালিই প্রধান। সনাতনী ও জৈনী[১] —দুই গোষ্ঠীর কাছেই দেওয়ালি আনন্দধারার বাহক।

সনাতনী বা হিন্দু মাড়োয়ারীর কাছে দেওয়ালি উৎসব হল শ্রীরাম-চন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের দিন বলে। রামচন্দ্র ফিরে এলে অযোধ্যা-বাসীরা শত-সহস্র দীপ জ্বালিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিল প্রিয়জন ঘরে ফিরছে বলে নয়, তিনি রাবণ বধ করে ফিরেছেন বলে। কিন্তু রাবণ কি মন্দের দ্যোতক? তাই যদি হয় তবে যুদ্ধে পতিত রাবণের কাছে শ্রীরামচন্দ্র রাজনীতি শিক্ষালাভ করতে গিয়েছিলেন কেন? হরণ করা ছাড়া সীতা সম্পর্কে রাবণের বিরুদ্ধে আর কি অভিযোগ আনা যায়? আর এই হরণও কি আত্মমর্যাদার পরিচয় প্রদানের জন্যে নয়? যাক সে কথা।

জৈন মাড়োয়ারীদের কাছে দেওয়ালি উৎসবের দিন। কারণ, এই শারদ অমাবস্যাতেই ভগবান মহাবীর কৈবল্যজ্ঞান—মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন বলে বিদিত। কৈবল্যজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্যার আকাশে অসংখ্য তারকা বহুগুণ দ্যুতি লাভ করে সবদিক আলোয় ভরিয়ে দিয়েছিল—পূর্ণিমাকেও হার মানিয়েছিল।

সনাতনী হোক বা জৈনীই হোক, দেওয়ালি চলে তিন-চার দিন ধরে। বিভিন্ন কোঠি বৈদ্যুতিক আলোয় সজ্জিত হয়ে ওঠে—আতসবাজি পোড়ে কোটি কোটি টাকার। শেষেরটাতে বাঙালী ও অন্যান্যরাও শামিল হয়। কিন্তু মাড়োয়ারীদের সঙ্গে তাঁদের পরিমাণভেদ অনেক। দেওয়ালির দিন বা তার আগের দিন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দিয়ে যান, দেওয়ালি উৎসবে মাড়োয়ারীদের আলোকসজ্জা ও আতসবাজি পোড়ান সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন। ঐখানেই যে দ্বিতীয় শ্রেণীর হলেও

১. 'সনাতনী'র সঙ্গে মিলিয়ে ওঁরা জৈনীই বলেন।

বেশি মাড়োয়ারীর বাস।

আগে জ্বালান হত দীপ, তা থেকে উৎসবের নাম হয়েছিল দীপাবলী—আলোকের উৎসব বা Festival of lights. 'লাইটস' এখনও আছে, তবে দীপের বদলে বৈদ্যুতিক আলো—আরো অনেক বেশি আলোক বিকিরণের ব্যবস্থা। উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সকল দিক।

শোভন করার প্রচেষ্টা হয় সমগ্র পরিবেশকে। ঘরবাড়ি, তৈজসপত্র কোনকিছুই বাদ যায় না। বাঙালীদের দুর্গাপুজোর প্রতিমা গড়ার মত দেওয়ালির জন্যে মাড়োয়ারীদের সাফাই-এর কাজ শুরু হয় মাসখানেক আগে থেকে। নোকর-নোকরানীদের কাজ বাড়ে, পরিজনরাও হাত বাড়ায়।

যথাসম্ভব বা প্রয়োজনমত তৈজসপত্র কেনা হয়—আমাদের পুজোর পোশাক-পরিচ্ছদের মত। তবে তফাৎ হল আমাদের ক্ষেত্রে গৃহিণীর শাড়ি তাঁর নিজের জন্যে, মাড়োয়ারীদের বাসনপত্র সমগ্র পরিবারের জন্যে।

উৎসব ভেট পাঠাবার সুযোগ এনে দেয়। এবং মাড়োয়ারীরা এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারের প্রচেষ্টাই করে থাকেন। ব্যবসায়ীর জাত তো!

ওঁরা ভেট বিশেষ করে পাঠান ঠিক দেওয়ালীর আগে পারচেজ অফিসারদের, অর্ডার সাপ্লায়ারদের, ব্যাংক-অফিসারদের, ইনকাম-ট্যাক্স অফিসারদের, সলিসিটার-উকিলদের, এলাকার থানার বড়বাবুদের—মোটকথা যেখানেই ধান্ধার আকর্ষণ, সেখানেই।

একবার সল্টলেকের এক বাড়িতে দেওয়ালির আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় বসে গৃহস্বামীর সঙ্গে গল্পগুজব করছি, এমন সময় দরজা খোলবার নির্দেশসূচক ঘন্টি বেজে উঠল। গৃহস্বামী নিজেই উঠে দরজা খুলে আকাংক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাউকে দেখতে পেয়ে আহ্বান জানালেন: 'আইয়ে, আইয়ে।' ঢুকলেন এক স্থূলকায় মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এবং তাঁর পশ্চাতে বৃহৎ প্যাকেটবাহী ভৃত্যস্থানীয় এক ব্যক্তি। প্যাকেটটি সেন্টার টেবিলে রেখে সেই ব্যক্তি চলে গেল। আগন্তুক তখন হাতজোড় করে

গৃহস্বামীকে বললেন : বাচ্চাবাচ্চিকো লিয়ে থোড়েসে···বলেই উঠে দাঁড়ালেন। গৃহস্বামী তখন অনুরোধসূচক স্বাভাবিক প্রশ্নই করলেন : থোড়া রুকিয়ে গা নেহি ? এক কাপ চায়···

—নেহি চ্যাটার্জি বাবু, আউর কোই কোই জাগা যানে হোগা।···

চলে গেলেন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এবং দরজা বন্ধ হতে না হতে ভেতর থেকে ছুটে চলে এলেন গৃহস্বামিনী—দেখি দেখি, কি দিল ?—বলেই তিনি প্যাকেটটা খুলে ফেললেন। প্যাকেটে বাজি আর বাজি, সঙ্গে দুটো ফুলদানি আর একটা লাড্ডুর বাক্স।

—ওমা এই ! আমাকে না হয় না দিলো, মেয়েটাকে একখানা শাড়িও তো দিতে পারত।—হতাশায় ভেঙে পড়লেন গৃহস্বামিনী।

গৃহস্বামী একটু হাসলেন। বললেন, একটু ভুল বলা হল—বলা উচিত ছিল, মেয়েটার না হোক তোমার অন্তত একখানা শাড়ি দেওয়া উচিত ছিল।···

সমর্থন বা প্রতিবাদ না করে ভদ্রমহিলা একবার তাঁর স্বামীর, একবার আমার দিকে তাকিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, ভদ্রলোক এক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ার—তাঁর অনুমোদন ছাড়া কোম্পানীর ঐ বিভাগের কোন অর্ডার বেরোয় না।

দেওয়ালির দিনই মাড়োয়ারীদের ঘরে ঘরে হয় লছমীপূজা। বাচ্চারা এধারে বাজি পোড়ায় আর বয়স্করা হাত জোড় করে বসে থাকেন লছমীজীর বিগ্রহ বা পটের সামনে। পূজাপাট সমাপ্ত হয়ে গেলে বয়স্করা উঠে পড়ে আরও বয়স্কদের ধোক খান—অর্থাৎ প্রণাম করেন। তারপর ভাল জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়েন পাশাপাশি বাড়ির বা ফ্ল্যাটের গুরুজনদের ধোক খাবার[১] জন্যে। সে পর্ব সমাপ্ত হলে কারও বাড়ি বা ফ্ল্যাটে বসে তাসের জুয়ার আড্ডা—এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চলে কারণ-বারি সেবা।

দেওয়ালির দিন জুয়াখেলা নাকি শাস্ত্রীয় বিধির অন্যতম। বিশেষ করে

১. নিচু হয়ে প্রণাম।

অবাঙালীদের মধ্যে বিধিটি বিশেষ প্রচলিত, আর মাড়োয়ারীদের বেলায় ব্যতিক্রমবিহীনও বলা চলে। শুধু বয়স্ক পুরুষ নয়, গৃহিণীরা এবং সবে শ্মশ্রুরেখার উদ্‌গম হয়েছে এসব কিশোররাও বাদ যায় না। তবে কিশোরীদের এই রীতির আধিপত্য বড় একটা দেখিনি। কারণটা ঠিক জানিনা। শুনেছিলাম কোন এক স্মার্তের বিধান হল বিয়েশাদির আগে মেয়েদের জুয়াখেলাটা অনুচিত। কিন্তু কেন? অবিবাহিত কিশোরীরা উপার্জন করে না বলে এবং শাদির পর স্বামীর উপার্জনের অংশীদার হয় বলে? আমার মনে হয় ব্যবস্থাটা পুরুষ-প্রাধান্যেরই একটা দিক। তবুও কিন্তু কিশোরীরা লুকিয়ে লুকিয়ে তাস খেলে। তবে সব সময় বাজি ধরে না।

দেওয়ালির পরের দিনটি হল মিলবা-জুলবার দিন—আমাদের বিজয়ার পরবর্তী অধ্যায়ের মত। ঐ দিন বাড়ীর কর্তা বসে থাকেন শুকনো ফল, এলাইচি, রঙিন সুপারি এবং অন্যান্য মুখশুদ্ধি (আজকালকার দিনে পানমশলারও প্রচলন হয়েছে) নিয়ে। কোন কোন বাড়িতে আবার লাড্ডুও রাখা হয় এবং পানও। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের অধিকাংশ চিনিকলের মালিক হলেও মাড়োয়ারীরা মিঠাই-এর খুব ভক্ত নন, আর অনেকেরই তাম্বুল চর্বনের অভ্যাস থাকলেও মিলবা-জুলবার দিন তার পরিবেশন পরিহারের প্রচেষ্টাই করা হয়। কারণ, অতিথি-অভ্যাগত পান খেয়ে যে প্রকাশ্য স্থানে পিক ফেলবেন না, তার নিশ্চয়তা কি? তবে অনেক সময় গাড়িতে ওঠবার পর পান বাড়িয়ে দিয়ে গৃহভৃত্য বলে: বাবুজীনে পান ভেজা—পিক যদি ফেলতেই হয় তবে রাস্তায় ফেলুন। দেওয়ালি উৎসবের জন্যে অনেক মাড়োয়ারী হৌসেই দু-দিনের ছুটি দেওয়া হয়। ব্যাংক-হলিডে না হওয়ার দরুণ দেওয়ালির পরবর্তী দিন অফিস খোলা থাকলেও আপনি মিলবা-জুলবার পর বিকেলে আসতে পারেন, অথবা সই করে কেটেও পড়তে পারেন। উৎসবানুষ্ঠানে বাধা দেবে কে?

দেওয়ালির পরদিনই ভাইদুজ—আমাদের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। তফাৎ হল যে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে আমরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভগিনীর বাড়ী যাই, কিন্তু মাড়োয়ারীদের বেলায় আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভগিনী

আসেন ভ্রাতার বাড়ী। সুতরাং উৎসব অনুষ্ঠিত হয় পিত্রালয়ে —খরচ-খরচা সেই পরিবারেরই, তবে ভগিনী হাতে করে কিছু মিঠাই নিয়ে যেতে পারেন—পইলে ভেজ দেনে ভি সকতা।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম: ভাইদুজকো লিয়ে বহিন ভাইকা কোঠি কেঁও যাতী?

উত্তর পেয়েছিলাম সহজ এবং সংক্ষিপ্ত: ভাইকো অফিস যানে হোতা হ্যায়—ইস লিয়ে।

ভেবেছিলাম তা তো বটেই। দেওয়ালির দু'দিন বা দেড়দিন ছুটির পরই ভাইদুজ। সেদিন আবার আধা বা পুরো কামাই? না, অসম্ভব। অজুহাত—বাহানা ইত্যাদি অবলম্বনে চাকরিজীবীরা কর্ম ও কর্মস্থল থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করতে পারেন, ব্যবসায়ীরা নন।

বাগডোগরা থেকে ফিরছিলাম। গিয়েছিলাম ডুয়ার্সে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের চা-বাগানে বজরঙ্গবলীর মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে। ভদ্রলোকের সংগে ভদ্রলোকের স্ত্রী এবং তাঁদের অফিসের দু'তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীও গিয়েছিলেন।

কলকাতা বিমান বন্দরে নেমেই ভদ্রলোক আমাকে বললেন: We are going straight to office. You please drop Aparna, then go home.

উক্তির প্রথম অংশটি একটি ঘোষণা—ও'রা সোজা অফিস (যদিও বেলা তখন ৪টে—বিমানবন্দর থেকে বি. বা. দী. বাগের অফিসে পেঁছুতেই পাঁচটা বেজে যাবে)। দ্বিতীয় অংশটি একটি মোলায়েম অনুরোধ—ভদ্রলোকের স্ত্রীকে ও'দের বাড়িতে ছেড়ে তবেই যেন আমি বাড়ি যাই। গাড়িটা ও'দেরই—সুতরাং অনুরোধটা ছিল কিছুটা দোকানদারীর অংগীভূত। যেমন অংগীভূত হল দোকান-অফিসের বিরতিবিহীন হাতছানি।

ভাইদুজের দিন বহিনের হাতে কোনরকমে ফোঁটা নিয়ে, ভাই-বোনের মধ্যে লেনদেনের কাজ তড়িঘড়ি সমাপ্ত করে মাড়োয়ারীরা ছোটেন কর্মস্থল অভিমুখে। সেখানে তো দায়সারার মত কোন ব্যাপার নয়!

অনেক মাড়োয়ারী পরিবারে ভাইদুজের মতই আর একটা অনুষ্ঠান হয় হোলির দিন বা তার আগের দিন। তবে সময়

বসন্ত পূর্ণিমার মধ্যে হওয়া চাই। এর নাম বোধহয় বহিনমিলাপ—পরঘরী বহিনের সংগে পুনর্মিলন। বহিন অবশ্য কলকাতারও হতে পারেন, তবুও তো পরঘরী।

মিলাপের জন্য বহিনই আসেন ভাইয়ের বাড়ি, ভাইয়ের কপালে চন্দন-দই-আতপচালের ফোঁটা—পত্রলেখা এঁকে দেন। হয়তো কিছু উপহার সংগে নিয়ে আসেন। ভগিনী ফিরে গেলে সুরু হয় উপহার প্রেরণের বিপরীতমুখী গতি—ভাইয়ের বাড়ি থেকে বহিনের বাড়িতে। বহনকার্য সম্পন্ন করে নোকর-দাইয়া-ড্রাইভাররা। কিন্তু উৎস ও গন্তব্যস্থান হল যথাক্রমে ভাইয়ের বাড়ি থেকে বহিনের বাড়ি।

হোলির কদিন পরেই হয় 'সিন্ধারা'। এর সম্পূর্ণটাই মেয়েদের ব্যাপার হলেও বাঈদের পিত্রালয়ে আগমনের সুযোগ ঘটে। উৎসবের দিনে পটু স্ত্রীলোক এসে ছোট বড় সব মেয়ের হাতেই মেহেদীর চিত্রাংকন করেন। তারপর বাঈরা ফিরে যান নিজ নিজ শ্বশুরালয়ে, সংগে কিছু মিষ্টান্ন ও কিছু নগদ নিয়ে। এই মিষ্টান্ন ও অর্থ আসে পিতা-ভ্রাতার কাছ থেকে ভাবীর মাধ্যমে।

এই মিষ্টান্ন প্রদানের একটা নাকি ইতিহাস আছে—

রাজস্থানের চুড়ু, না দিদওয়ানা অঞ্চলে গাংগোর বলে একজন বিখ্যাত হালবাই ছিলেন। সিন্ধারায় পিত্রালয়ে এসে বাঈরা সেই গাংগোরের মিঠাই-এর খোঁজ করতেন। এর ফলে প্রচলন ঘটল নগদের সংগে এক হাঁড়ি করে মিষ্টান্নও দেওয়ার। এই গাংগোরা থেকেই কলকাতার বিখ্যাত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান গাংগুরাম* শব্দটির উৎপত্তি কিনা জানি না, তবে আসল গাংগোরের মিষ্টান্নর দোকানও খুলেছে রাসেল স্ট্রীটে।

আগে এই সিন্ধারা উৎসব হত আষাঢ়িয়া বা শ্রাবণী পূর্ণিমায়। বর্ষাকাল বলে, বিশেষ করে কলকাতার রাস্তায় জল জমে বলে অনুষ্ঠানের জনো বসন্ত-পূর্ণিমাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। তবে কোন কোন পরিবারে অনুষ্ঠান বছরে দু'বার হয়। ভাইদুজ ও বহিন-মিলাপ মিলে যদি বছরের দু'সময়ে দুটো উৎসব হতে পারে, তবে সিন্ধারা অনুষ্ঠানও বছরে দু'বার করলে ক্ষতি কি?

* মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক

হোলির আর এক নাম বসন্তোৎসব। ওই দিন রং দেওয়া, আবির ছড়ানো তো আছেই, তার ওপর অনেক সময়ই হয় কাবালি ও ঢপের অনুষ্ঠান।

রং দেওয়া, আবির ছড়ানোয় কোন বৈচিত্র্য নেই, আছে কাবালি ও ঢপে।

কাবালি বোধহয় আমাদের কাওয়ালি কিন্তু দরবেশী সুর নয়, বরং তরজা জাতীয় ব্যাপার—কবিগান। সম্প্রদায়ের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : কাবালি কৌন চীজ হোতা হ্যায়? উত্তর পেয়েছিলাম : দো পছ্[১] পোয়েট্রি বানায়কে এ উনকো গালি কাটতা হ্যায়।

কাবালি বাড়ির চত্বরে হতে পারে, আবার কোন সভাঘরেও হতে পারে। সভাঘরে হ'লে টিকিট বিক্রী অথবা কার্ড বিলানো হয়। উপস্থিতির পরিমাণ নির্ভর করে উদ্যোক্তাদের সংগঠন-শক্তির ওপর। কাবালি শুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা যায় —কেয়া বাত, কেয়া বাত এবং ঘন ঘন করতালি।

একবার এক কাবালির আসরে গিয়েছিলাম—অর্থাৎ যেতে হয়েছিল। প্রথমটাই ছিল দুই কবিয়ালের মধ্যে পত্নী-প্রতিযোগিতা, যা ডি. এল. রায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। লড়াইয়ের কবিতার বেশিটাই ভুলে গেছি, তবে দুটো লাইন মনে আছে :

মেরা বিবি হোতী বি. এ.
মায় উনকী কুছ্ বুলতা নেহি
উঁসি লিয়ে।…

—আরও মনে আছে সঙ্গে সঙ্গে করধ্বনিতে চারদিক ভরে গিয়েছিল, আর ঐকতান না হলেও আওয়াজ উঠেছিল : কেয়া বাত, কেয়া বাত, সাবাস, সাবাস।

কাবালির বদলে ঢপ অনুষ্ঠিত হলে তা হয় মালিকের বা বহুতল বাড়ির চত্বরে। শুনেছিলাম ঢপই হল আসল ফাগুয়ালি—বসন্তোৎসব। অনুষ্ঠানটিকে আমার স্থূল কামোদ্দীপক বলেই মনে হয়েছিল। হয়ত আদি বসন্তোৎসবেরই একটা অঙ্গ ওটা। তখনকার দিনে আদিরসের ওপর সাহিত্য থাকলেও তা পরিমাণে

১. দু-পক্ষ

ছিল অত্যল্প, আর ক'জনের হাতেই বা তা পেঁছুত আর ক'জনই বা তা পড়ে তার রসাস্বাদন করতে পারত! সুতরাং ঢপের মতো ব্যাপারই ছিল লোকরঞ্জনের মাধ্যম।

এই রকম একটা ঢপের আসরে একটা ঘটনা ঘটেছিল তার বিবরণ যথাস্থানে দেব। এখন ঢপের বৈশিষ্ট্য-পরিচায়ক আর একটা ঘটনার উল্লেখ করি।...

...ঢপে যতি পড়েছিল। তারপর উদ্যোক্তাদের একজন ঢপ পরিবেশনকারীদের নির্দেশ দিলেন: ফিন শুরু কর দিজিয়ে ভেইয়া। ওঁরা ছেলে মেয়ে সবাইকে ভেইয়া বলে সাধারণত সম্বোধন করে থাকেন। এক্ষেত্রে ভেইয়া তো বটেই। কারণ, সবাই পুরুষ, প্রয়োজনমত নারী সেজেছে। এতে একটা সুবিধা যে, সহজাত লজ্জা না থাকায় সীমারেখা ছাড়িয়েও বেহল্লাপনা করা যায়।

পুনরাম্ভের আগে একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন: রুংতাজীকা বিবি রুংতাজীকো লেকর বিচমে কেঁও চলা গিয়া? নিদ আ গিয়া থা? উত্তর এল: মেরা খেয়ালসে গরম হোগিয়া থী। এতনা দেখকর কোই কোই রোখনে নেহি সকতী.... সমঝিয়ে না।—বক্তা চোখের ইংগিত করে হো হো করে হেসে উঠলেন।...

দুটো কথা। ঢপ গাওনায় ছোটে সরাবের ফোয়ারা, আর মধ্যবিত্ত মাড়োয়ারী সমাজেই কাবালি ও ঢপ অনুষ্ঠিত হয়।....

অতিপ্রাকৃত: ধর্মের সঙ্গে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের বোধহয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, অন্তত দুর্বল মনের কাছে। মাড়োয়ারীরা অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাস করেন, আবার করেনও না। বিশ্বাস করেন তখনই কারবারে যখন দেখা দেয় মন্দা, আর কারবার তেজী হ'লে শুধু ধর্মানুষ্ঠান—আওর ভি দেনা ভগ্‌বান।

ওই সম্প্রদায়ের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এই অতিপ্রাকৃত বিষয়ের আলোচনাকালে মন্তব্য করে ফেলেছিলাম: ওসব ঝুট বাত। উসসে কুছ্ নেহি হোতা। চটে গিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন ভদ্রলোক: আপ কুছ নেহি জানতা। সাধুলোক পানিসে ভি দিয়া জ্বালানে সকতা।

তেলের বদলে জল দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো! জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আপ খুদ দেখা ?

—নেহি জী। শুনা সাঁই বাবাকে কহানী।

তখন তিনি কাহিনীটাই শুনিয়েছিলেন।

—সিরদির সাঁই বাবা ভিক্ষা করতেন দুটি জিনিস—দৈহিক প্রয়োজনে সামান্য খাদ্য আর চিরাগ জ্বালাবার জন্য একটু তেল। দ্বিতীয় ব্যাপারটিতে তিনি বোধহয় পার্শীদের অনুসরণ করতেন —তিনি যে মসজিদে থাকতেন, দিনরাত সেখানে অনেকগুলো চিরাগ জ্বালিয়ে রাখতেন। একদিন হলো কি, আশেপাশের দোকানদাররা যারা তাঁকে মুষ্টিভিক্ষা ও তেল দিত তারা সিদ্ধান্ত করল ফকির সাঁইকে নিয়ে একটু মজা করতে হবে।

সাঁই এলেন তেল চাইতে, কেউ কিন্তু এক ফোঁটা তেলও দিল না। সাই ফিরে গেলেন কোন অনুরোধ বা অভিযোগ না করে।

—চল, দেখা যাক ফকিরটা কী করে,—একজন বলল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই চলল সাঁইবাবার আশ্রয়স্থল সেই মসজিদের দিকে।

মসজিদের বাইরে থেকে তারা যা দেখল তাতে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের সীমারেখা আর রইল না—দেখল যে, সাঁইবাবা একটা মাটির পাত্র থেকে জল নিয়ে সেইসব চিরাগে ভরছেন, আর চিরাগ-গুলো যেন তেল ভর্তি হয়ে জ্বলে উঠছে। দোকানদারেরা তখন সাঁইবাবার পায়ের ওপর পড়ে ক্ষমা চাইতে লাগল—যেন তিনি অভিশাপ না দেন।···

বিবরণ শেষ করে ভদ্রলোক আমাকে বললেন : আভি আপ কেয়া বুলে গা ?[১] বলবার কিই বা ছিল ? তবু মন্তব্য না করে পারলাম না যে, সাঁইবাবার মতো মহাপুরুষের দেখাই বা কোথায় পাওয়া যাবে, আর তিনি আপনার জন্যে অতিপ্রাকৃত কাজ করবেনই বা কেন ?

—সহী বাত,—স্বীকার করলেন ভদ্রলোক। কিন্তু ছাড়লেন না, বললেন : থোড়া ছোটা কোই ত মিলনে সকতা। আপকো কোই জানাচিনা হ্যায় ? ফেক্‌টরীঠো জমাতাই নেহি।

১· ব্যাপারটা আমারও জানা ছিল—সাঁইবাবার ওপর চলচ্চিত্রে দেখেছিলাম আর তাঁর জীবনীতেও পড়েছিলাম (Arthur Osborne : The Incredible Sai Baba)

ভদ্রলোকের নতুন কারখানা মোটেই ভাল চলছিল না, এবং সেই প্রসঙ্গেই উঠেছিল অতিপ্রাকৃতের আলোচনা।

অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস ও জ্যোতিষীতে শ্রদ্ধা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই কারণে দুর্দশায় পতিত মাড়োয়ারীদের কাছে জ্যোতিষীদের বিশেষ খাতির। অবস্থা বুঝে পণ্ডিত-পূজারীরাও জ্যোতিষী জানার ভান করে থাকেন। এটা যে তাঁদের পেশার একটা অঙ্গ!

একবার ডুয়ার্সের নাগরাকাটা চা-বাগান অঞ্চলে পুরো মার্চ মাস এবং পনেরই এপ্রিল পর্যন্ত এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। বাগান-মালিকদের মাথায় হাত—ফার্স্ট ফ্ল্যাসের[২] টাকা ঘরে আসছে না, ওদিকে ব্যাঙ্কের কাছে সুদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে।

ডেকে পাঠালেন কর্তা গৃহপণ্ডিতকে—আপ কুছ করনে সকেঙ্গে?

পণ্ডিত আশ্বাস দিলেন—নিশ্চয়ই, তবে যজ্ঞানুষ্ঠান করতে হবে কাশী বা বিন্ধ্যাচলের পণ্ডিত দিয়ে।

বিন্ধ্যাচল থেকেই চারজন পণ্ডিতকে আনান হলো, কলকাতা থেকে উপচার।

বৃষ্টি হল সাতদিন পরে। কর্তা সোল্লাসে ছোটবাবু—অর্থাৎ পুত্রকে বললেন: শুনা, বাগিচামে বহুত ব্যারিষ হুয়া?

—হাঁ শুনা, ছোটবাবু উত্তর দিলেন, —আশপাশ সব বাগিচামে। লেকিন খর্চ ত মেরাই লাগা—আওর কিসিকো নেহি।

তীর্থদর্শন ধর্মানুষ্ঠানেরই একটা অঙ্গ। নিজে তীর্থদর্শনের ওপর তীর্থস্থানে যাত্রীনিবাসের ব্যবস্থা করতে পারলে পুণ্য সঞ্চয়ের পরিমাণ নিশ্চয়ই বেশি হয়। মাড়োয়ারীরা দু-ব্যাপারেই বিশেষ আগ্রহী।

একবার দোলের সময় বারাণসী গিয়েছিলাম। উঠেছিলাম গোধুলিয়ার জয়পুরিয়া ধর্মশালায়—বা আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে, জয়পুরিয়া গেস্ট হাউসে। ঘরের বন্দোবস্ত আগে থেকে করা থাকলেও গিয়ে দেখি কোন ঘরই খালি নেই। ছোকরা ম্যানেজার

২· শীতের পর বসন্তে প্রথম পত্রোল্লাস

মধুসূদন চেনা লোক। সে হাত জোড় করে বলল: সামকো এক কামরা মিল যায়গা, বাবুজী (সে আমাকে সম্ভ্রমের সঙ্গে বাবুজী বলেই ডাকে); তব তক আপলোগ চবুতরমেই ঠারিয়ে। ম্যয় সব কুছ ইন্তিজাম কর দেতে হেঁ।···

সপরিবারে চবুতরেই কয়েক ঘণ্টা কাটাতে হল। আমাদের একা নয়, অনেক পরিবারকেই এবং তাঁদের অধিকাংশই কলকাতা থেকে আগত মাড়োয়ারী।

হোলির সঙ্গে বাবা বিশ্বনাথ দর্শনের কী সম্পর্ক তা বুঝতে পারিনি, তবে জেনেছিলাম প্রত্যেকটা পর্বদিনেই বারাণসীতে কলকাতার মাড়োয়ারীদের অমনিই ভিড় হয়, আর শিবরাত্রির সময় তো কথাই নেই। বোধহয় ওঁদের বিশ্বাস, পর্বদিনে তীর্থদর্শনে বেশি পুণ্যসঞ্চয় হয় তা যে-কোন পর্বই হোক না কেন।

আর একবার দোলের সময় পুরীর সমুদ্র সৈকতে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। পরদিন হোলি। ভদ্রলোক জানিয়েছিলেন: ম্যয়নে বৃন্দাবন যানে মাঙাথা, লেকিন টিকট মিলা নেহি। আ গয়া জগন্নাথ-পুরী। এভি কৃষণ-ভগ্‌বানকা এক রূপ। হ্যায় না? ভদ্রলোক অদ্বৈতবাদের পথে এগিয়ে চলেছেন কিনা বুঝতে পারিনি।

তবে গৃহদেবতার মতো মাড়োয়ারীদের প্রিয় তীর্থস্থানও আছে, এবং তা নির্ভর করে সম্প্রদায়ের রূপের ওপর—জৈন সনাতনী শৈব বৈষ্ণব ইত্যাদি অনুসারে। একবার রাজগির থেকে সকালে যাচ্ছিলাম নালন্দার দিকে। পাশের ঘরেই ছিলেন এক মাড়োয়ারী পরিবার। তাঁরাও সকালে রওনা হবেন বলেছিলেন। ট্যুরিস্ট লজের গাড়ি-বারান্দায় দুদলের গাড়ি প্রস্তুত। যাত্রার আগে মাড়োয়ারী পরিবারের কর্তা নমস্কার করে বললেন: কলকাত্তামে ফির মিলুঙ্গা।

কলকাত্তামে মিলুঙ্গা! তাহলে ওঁরা কি নালন্দা যাচ্ছেন না? না, নালন্দা নয়, যাচ্ছেন পাওয়াপুরীর দিকে—ভগবান মহাবীরের সমাধিস্থল। পাওয়াপুরী থেকে সোজা কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ওঁরা তীর্থদর্শনেই বেরিয়েছেন, কোন এস্ককারশনে নয়।—মন্তব্য করেছিলেন ভদ্রলোক।

আর একবার উদয়পুরের গার্ডেন হোটেলে এক মাড়োয়ারী পরিবারের সঙ্গে আলাপ। ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের স্ত্রী এবং বৃদ্ধা মা। শুনলাম ওঁরা এসেছেন রণকপুর যাবার জন্যে। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম নাথদ্বার যাবেন কি না। সংক্ষিপ্ত উত্তর পেয়েছিলাম : নেহি জী! ম্যয় লোগ জৈনী হ্যায়।

এই জৈনী-সনাতনীর প্রভেদ কিন্তু ঘুচে যায় কেদার-বদরির মত জনপ্রিয় তীর্থের বেলায়। ওইসব তীর্থে যাওয়া একরকম মর্যাদার পরিচায়ক হিসেবেই গৃহীত হয়েছে—লোককে বলা যায় না যে কেদারবদরি যাইনি। গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী হলে আরও ভাল। তবে মাঝে মাঝে স্থান-মাহাত্ম্যের ছাপও পড়তে লক্ষ্য করা যায়।···

অলকানন্দার পুল পেরিয়ে বদরিনারায়ণের মন্দির থেকে ফিরে এলেন সস্ত্রীক শ্রীগোবিন্দলাল পসারি। আমরা আগের দিন সন্ধ্যায় বিড়লা ধর্মশালায় উঠেছিলাম। ওঠার আধ ঘণ্টার মধ্যে পান্ডা এসে হাজির হল। সেই পাণ্ডার মুখেই শুনেছিলাম পসারিজীরা মন্দির যেতে চান না, কারণ তাঁরা জৈনী। সেই পসারিদেরই দেখলাম মন্দির থেকে ফিরছেন এবং স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মুখে এক পরিতৃপ্তির ভাব। হয়ত স্বর্গীয় ভাব একেই বলে!

সেদিন দুপুরেই বাজারে পসারিদের সঙ্গে আলাপ হল বেশ অনেকক্ষণ ধরেই। আলাপে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি একটা ব্যাপারে যা জানালেন তার মর্মার্থ হল এইরকম এবং অনন্যসাধারণ : ওঁরা জৈন—নিরীশ্বরবাদী। ওঁদের পক্ষে কোনপ্রকার মূর্তিপুজা ধর্ম-বিগর্হিত কাজ। বদরিনারায়ণে এসেছিলেন তীর্থদর্শনে নয়, বলতে পারেন প্রমোদভ্রমণে। ঠিক করেছিলেন মন্দিরে আর যাবেন না। কিন্তু তা সম্ভব হল না। যেন এক অশ্রুত আহ্বান রাত থেকেই তাঁদের ডাকতে লাগল। স্বামী-স্ত্রী কারও রাত্রে ভাল ঘুম হল না। ভোরে উঠেই দু'জনে পরামর্শ করে প্রাতঃক্রিয়ার পরই চললেন মন্দিরে। আস্নান ভি কর লিয়া থা।···কোন পাণ্ডা সঙ্গে নেন নি—জরুরত ভি নেহি থা। পাশের দোকান থেকে পুজোর সামান্য উপচার কিনে নিয়ে দুজনে পৌঁছুলেন মন্দিরে। মন্দির তখন খুলেছে, কিন্তু একদম খালি। পুজোর পর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম

করতে গিয়ে ভদ্রলোকের মধ্যে উদয় হলো এক সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতি। কী তা, ব্যাখ্যা করা যায় না। পাশে প্রণিহিতা স্ত্রীরও অনুরূপ অবস্থা। তা অবশ্য তিনি স্ত্রীর মুখে পরে শুনেছিলেন—সেই সময় তিনি পাশে আছেন কি না সে খেয়ালও ছিল না। সব যেন লোপ পেয়ে গিয়েছিল।··

—এই রকম তুরীয় অবস্থা থেকে ভদ্রলোক আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন অনেকক্ষণ পরে। দেখলেন অর্ধাঙ্গিনীও যেন সম্মোহিত অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছেন।···

—বলতে বলতে ভদ্রলোক যেন অন্য জগতে চলে গিয়েছিলেন। ···হঠাৎ থেমে গেলেন। আমিও যেন সংবিৎ ফিরে পেলাম।

বিবরণ শেষ করার পর ভদ্রলোককে যেন একটু লজ্জিত মনে হল। হয়তো ভেবে থাকবেন আমার কাছে এতটা প্রগল্ভ হয়ে ওঠা উচিত হয়নি। তারপর তিনি আচমকা একটা মন্তব্য করে ফেললেন: The boundary line between belief and disbelief is very thin, Sir.

বুঝতে পারিনি মন্তব্যটা কার উদ্দেশ্যে—আমার না ওদের নিজেদের।

'বলার মত' তীর্থযাত্রায় মাড়োয়ারীদের বিশেষ আগ্রহ। ওই সম্প্রদায়ের একজন বছরে তিনবার বিদেশ যান এবং প্রত্যেকবারই ভ্রমণ-তালিকায় দু-একটা নতুন নতুন স্থান যোগ করেন, কিন্তু কখনও তাঁকে প্রসঙ্গক্রম ছাড়া ওই বিষয়ের উল্লেখ করতে শুনিনি। ব্যবসা-সূত্রে বাইরে যাওয়া, তা নিয়ে গল্প করার কী আছে! আর পয়সা থাকলেই সঙ্গে স্ত্রীকে, এমনকি ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে যাওয়া যায়।

একবার পুজোর পর দেখা হতেই ভদ্রলোক জানালেন, এবার তাঁরা তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন—নেপালের তুঙ্গনাথে, তিনি আর তাঁর সহধর্মিণী।

—তুঙ্গনাথ! বিস্ময় প্রকাশ না করে পারি নি, পোকরা থেকে হাঁটা পাহাড়ী পথে সে যে তিন চার দিনের চড়াই—বিরতিবিহীন চড়াই। মধ্যে থাকবার মত যাত্রীনিবাস আছে কিনা তাও জানি না।

বোধহয় আমার বিস্ময়ের তাৎপর্য অনুধাবন করেই ভদ্রলোক জানালেন, ওঁরা গিয়েছিলেন হেলিকপ্টারে কাঠমাণ্ডুর ত্রিভুবন বিমানবন্দর থেকে—তাঁরা এবং আরও একটি দম্পতি। যেতে লেগেছিল আধঘণ্টা। ওখানে পুজোপাঠে আধঘণ্টা আর ফিরতে আধঘণ্টা—ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আবার ত্রিভুবন বিমানবন্দরে ফিরে এসেছিলেন।

নিশ্চয়ই 'বলবার মত' তীর্থযাত্রা! ভদ্রলোক নিজেই জানিয়েছিলেন: ওখানে তিনচার-জন বাঙালি ছোকরার সঙ্গে দেখা। তারা পোকরা থেকে সারা পথ হেঁটেই এসেছে।

মনে মনে প্রশ্ন করলাম, কাদের যাত্রাটা ফলাও করে বলবার মত? ওই দুই তুঙ্গনাথ যাত্রীদলের মানসিকতা যে এক নয় তা নিশ্চয়।

হেলিকপ্টারে যে জম্মুর বৈষ্ণোদেবী মন্দিরেও যাওয়া যায় তা আগে জানতাম না। জানলাম সেদিন যখন কাগজে পড়লাম বৈষ্ণোদেবীর পথে হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ে চালক, তাঁর সহকর্মী এবং চারজন যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন।

সেদিনই সকাল ন'টায় আলিপুরে এক মাড়োয়ারী-ভবনে আমার পূর্ব-নির্ধারিত মুলাকাতের ব্যবস্থা। সেখানে পেঁছে দেখি সবাই বিশেষ উদ্বিগ্ন। টেলিফোন-অপারেটরের ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং কর্তা, একটু দূরে বাড়ির মেয়েরা।

জানলাম, বৈষ্ণোদেবীর পথে যে হেলিকপ্টারটা ভেঙে পড়েছে তাতেই ভদ্রলোকের কন্যা ও জামাতার থাকার কথা। অতএব, নিহত যাত্রী চারজনের মধ্যে দুজন বোধহয় তাঁরাই।

এই অবস্থায় সেখান থেকে চলে আসা অসম্ভব, আবার থাকাও পীড়াদায়ক। পীড়ন সহ্য করে আরও কিছুক্ষণ থাকার সিদ্ধান্ত করলাম। খানিকক্ষণ পরে দিল্লী থেকে টেলিফোনে সুসংবাদ এল: ওঁদের কিছু হয়নি—ওঁরা ওই ফ্লাইটে বৈষ্ণোদেবী যানইনি।

হয়েছিল কি, দিল্লী থেকে জম্মু গিয়ে দম্পতিটি জানতে পারেন যে, তাঁদের জন্য দুটো সীট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সহযাত্রী আর একটি দম্পতিকে রাখা হয়েছে অপেক্ষা-তালিকায়। অথচ দিল্লীতে বলা হয়েছিল যে চারটে সীটই তাঁদের ও. কে. করা আছে।

এই অবস্থায় দু'দলই ঠিক করলেন যে, তাঁরা এ-যাত্রায় বৈষ্ণোদেবী যাবেন না, যাবেন শ্রীনগরে এবং সেখান থেকে ফেরার পথে দেখা যাবে।

দেখতে আর হয়নি। হেলিকপ্টার ক্র্যাসের দুদিন পর তাঁরা শ্রীনগর থেকেই দিল্লী ফিরেছিলেন। এ অবশ্য পরের ঘটনা।

হেলিকপ্টার ক্র্যাসের সংবাদ পাওয়ার পরই তাঁরা দিল্লী অফিসে জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা দুর্ঘটনায় পড়েননি। সেই খবরই দিল্লী থেকে রিলে করে কলকাতায় জানানো হয়েছিল।

সুসংবাদ পেয়ে ভদ্রলোক নিজেতে ফিরে এলেন। আমাকে ডেকে নিয়ে বসালেন অফিস ঘরে। বসার পর মন্তব্য করলেন: মেরা উমিদ থা উনকো কুছ নেহি হুয়া···বৈষ্ণোদেবী পর দোনো-কা এতনা বিশ্ওয়াস।

তাহলে যে চারজন যাত্রী নিহত হল তা কি বিশ্বাস-ঘাটতির দরুনই? প্রশ্নটা মনে এলেও ভদ্রলোকের কাছে অবশ্য উপস্থাপিত করিনি।

বলেছি, মাড়োয়ারীদের ধর্মাচরণের একটা দিক হল যাত্রীনিবাস বা ধরমশালার ব্যবস্থা করা। এর পরিমাণ অবশ্য কমে যাচ্ছে, আর কিছুটা প্রকারভেদও ঘটেছে। যেমন ধর্মশালার নতুন নামকরণ হচ্ছে গেস্ট হাউস বা অতিথি ভবন।

জয়পুরিয়াদের চার জায়গায় চারটে গেস্ট হাউস আছে— বারাণসী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার ও চিত্রকূট। হাসপাতাল ও নার্সিং-হোমে যা তফাৎ সেইরকমই ফারাক হল ধর্মশালা ও গেস্ট হাউসের মধ্যে। ধর্মশালায় যাত্রীদের বিশেষ কিছু দিতে হয় না— বিদ্যুৎ ও জমাদারের জন্য সামান্য মাত্র। আর কম্বল চাদর বিস্তারা নিলে আলাদা কথা। গেস্ট হাউস বা অতিথি ভবনে অতিথিদের ঘর ভাড়া দিতে হয়, চাদর বিছানার ভাড়া দিতে হয় এবং ঘর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হলে তার জন্যে অতিরিক্ত।

হ্যাঁ, প্রত্যেক অতিথি ভবনে অতিথিদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কয়েকটা ঘর থাকে, আর থাকে সংলগ্ন স্নানঘরও— মোটামুটি তিন তারকা হোটেলের মতো ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে

জয়পুরিয়াদের একজন আমাকে বলেছিলেন: One needn't always be an ascetic while on pilgrimage—pilgrimage is not necessarily penance.

যুক্তিটা আমার ঠিক মনঃপূত হয়নি। আমার মনে হয়েছিল আসল কারণ হল যাত্রীনিবাসকে স্বয়ম্ভর করে তোলা। আগের ধরমশালাগুলো চালানো হত ট্রাস্ট থেকে। এতে ঝক্কি-ঝামেলা অনেক—ট্রাস্টে টাকা না থাকতে পারে, নতুন প্রজন্মের ট্রাস্টিদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে পারে, অন্যদিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, আয়করে নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হতে পারে। সুতরাং অতিথি ভবন নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে যাতে তা ভাইঅ্যাবল হয় সেই ব্যবস্থাই করা ভাল। এছাড়া ভাল জায়গায় অতিথি ভবন থাকলে সরকারী কর্মচারীদের, রাজনৈতিক নেতাদের তোষণ-মনোরঞ্জনও করা যায়। তাঁরা ঠিক ধর্মশালার হরিছত্রের মেলায় থাকতে চান না।

অতএব অতিথি ভবনই নির্মাণঃকর। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিষেবার অদ্ভুত সমন্বয় সন্দেহ নেই!

অতিথি ভবনকে স্বয়ম্ভর করবার জন্যে তার সঙ্গে সংযুক্ত ক্যান্টিনের ব্যবস্থাও থাকে—সেখান থেকেও সংরক্ষণ-পরিচালনার ব্যয়ভার কিছুটা উঠে আসে।

প্রাত্যহিকী: সাহেবীয়ানার উত্তরোত্তর অনুপ্রবেশ ঘটলেও মাড়োয়ারীদের—অন্তত কলকাতার মাড়োয়ারীদের ঘরসংসার পদ্ধতি—লাইফ স্টাইল এখনও অনেকাংশে কৌলিক। খাওয়া-দাওয়ার কথা ধরা যাক না কেন। খাওয়াদাওয়ায় প্রথম পর্ব হল নাশতা বা প্রাতঃভোজন। নাশতায় থাকে চানা—ভাজা বা অংকুরিত, বানচ[১], ফ্রেঞ্চ টোস্টের ধরনে কোন আইটেম অথবা রুটি বা পুরি এবং মাঠা অর্থাৎ ঘোল অথবা দুধ। চা ততটা পছন্দ নয়। আবার সাহেবীভাবাপন্ন মাড়োয়ারীদের কাছে চা-এর চেয়ে কফি—ব্ল্যাক কফিই প্রিয়। ছোটদের বেলায় দুধ কিন্তু আবশ্যিক। এই দুধ কিন্তু মাদার ডেয়ারীর দুধ নয়—খাঁটি গরুর দুধ। সম্ভব হ'লে এর জন্য গোরুও পোষা হয়।

* ফল

রুটিপুরি যখন হয় তার সঙ্গে থাকে চানার তরকারি এবং কোন কোন সময় কোন কোন শাক—আলুকা শাক, ভিণ্ডিকা শাক্ ইত্যাদি। এই নাশতা করেই বড়রা যান কর্মক্ষেত্রে, ছোটরা যায় স্কুলকলেজে।

রবিবার বা অন্য ছুটির দিন ছাড়া বড়রা মধ্যাহ্নভোজন সারেন কর্মক্ষেত্রেই—হয় অফিস ক্যাণ্টিনে, না হয় পাশের দোকান-পসারে, না হয় বাড়ি থেকে প্যাক করে আনা আহার্য অফিসে বসেই। অফিস ক্যাণ্টিন থাকলেও অভিজাতরা সেখানে পদার্পণ করেন না। হয় তাঁদের জন্য আলাদা চৌকার* ব্যবস্থা থাকে, না হয় বাড়ি থেকে আহার্য আসে।

মার্কিন সহযোগে এক মাড়োয়ারী কোম্পানির অধিকর্তা আমাকে একটি বৃত্তান্ত শুনিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক আওরঙ্গাবাদে নতুন কারখানা গড়েছেন এক্স-রে প্লেটের, কারখানা চালু হবার পরই মার্কিন সহযোগীদের একজন এলেন পরিদর্শন করতে। আলাপ-আলোচনা চলার মধ্যেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের মনে হল মধ্যাহ্নভোজনের সময় হয়ে গেছে। ঘড়িতে দেখলেন একটা বেজে দশ—সময় দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। মার্কিন সহযোগীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভদ্রলোক বললেন: এখন এ পর্যন্তই থাক। এবার লাঞ্চে বসা যাক। সহযোগীও তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সম্মতি দিলেন।—হ্যাঁ, লাঞ্চের সময় হয়েছে।

ঘণ্টি বাজালেন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। বেয়ারা ঢুকতেই আদেশ দিলেন, লাঞ্চ লে আনে বোলো। হিন্দী না জানলেও মার্কিন সহযোগী ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন: What did you say? Lunch to be brought here?

—হাঁ, তাইতো বলেছি—উত্তর দিলেন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক।

—No, please! প্রতিবাদ করলেন মার্কিনীটি। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকা বেয়ারাটিকে নির্দেশ করে বললেন: Ask him to go.

বেয়ারাটি চলে গেলে প্রস্তাব করলেন: Let's go to the canteen and partake of the community meal.

---

* পাকশালা—রান্নাঘর

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক যেন প্রস্তাবটা মেনে নিতে পারলেন না—যেন নিমরাজী হয়েই তাতে সায় দিলেন।

মার্কিন সহযোগী তখন ধীরে ধীরে বললেন: This is an aspect of industrial democracy, Rajen. You have to run democratically. মার্কিনী প্রথা অনুসারে সহযোগীরা পরস্পরের প্রথম নাম ধরেই সম্বোধন করেন, পদবী ধরে নয়।

—তখন থেকে যখনই আওরঙ্গবাদে যাই তখন ক্যাণ্টিনেই খাই,—তথ্য পরিবেশন করলেন ভদ্রলোক।

জিজ্ঞাসা করলাম: আর কলকাতায়?

—In Calcutta, of course, I get my lunch from one of the eating houses, preferably from Sky Room—উত্তর দিলেন ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের অফিস মিড্লটন স্ট্রিটে—পার্ক স্ট্রীটে অবস্থিত স্কাই রুম থেকে দু'শ গজের দূরত্ব।

স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা ফেরে দেড়টা থেকে সাড়ে তিনটে চারটের মধ্যে—ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলগুলোর সময়ই ওই রকম। তারপর তারা সারে মধ্যাহ্নের আহার। মাম্মী-চাচীরা সাধারণত ওই সময় অবধি অপেক্ষা করেন না, আগেই মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিয়ে হয় কেনাকাটায় বেরিয়ে পড়েন, না হয় তাস খেলায় নিমগ্ন হন। ঠিক যাকে দিবানিদ্রা বা ইংরেজীতে সিয়েস্তা বলে মাড়োয়ারী মহিলাদের ক্ষেত্রে বড় একটা লক্ষ্য করা যায় না। তবে তাঁদের নিদ্রার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। শুনেছি সকাল দশটার সময়েও কোন কোন মহিলা ঘুমোন, আবার বিকেল পাঁচটাতে বাধা নেই!

ছেলেমেয়েরা স্কুলকলেজে এবং কর্তারা কর্মস্থলে যাত্রা করার পর মহিলাদের বেশ কয়েক ঘণ্টা মোটামুটি আজাদী। যদি আলাদা গাড়ি থাকে তো কথাই নেই; না থাকলে একমাত্র গাড়ি কর্তাদের কর্মস্থলে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে এবং সেই গাড়ি করে বহুজী-বিন্নিজীরা বেরোন বাজারে—শীতকালে বেশ বেলায় আর গ্রীষ্মকালে অবশ্যই সকাল সকাল। এই প্রসঙ্গে বাজার বলতে অভিজাত ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাড়োয়ারীরা বেরোন নিউ মার্কেটেই। 'নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম' বলাটাই যেন মর্যাদার পরিচায়ক, এমনকি টোমাটোর-পরবল কিনতেও, অন্য জিনিসের তো কথাই

নেই। টোমাটো-পটল অন্য বাজারেও পাওয়া যায় কিন্তু তাতে জাতের ছাপ থাকে না, ভাল ফিল্ম রদ্দি হাউসে বসে দেখার মতোই। দেখা যায়, লিলুয়া-শালকিয়া, বড়বাজার, সেণ্ট্রাল এভিনিউ থেকে মাড়োয়ারী মহিলাদের গতি নিউ মার্কেটের দিকে। পুরুষদের বেলায় কিন্তু এরকম কোন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। তাঁদের ঝোঁক সুলভের প্রতি।

ম্যাসাজ-মর্দন মাড়োয়ারী মেয়েদের ক্ষেত্রেও বিশেষ সংক্রামিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে অভিজাত শব্দ যোগা (যোগ) ব্যবহার না করে সোজাসুজি বলা হয় ম্যাসিজ—দাবানো। এরজন্য একদল নতুন পেশাদারিণীও গজিয়ে উঠেছে—ম্যাসিজওয়ালী বা সম্ভ্রমার্থক অর্থে যোগা-মাস্টারণী।

প্রকৃত যোগা-মাস্টারনীরা অনূঢ়া কন্যাদের আসন শেখান তাদের অবয়ব গঠনের জন্যে, কিন্তু বহুজী-গিন্নিজীদের কাছে তাদের সেবাদাসীর কাজই করতে হয়—মর্দন, কবরীবিন্যাস, অঙ্গরাগ—সবকিছু। অনূঢ়া মেয়েদের কিন্তু কেশবিন্যাস ও অঙ্গরাগের জন্যে পাঠান হয় বিউটি পার্লারে। একটু সমৃদ্ধ হলে বিউটি পার্লার থেকেই প্রতিনিধি বাড়িতে আসে—চীনা অথবা ইঙ্গ-ভারতীয়।

যারা সরাসরি বাড়ি এসে কাজ করে তারাই ম্যাসিজ-ওয়ালী। এদের অধিকাংশই নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি, ম্যাসিজ-আসন কেশপরিচর্যা ইত্যাদিতে কিছুটা শিক্ষণপ্রাপ্ত। শিক্ষণপ্রাপ্ত বলে তাদের পারিশ্রমিকও স্বভাবত বেশি হয়। আর বিউটি-পার্লার প্রেরিত হলে ডাক্তারদের মতো তাদের নির্দিষ্ট ফী থাকে—সেটা পার্লারে আগেভাগে জমা দিলে তবেই প্রতিনিধির পদার্পণ ঘটে। অবশ্য খুব বিখ্যাত ভবন হ'লে পরে বিল পাঠালেও চলে। যোগকেন্দ্রের ক্ষেত্রেও ওই একই ব্যাপার।

প্রায় প্রত্যেক মাড়োয়ারীর দোকানেই একটা করে গদি থাকে, তা কোচ সোফা চেয়ার টেবিল থাকুক বা না-থাকুক। এই গদি থেকেই 'মাড়োয়ারীর গদি'—অর্থাৎ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর দপ্তর বর্ণনাটির

উৎপত্তি। অবশ্য গতিটা হয়েছে বিপরীতমুখী—দপ্তর থেকে গদি। এসেছে মোকানে—অর্থাৎ ঘরে। গদি থাকে হলঘরে, বা ফ্ল্যাটবাড়ি হলে তার লবিতে। আর হলঘর বা লবি কোন কিছুই না থাকলে কোন একটি ঘরকে গদির জন্য ব্যবহার করা হয়। এবং সেই ঘরটিই হয় মিটিং রুম বা মুলাকাতের স্থান।

কর্তারা কর্মক্ষেত্রে এবং শিশুরা পাঠভবনের দিকে যাত্রা করলে গদি আসে বহুজী-বিন্নিজীদের দখলে। ওখানে বসেই তাঁরা মর্দন ও কেশবিন্যাস করান এবং ওই গদির ওপরেই বসে সেই তাসের আসর যা হল একরকম দ্যূতক্রীড়া—'বাজি রাখিয়া (তাসের) জুয়া খেলা'।

জুয়া না হলে তাস খেলতে স্ত্রী-পুরুষ কারও কোন আগ্রহ নেই।

তাসখেলার সঙ্গিনী যৌথ পরিবারের বাড়ির মধ্যে থেকে জোটান যেতে পারে। ফ্ল্যাট বাড়ি হলে অন্যান্য ফ্লাট থেকে আসতে পারেন, আর সেটাও মোটে বিরল নয়—পর্যায়ক্রমে বহুজীরা এক একজনের বাড়ি গিয়ে জমায়েত হতে পারেন।

খেলা শেষে হিসাব করে নগদ লেনদেনের ব্যবস্থা—ধার-বাকির কোন কারবার নেই। যদি ধার-বাকি থাকেই তবে পরদিন বসেই প্রথমে তা মেটানো হয়। তারপর তাস বণ্টন।

শুধু তাস খেলাতে কেন, যে কোন বাজি ধরাতে ওই একই ব্যাপার। একবার এক বহুজী পর্যায়ভুক্ত মাড়োয়ারী মহিলার সঙ্গে তাঁর নাতির জ্বর কতো তা নিয়ে আমাকে বাজি রাখতে হয়েছিল। পড়াতে গিয়ে শুনি ছেলেটির জ্বর। চলে আসছিলাম, এমন সময় তার দাদী বললেন: আইয়ে! অংশু গেস্টরুমমেই হ্যায়। গেস্টরুম হল গদি-সহ বসবার ঘর এবং কোন অতিথি এলে সেখানেই অবস্থান করেন।

আমার সঙ্গে গেস্টরুমে দাদীজীও এলেন। ছেলেটির কপালে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বর বেশি নয়—একশ ডিগ্রির মতো হবে। তা ঘোষণাও করলাম: আমার মনে হচ্ছে জ্বর একশর বেশি হবে না।

—কেয়া বাতাতা হ্যায় আপ!—দাদীজী বিস্ময় প্রকাশ করলেন এবং তারপর বললেন: জরুর একশো-দো হোগা।

—একশ-দো! এবার আমার বিস্ময়ের পালা। বিস্ময়ের রেশ কাটতে না কাটতে দাদীজীর চ্যালেঞ্জ ঃ বেট? ইংরেজী 'বেট' শব্দই ওঁদের মধ্যে চালু।

আমারও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল : পচাশ রুপেয়া। সঙ্গে সঙ্গে থার্মোমিটার এল। জ্বর মাপা হল। হ্যাঁ, দাদীজীর কথা ঠিক —জ্বর একশ দুইই বটে।

—লাইয়ে, বলে দাদীজী হাত পাতলেন। আমি আমার পার্স খুলে দেখলাম চল্লিশ টাকার মতো আছে। তা থেকে ত্রিশটাকা দাদীজীর হাতে দিয়ে বললাম : বাকি বাদ মে লিজিয়ে গা। আভি মেরা পাস হ্যায় নেহি।

দাদীজী মেনে নিলেন, কিন্তু শর্ত আরোপ করলেন—পরদিন যখন আসব তখন যেন টাকাটা সঙ্গে আনি—ভুল মৎ যাইয়ে।

ভোলার কি জো ছিল! পরের দিন টাকাটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। ছেলেটি সুস্থ হয়েছিল, পড়াতে বসেছি এমন সময় একজন পরিচিত পরিচারক পড়ার ঘরে এসে হাজির। সে জানাল, বহুজী বিশ রুপেয়া চেয়ে পাঠিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, বহুজী কোথায়? উত্তর পেলাম, গেস্টরুমমে তাস খেলতা হ্যায়।

বিশটি টাকা বের করে পরিচারকের হাতে দিলাম। কয়েক মিনিট বাদে গেস্টরুম থেকে পড়ার ঘরে ফোন এল—দাদীজী বলেছেন : ধন্যবাদ। রুপেয়া মিল গিয়া।

ফোনের মধ্যে শুধু কি স্বীকৃতি ছিল, না প্রচ্ছন্ন অভিযোগও ছিল যে, তাঁকে বাজির টাকার জন্যে তাগাদা দিতে হয়েছিল? ঠিক বুঝতে পারিনি।

মেয়েদের মধ্যাহ্নভোজনের সঙ্গে অনেক সময়ই চলে ভি. ডি. ও.। এই প্রমোদ-ব্যবস্থাটি বিশেষ জেঁকে বসেছে বাঙালি ও অন্যান্যদের বেলাতেও। তবে মাড়োয়ারীদের ক্ষেত্রে পরিমাণ অনেক বেশি।

বাচ্চাদের বেলায় কিন্তু ভি. ডি. ও.-র ব্যবহার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত—শনিবার বিকাল, রবিবার সকাল এবং অন্যান্য ছুটির দিন। কী ফিল্ম দেখানো হচ্ছে, সিচুয়েশন কীরকম সে সম্পর্কে অবশ্য কোনরকম বাচবিচার নেই। সেন্সর বোর্ড যে ফিল্মকে

য়ুনিভার্সাল এগজিবিশনের সার্টিফিকেট দিয়েছে তাই দর্শনযোগ্য। তাছাড়া উসব বেপার লেড়কা-লেড়কী আজ, না হয় কাল জানবেই— বায়োলজিমে উয় শিখাতা নেহি? অতএব বাচবিচার না করাই ভালো। শুধু দেখা প্রয়োজন, পড়াই-এর যেন ছতি (ক্ষতি) না হয়, আর মাস্টারজী যেন নিজেও দেখতে বসে না পড়েন। ফলে যখন বাচ্চারা পড়াশোনা করে তখন লবিতে ভি. ডি. ও. চলছে। লক্ষ্মণের গণ্ডি দেওয়ার মতো—বাচ্চাদের এদিকে আসবার উপায় নেই।

ইংলিস মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রছাত্রী বলে গৃহশিক্ষকের কাছে তাদের পড়বার সময় সাধারণত স্কুল থেকে ফিরে আহার সমাপ্ত করার পরই। তাসখেলার সঙ্গিনীরা এসে জুটলে ভি. ডি. ও. বন্ধ করে দেওয়া হয়। বহু-লেড়কীদের মধ্যে কেউ যদি দেখতে চায় তবে সঙ্গিনীদের নিয়ে বহুজী চলে যান শয়নকক্ষে। সিনেমা একরকম প্রমোদ মাত্র, কিন্তু তাসের জুয়া সম্পূর্ণ নেশা। নেশার দাবি আমোদপ্রমোদের ঊর্ধ্বে।

মেয়েদের প্রাত্যহিক আজাদীর অধ্যায় শেষ হয় ছেলেদের— পুরুষদের কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফেরবার সময় হলে। অনেকে সরাসরি বাড়ি ফেরেন, অনেকে ফেরেন ক্লাব বা অনুরূপ প্রমোদস্থল ঘুরে। আর যাঁদের কাজ দোকান-পসারে তাঁরা ফেরেন অবশ্যই আরো দেরি করে। ফিরেই আস্নান ও জিম—অর্থাৎ ভোজন। সাক্ষাৎকারের পূর্ব-বন্দোবস্ত না থাকলে ওই সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া কঠিন, এমনকি টেলিফোন ধরলেও অপরেটর বা বাড়ির কেউ বলবে, জিমমে হ্যায় বা জিমতা হ্যায়—বাদমে লাইন জোড়িয়েগা। দরকার যদি ও-তরফের হয় তবে ভোজন শেষ করেই তাঁর নির্দেশেই লাইন জোড়া হয়। লাইন জোড়ার পরই প্রশ্ন আসে: বলিয়ে, কেয়া সমাচার?

এই সান্ধ্য জিমতার কাম বা ভোজন সাধারণত শেষ হয় আটটার মধ্যেই। তারপরই যে যার ঘরে। ঘর বেশি না থাকলে ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ে গদিতে, আয়া থাকলে আয়ার কাছে—বাপমায়ের সঙ্গে বড় একটা নয়। প্রাইভেসি সম্পর্কে মাড়োয়ারীরা বিশেষ সচেতন।

নতুন বিয়ের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হয়, ছেলেটি পরিবারের দুকান থেকে দুপুরের দিকেই সরে পড়ত 'শির দুখতা', 'বুখার আগয়া, মালুম হোতা' ইত্যাদি বাহানা করে। বাড়িতে এসে দেখত মা হয়ত সঙ্গিনীদের সঙ্গে তাস খেলছেন, আর নব-পরিণীতা বধূ পাশে বসে দেখছে।

ছেলেকে দেখেই মা সব বুঝতেন। আদেশ দিতেন: যাও বহু, দীনেশকো শির-মালিশ করো। বহুও উঠত। তারপর তাসের দেশের সকলেরই মুখে চাপা হাসি খেলে যেত—এ ওর দিকে চাইতেন। অপেক্ষাকৃত নবীনাদের মুখে হাসি বেশিই ফুটত। তাঁদের ফেলে আসা দিনগুলি তো একেবারে আবছায়া হয়ে যায়নি।

এই দেখে আমার স্ত্রী একদিন মন্তব্য করেছিলেন: দীনেশ ছেলেটা একদম বেশরম। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল মাড়োয়ারীদের সচেতন সহানুভূতির পরিমাণই বেশি। এটা বোধহয় পাশ্চাত্য জীবন-পদ্ধতিরই একটা প্রতিফলন।

এই দীনেশের ব্যাপারেই আমি একবার লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলাম। রবিবার দিন সকাল দশটা নাগাদ সামনের দীনেশদের ফ্লাটে গিয়েছিলাম দীনেশের সঙ্গে একটা প্রয়োজন সারতে। পরিচারক রামু দরজা খুলে দিয়েছিল। কিন্তু লবিতে কাউকে দেখলাম না—শুনলাম প্রায় সবাই গেছেন তারকেশ্বরে। দীনেশও কি গেছে? জানলাম দীনেশ যায়নি, শুয়ে আছে। ভাবলাম, দীনেশ যখন যায়নি তখন তার ঘরে গিয়েই দেখা যাক সে জেগে আছে, না ঘুমুচ্ছে। প্রয়োজনটা যে বড়ই জরুরি! আর এ-ফ্ল্যাটে তো আমার অবারিত দ্বার।

লবি পেরিয়ে দীনেশের ঘরের দিকে যাচ্ছি এমন সময় কোথা থেকে শেঠানী—দীনেশের মা আবির্ভূতা হলেন। (তিনিও তাহলে তারকেশ্বর যাননি!) মাঝপথেই আমাকে রুখলেন: আপ কাঁহা যাতা? বেডরুমমে বহুভি হ্যায়···জিব কেটে, শেঠানীর কাছে ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে এলাম।

আধঘণ্টা বাদে দীনেশ নিজেই এল আমার ফ্ল্যাটে। প্রয়োজনটা ছিল তারও।

মাড়োয়ারীরা বিছানা ছাড়েন কাকভোরে। তারপর প্রাতঃকৃত্য শেষ করে হয় পুজোপাঠে বসেন, না হয় স্বাস্থ্যোদ্ধার অথবা স্বাস্থ্য-সংরক্ষণমূলক ভ্রমণে বের হন—গঙ্গার ধারে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বা হর্টিকালচারাল সোসাইটির বাগানে। ওই অবধি আসেন অবশ্য গাড়ি করে। আসার পর সেখানে করেন পদচারণা বা জগিং।

দু'একজনের জগিং দেখবার মতো—বিরাট তোংদের* আকার হ্রাসের প্রয়াসে শিশুর মতো অঙ্গসঞ্চালন। প্রাপ্তবয়স্কের অমন অবয়বে শিশুর মতো সঞ্চালন-প্রচেষ্টা হয়তো হাসির উদ্রেক না করে পারে না, তবে দর্শন করতে করতে যাঁরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁদের নয়।

একবার আমিও এই স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ব্যবস্থার শামিল হয়েছিলাম, বা আমাকে হতে হয়েছিল।

আমাদের বহুতল বাড়ির কুড়িটি ফ্ল্যাটের ষোলটিরই অধিবাসী ছিলেন মাড়োয়ারী, আর বাকী চারটিতে ছিলাম আমরা তিনজন বাঙালি এবং একজন গুজরাটী।

মাড়োয়ারী-গোষ্ঠীই আমাকে ধরল, কাল সুবে থেকেই ভিক্টোরিয়া যাওয়ার জন্যে—ঘুমনেকো লিয়ে।

রাজী হলাম। সামনের ফ্ল্যাটের দীনেশের পিতৃদেব ছাপারিয়াজী ভোর চারটের সময় বাইরের দরজার ঘণ্টি বাজিয়ে (সবারই) ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন—সাড়ে চারটের মধ্যেই তৈরি হয়ে বেরুতে হবে যে।

ঠিক সময়েই বেরিয়ে পড়লাম। নিচে নেমে দেখি শ্যাম চৌধুরী মশায় গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসে আমারই জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমরা ছ'জন। ফাঁকা রাস্তা—পার্ক সার্কাস থেকে ভিক্টোরিয়া পেঁছুতে লাগল সাত-আট মিনিট। তারপর গাড়ি লক করে শ্যাম চৌধুরী মশায় আমাদের নির্দেশ দিলেন: যেখানেই হাঁটাহাঁটি ছুটোছুটি করি না কেন, যেন সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই গাড়ির কাছে চলে আসি।

আমি আর ছুটোছুটি করিনি। এক চক্কর ভিক্টোরিয়া ঘুরে এসে গেটের সামনে এক বেঞ্চিতে বসেছিলাম। তখন সবে পাঁচটা

---

*ভুঁড়ির

বেজেছে। দেখি হন্তদন্ত হয়ে ছাপারিয়াজী আসছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে বিশেষ ব্যাকুলতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন: শ্যামবাবুকো দেখা ?

—নেহি তো।

উত্তর শুনে ছাপারিয়াজী বিশেষ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন দেখলাম। তারপরই যেন স্বগতোক্তিই করলেন : ম্যয় আভি কেয়া করুঙ্গা ?

বলতে বলতেই শ্যামবাবু এসে হাসির। তাঁরও এটা প্রথম দিন। দেখলাম তিনিও হাঁপাচ্ছেন।

শ্যামবাবুকে দেখে ছাপারিয়াজীর ধড়ে যেন প্রাণ এল। বললেন : চলিয়ে শ্যামবাবু, তুরন্ত ঘর চলিয়ে···, তারপর বলেই ফেললেন,—জোরসে ল্যাট্রিন আ গিয়া।

কোষ্ঠবেগ ইত্যাদিকে ও'রা ল্যাট্রিনই বলে থাকেন।

শ্যামবাবু ব্যাপারটা বুঝলেন, তবুও প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ না করে পারলেন না : আওর তিন আদমি ?

—মুখার্জিবাবু উন লোগকো ট্যাক্সিমে লে আয়েঙ্গে।

তাই হ'ল। ও'রা দুজন আগেই চলে গেলেন। আমরা চারজন পরে গেলাম একটা ট্যাক্সিতে।

সওয়ারি পাবার আশায় সদারজীদের অনেক ট্যাক্সিই ভোর থেকে ভিক্টোরিয়ায় খাড়া থাকে। বড়বাজার, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, ভূপেন বোস অ্যাভিনিউ, নিউ আলিপুর প্রভৃতিতে যাবার ভাড়াও তারা পায়।

বাড়ি ফিরে নিজের দৈহিক প্রয়োজন আর একবার মেটানোর প্রচেষ্টার পর গেলাম ছাপারিয়াদের ফ্ল্যাটে, খবর নিতে যে ভিক্টোরিয়ায় সেই যে ল্যাট্রিনের বেগ তা স্বাভাবিক, না কোন অসুস্থতায় ইঙ্গিতবাহক।

গিয়ে দেখি ছাপারিয়াজী তাঁরই শোবার ঘরে একটা দাঁড়িতে* শুয়ে অতি সংকীর্ণ অন্তর্বাস পরিধান করে তৈলমর্দন করাচ্ছেন, আর মর্দন করছে তাঁরই গৃহ পরিচারক রামু—উত্তর বিহার থেকে আগত ভৃত্য।

আগেই বলেছি, মাসাজ-মর্দন মাড়োয়ারী মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষ

---

* সতরঞ্জিতে

সংক্রামিত হয়েছে। এই সংক্রমণ এসেছে পুরুষদের কাছ থেকে—জিন্‌স-ট্রাউজারস ব্যবহারের মতো।

বলা যায় মালিশ বা মাসাজ—যার বর্ণনাম হ'ল 'যোগ' এবং ওঁরা বলেন 'যোগা'—মাড়োয়ারীদের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

সকালে বা সন্ধ্যায় যোগা-মাস্টার আসেন। তেল বা পাউডার দিয়ে মাসাজ করানোর সঙ্গে কিছু কিছু কসরতও শেখান। তবে কসরতের চেয়ে মালিসের পরিমাণই বেশী। আর তেল হ'ল কড়ুয়া তেল থেকে অলিভ অয়েল পর্যন্ত। এই অলিভ অয়েল বাড়িতে যোগান দেবার লোকও আছে শুনেছি, আবার খিদিরপুরের ফ্যান্সি মার্কেটেও পাওয়া যায়।

সাধারণত একই যোগা-মাস্টার বৃদ্ধ-প্রৌঢ়-যুবক-বালককে যোগা শেখান—অর্থাৎ মালিশ করেন, বাড়িতে গৃহ চিকিৎসকের একের পর এক রোগী দেখার মত। যাঁরা একটু অভিজাত বা প্রদর্শনপ্রিয় তাঁরা যোগার জন্য যান গ্র্যাণ্ড বা অনুরূপ কোন হোটেলে। যেখান থেকে বাড়ি ফিরে এসে প্রাতঃভোজন এবং তারপর কর্মক্ষেত্রের দিকে যাত্রা।

মহিলাদের ক্ষেত্রে নিযুক্ত হন যোগা-মাস্টারণী। তিনি হয়ত যোগবাদে বিশেষ পটু নন, কিন্তু দাবানোয় কোন ত্রুটি নেই।

যাঁদের যোগা-মাস্টার বাড়িতে ডাকার বা হোটেলে গিয়ে যোগ-সাধনার সঙ্গতি নেই তাঁদের জন্যে বাবুঘাট থেকে আসে মালিশ-ওয়ালা, না হয় পরিচারকের ওপরই এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই শ্রেণীর মাড়োয়ারীরা গৃহভৃত্য নিয়োগের সময়ই যাচাই করে দেখেন : ক্যা, ম্যাসিজ দেনে সেকেগা তো ?

—ম্যাচিস ? জরুর।—উত্তর দেয় উত্তর বিহারের গৃহভৃত্য-পদ প্রার্থীটি।

রামু ছিল ছাপারিয়াজীর এইরকম এক ম্যাসিজওয়ালা।

মর্দনরত অবস্থায় আমাকে দেখে ছাপারিয়াজী যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। 'আইয়ে, আইয়ে' বলে অভ্যর্থনা করে ব্যক্ত করলেন : আপকো বুলানেকো শোচতা থা।

আমাকে ডেকে পাঠাবার কথা ভাবছিলেন! কিন্তু কেন? প্রশ্ন আর করতে হল না। ছাপারিয়াজীই কারণ ব্যাখ্যা করলেন: বাত ইয়ে হ্যায়, রামু বহুত বড়িয়া ম্যাসিজ লাগাতা হ্যায়—দর্দ একদম হট যাতি হ্যায়।...আপ লেঙ্গে?

ব্যাখ্যা ও আচমকা প্রস্তাবে বিস্ময়ের ঘোর আরও বাড়ল। চুপ করে আছি দেখে ছাপারিয়াজী ব্যাখ্যা বিলম্বিত করলেন: ভিক্টোরিয়ায় যদি সকালে ভ্রমণ করতেই হয়—জোগিং করুন আর নাই করুন, অন্তত প্রথম প্রথম শরীরে দর্দ হবেই। আর সেই দর্দ হটাবার একমাত্র পন্থা হল ম্যাসিজ। বাইরে থেকে ম্যাসিজ-ওয়ালা আনার কোন যুক্তি নেই, কারণ বাড়ির লোক—রামুই ভাল ম্যাসিজ দেয়।...আপ ভি করাও জী।...

তখনও চুপ করে আছি দেখে ছাপারিয়াজী বোধহয় অনুমান করলেন যে আমি পয়সার কথাই ভাবছি। বললেন: নেহি, নেহি। পইসাকা কোই বাত নেহি। রামু না মেরা আদমি!

রাজী হলাম। ছাপারিয়াজীকে বললাম তাঁর হয়ে গেলে রামুকে পাঠিয়ে দিতে—আমাকেও তো মাত্র অন্তর্বাস পরে সজ্জিত হতে হবে।

রামু এলে শোবার ঘরেই ব্যবস্থা করলাম—সকালবেলা, লবিতে কে কখন এসে পড়ে। পায়ে-হাতে-গায়ে খানিকক্ষণ মর্দন করার পর রামু নির্দেশ দিল: উলট্ যাইয়ে। শুলাম উপুড় হয়ে, তারপরই গুরুভারের চাপে চিৎকার করে উঠতে হ'লো: উতরো, উতরো।—রামু তার দেড়মণি বপুখানি নিয়ে পিঠের ওপর চেপে বসেছে।...

নিশ্চয়ই রামু ছাপারিয়াজীরও পিঠের ওপর উঠে বসেছিল—ম্যাসিজ দেওয়ার সময় পিঠের ওপর উঠে বসাই ওদের রীতি—বুকের ওপরও হতে পারে।

পরে ছাপারিয়াজীকে এই নিয়ে অনুযোগ করায় তিনি বলেছিলেন: আচ্ছাইতো কিয়া, নেহি তোংদ কমতি হোগা কেইসে?

তবুও কিন্তু তোংদ কমে না—দলনমর্দনে কিছুই হয় না। তবে এটা ঠিক যে ফল হোক বা না হোক, এ ব্যাপারে তাঁরা খুব সজাগ—যোগা বা ম্যাসিজের প্রতি আকর্ষণের কারণ হ'ল এই।

রবিবার : রবীন্দ্রনাথের শিশু ভোলানাথ মায়ের কাছে অনুযোগ করেছিল, রবিবার কেন এত দেরি করে আসে? কেন সে সব বারের শেষে ধীরে ধীরে পেঁছোয়!

কোথায় একটা কার্টুন দেখেছিলাম, বোধহয় করণিক পিতাকেই শিশুপুত্র জিজ্ঞাসা করছে: ১৫ই আগস্ট কী বাবা? পিতা উত্তর দিয়েছিলেন, ছুটির দিন।

মাড়োয়ারীদের দৃষ্টিভঙ্গি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। রবিবার কেন, কোন ছুটির দিনকেই তাঁরা ঠিক পছন্দ করেন না। কারণ মনে হয়, ছুটির দিন তো আর ধান্ধা বা কামাই-এর দিন নয়—বৈশ্যরা তাকে পছন্দ করেন কী করে? নোকরি-করনেওয়ালাদের অবশ্য আলাদা কথা।

মেয়েরাও পছন্দ করেন না, কারণ ওই দিন তাঁদের প্রমীলাতন্ত্র অপসৃত হয়। গদির দখল নেন পুরুষেরা—হয় সেখানে, ন হয় শয়নকক্ষে তাসখেলা চলে। গাড়িও পাওয়া যায় না—হয় সেদিন ড্রাইভারের ছুটি, না-হয় পুরুষদের দরকার। গাড়ি পাওয়া গেলেও অধিকাংশ দোকান-বাজার বন্ধ থাকে—মার্কেটিং-এ যে বেরোবেন তারও উপায় নেই।

বহুজীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। বিন্নিজীদের নিয়ে হয়তো নিজেরাই গাড়ি চালিয়ে ছেলেরা সিনেমায় গেছে, কর্তা ওধারে তাসে মত্ত, ছোট নাতিনাতনীদের নিয়ে আয়ারা হয়ত পার্কে গেছে, ভি. ডি. ও. হয়ত বড় নাতিনাতনীরা দখল করে বসেছে···না, অসহ্য বললেই হয়!

তবে রবিবার (ও অন্যান্য ছুটির দিনকে) মেনে না নেওয়া ছাড়া উপায় কী? পঞ্চাঙ্কের* ঠিক ঠিক দিনে তারা যে আসবেই?

তারা যখন আসে তখন কিন্তু সাদর অভ্যর্থনা পায় না, অনুপ্রবেশের অনুমতি পায় মাত্র। দেওয়ালির দু'দিন ছুটি অবশ্য এর ব্যতিক্রম। এর কারণ কি দেওয়ালির সঙ্গে লছমী পুজা (ও দ্যূতক্রীড়া) সংশ্লিষ্ট বলে?

যাই হোক, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন সকাল থেকেই মাড়োয়ারী-গৃহে দেখা যায় ঢিলেঢালা ভাব—অনেকটা মধ্যবিত্ত

১. পঞ্চাঙ্কার—পাঁজির

বাঙালি গৃহেরই মতো। তবে বাজার যাওয়া, র‍্যাশন তোলা, মাংসের দোকানে লাইন দেওয়া ইত্যাদির প্রশ্ন নেই। দোকান-বাজার জেনানা লোগকা কাম হ্যায়, আর বাড়িতে মাছমাংস রান্না বড় একটা হয় না।

ঘুম থেকে অন্য দিনের মত সকাল সকাল উঠলেও ছুটির দিন মাড়োয়ারীরা নাশতা করেন একটু দেরিতে। তারপর টি. ভি-তে যদি রামায়ণ মহাভারত বা রজনীর মতো প্রোগ্রাম থাকে তাহলে টি. ভির সামনেই বসে পড়েন।

পাশাপাশি বসে রজনী হিন্দী সিরিয়ালের একদিনের অনুষ্ঠান দেখছিলাম সুরেশ রুংতার সঙ্গে। শেষ হলে সুরেশজী মন্তব্য করলেন : একদম ফালতু। পুলিশকো তং করনা বেপকুফি হ্যায়। ...লেকিন নাটক হ্যায়, মজা হ্যায়।

নাটক, মজা যেখানেই থাকে সেখানেই মাড়োয়ারিরা জমায়েত হন। তাসের স্টেকের প্রতি আকর্ষণের কারণ বোধহয় এই-ই।

রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন মধ্যাহ্নভোজনের পর বসে তাসের আড্ডা—বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি পর্যায়ক্রমে। আমাদের বহুতল বাড়ির বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ঘুরে ঘুরে বসত তাসের আড্ডা। বাইরে থেকে সঙ্গীরা আসবেন, এক একদিন আবার আমাদের হাউসিং এস্টেট থেকে ওঁরা কয়েকখানা গাড়িতে প্রশেসন করে বেরিয়ে যেতেন অন্য কারও বাড়িতে।

তাসের সঙ্গে চলে হালকা পানীয়, সন্ধ্যা হলেই কিন্তু হালকা ভারিতে পরিণত হয়। তখনও হয়ত তাস খেলা চলছে, না চললে কোনো 'বার' অভিমুখে গমন—ঠিক অতীত ছ'দিনের ক্লেদ মেটাবার জন্যে নয়, আগামী ছ'দিনের ধান্ধায় নিয়োজিত হবার জন্যে ব্যাটারি রি-চার্জের ব্যবস্থায়।

শরাবের প্রতি আসক্তি মাড়োয়ারীদের মধ্যে বিশেষ ব্যাপক হয়ে উঠেছে, বোধহয় উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালিদের ছাড়িয়ে পাঞ্জাবীদের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে। দেখা যায়, পার্টি দেওয়া হলে নিমন্ত্রণ-কার্ডে কক্‌টেইলসের উল্লেখ না থাকলে নিমন্ত্রিতদের একটা মোটা অংশ দুঃখের সঙ্গে জানান যে তাদের পক্ষে উপস্থিত হওয়া সম্ভব

হবে না। কারণ, হয় তাঁরা ওইদিন শহরের বাইরে থাকবেন অথবা ওই দিনই অন্য কোন নিমন্ত্রণ আগেই গ্রহণ করেছেন।

ওদিকে আবার একটা মুশকিলও আছে—অনেক প্রাচীনপন্থী এই শরাবী কাণ্ডকারখানার মধ্যে আসতে চান না। তাই কক্‌-টেইলসের নিমন্ত্রণ পেলেই কারণ দেখিয়ে দুঃখের সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করেন।

অনেক সময় এই সংঘর্ষের মীমাংসা করা হয় দু'দিন ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করে—একদিন জলপথ-যাত্রীদের এবং অন্যদিন ড্রাই-অতিথিদের জন্যে। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয় যাতে নিয়ন্ত্রিতদের কাছে ভুল কার্ড গিয়ে না পৌঁছোয়।

একবার আমার কাছে এইরকমই এক ভুল কার্ডই গিয়ে পৌঁছেছিল। দুঃখের সঙ্গে অসামর্থ্য জানাবার আগেই সেই বাড়ির একজন কর্মচারী গিয়ে হাজির: শেঠনে ভেজা দেখনেকো লিয়ে, আপকো পাস গলদ কার্ড তো নেহি আয়া?

তারপর সেই কক্‌টেইলসের কার্ডখানা রেখে একখানা 'নির্জলা' সান্ধ্যভোজনের কার্ড রেখে কর্মচারীটি প্রস্থান করলেন। যাবার আগে উক্তি করলেন: শেঠকো মালুম থা আপ পিতে নেহি।

জিজ্ঞাসা করলাম: কেইসে মালুম?

—মাস্টারজী লোগ থোড়ি পিয়েগা—উত্তর দিলেন ভদ্রলোক।

মাস্টারজী লোক কেন পান করেন না—সংগতি নেই বলে, না একটা ভাবমূর্তি বজায় রাখবার জন্যে? বুঝতে পারিনি। ভদ্রলোকের কাছে ব্যাখ্যাও চাইনি।

অধিকাংশ সময় দ্যূতক্রীড়া ও সহযোগ পান ভোজন শেষ করে ওঁরা ফেরেন বেশি রাতে নয়—নটা-দশটার মধ্যে। তারপর সোজা শয়নকক্ষে—বাড়িতে নৈশভোজনের বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকে না, আর তার দরকারও হয় না। উপরন্তু, আগামীকালের কর্মজীবনের জন্যে যে সুবে সুবে উঠতে হবে, আজকের অনিয়মানু-বর্তিতার হ্যাঙোভার রাখলে যে চলবে না।

বহুজীরা-গিন্নিজীরা আগে থেকে আহারাদি শেষ করে তৈরি থাকেন, কর্তারা শয়নকক্ষে ঢোকার পর তাঁরাও অনুগমন করেন।

শিশুরা হয়তো ইতিমধ্যেই শুয়ে পড়েছে, কিশোরকিশোরীরা হয়ত তখন টি. ভি. বা ভি. ডি. ও-র সামনে বসে আছে। তাদের হয়তো তখনও খাওয়াই হয়নি।

ঘটন : আমাদের পারিবারিক জীবনে তিনটি ঘটনাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়—জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু। এই তিনটেই নাকি বিধির নির্বন্ধ—এদের ওপর মানুষের কোন হাত নেই।

মনে হয় ধারাণাটি আংশিক সত্য, অন্তত বিয়েশাদি সব সময় প্রজাপতির নির্বন্ধে ঘটে না। এতে মানুষেরও কিছুটা হাত আছে, না হলে খবরের কাগজে এত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় কেন, আর প্রজাপতি-অফিসের সঙ্গেই বা যোগাযোগ করা হয় কেন?

মাড়োয়ারীরা কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন আত্মীয়স্বজন এবং দালাল অর্থাৎ ঘটকের মাধ্যমে—খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের দিকে ওঁরা বড় একটা যান না।

বিয়েশাদি : প্রমথ চৌধুরী মহাশয় পাশ্চাত্য দেশবাসীদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করে বলেছেন, 'তোমরা বিবাহ কর, আমাদের বিবাহ হয়।'* বর্তমানে অনেক ভারতীয়ের ক্ষেত্রে অবস্থান্তর ঘটলেও মাড়োয়ারীদের এখনও 'বিবাহ হয়' এবং তা অল্পবয়সেই —অনেক ক্ষেত্রে কুড়ি-একুশও পেরোয় না। আবার শাদির ব্যাপারে ছেলেমেয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য বিশেষ কিছু থাকে না—দুজনেই প্রায় সমবয়স্ক হয়। এমনকি কনে বড় হলেও আপত্তির কারণ নেই। সুতরাং ছাদনাতলায় (ওঁদের ফেরা বা সাতপাকের সময়) বর বড় না কনে বড়?—প্রশ্নের কোন প্রয়োজন নেই—যে কেউ বড় হতে পারে।

শুনেছিলাম জয়পুরের শেষ মহারাজার ছিলেন তিন পত্নী, এবং প্রথমা পত্নী যোধপুর-কন্যা মহারাজার থেকে বেশ কয়েক বছরের বড় ছিলেন। এ হ'ল ঘরানার ব্যাপার—আকবরের আমল থেকে জয়পুর-যোধপুর সম্পর্ক স্থাপনের প্রথা চলে আসছিল। তক্তের উত্তরাধিকারীর জন্যে তার চেয়ে কমবয়সী না পাওয়া গেলে কী আর করা যাবে?

১· তোমরা ও আমরা

মাড়োয়ারী শেঠদের দৃষ্টিভঙ্গি কতকটা এই রকমেরই। উয় বড়ী ঘরকী লেড়কা বা লেড়কী হ্যায়। অতএব শাদি দেওয়াই যুক্তিযুক্ত···উমরসে বড়ী হোনেসে কেয়া হোগা···লড়কী এক দো-সাল মে বড়ী হোনেসে ঝঞ্ঝাট কেয়া ?

এই প্রসঙ্গে এই মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আমার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন : মেরা উমর চালিশ, মেরা বিবিকা ভি চালিশ। লেকিন ম্যয় আভিতক নওজোয়ান হো, পরন্তু উয় একদম বুড্ডী বন গিয়া—পুরি নানী-দাদী ! ইয়ে কেইসা রেওয়াজ ?—তারপর আমার সমর্থনের জন্যে আমার দিকে চেয়ে বলেছিলেন,—বলিয়ে।

তবে লাভ-ম্যারেজ হ'লে ওইসব যুক্তিতর্ক রীতি-রেওয়াজের তোয়াক্কা না করে ছেলেমেয়েরা সমবয়সীদেরই বেছে নেয়। তখন অনেক সময়ই কৌলিক অনুষ্ঠানের বদলে হয় রেজিস্টার্ড বা ওঁদের ভাষায় কোর্ট-ম্যারেজ। কোর্ট-ম্যারেজের পর লাউডন স্টিটের মীরা মন্দির বা চিৎপুরের রানী সতী মন্দিরে বা অনুরূপ কোন স্হানে একটা ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানও হতে দেখা যায় এবং সংশ্লিষ্ট পরিবার যদি কোর্ট-ম্যারেজকে স্বচ্ছন্দে মেনে নেয় তবে সেইদিনই বা পরে একটা অভিনন্দন বা পার্টির ব্যবস্হাও হয়, যাকে ওঁরা বলেন অভ্যর্থনা—রিসেপ্সান।

এই রকম কোর্ট-ম্যারেজ আর ওদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়—অগ্রবাল মহেশ্বরী ওসওয়াল প্রভৃতি বর্ণকে অতিক্রম করে গুজরাটী-পাঞ্জাবী উত্তরপ্রদেশী, এমনকি বাঙালিদেরও স্পর্শ করেছে। তবে এই ধরনের অ-স্বজাতির মধ্যে শাদিতে সাধারণত ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানকে বাদই দেওয়া হয়। শাদি ত হৈই গয়া। আওর উসব ঝঞ্ঝাটমে কেঁও যায়গা ?

আয়োজিত-শাদির অ্যানাটমি : শাদি যদি আয়োজিত হয় তবে স্বভাবতই ভিন্ন ব্যবস্হা, এবং তা বহুপর্যায়ী।

প্রথম পর্যায় হল বার্তাচিত পাক্কা করা, তা দালাল অর্থাৎ ঘটকের মাধ্যমে হোক বা সরাসরিই হোক। বলেছি যে এ ব্যাপারে মাড়োয়ারীরা কাগজে বিজ্ঞাপন বা প্রজাপতি অফিসের আশ্রয় বিশেষ গ্রহণ করেন না। জানাচিনার মধ্যেই কাজ করতে

ভালবাসেন। কিছুটা আবছায়া থাকলে সংঘটক তা দূর করে দেন। তাঁর কাজই ত এই।

তবে জানাচিনাতেও ফাঁক থাকতে পারে, আর সংঘটক একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা নাও হতে পারেন।

বাত পাক্কি হওয়ার পরবর্তী পর্যায় হল তাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া—ওঁরা একে বলেন সাগাই, যা আমাদের পাকা-দেখা বা আশীর্বাদেরই মত।

সাগাই সাধারণত বরের বাড়িতেই হয়, এবং তখন পাত্রীকে হাজির করা হয় সেই বাড়িতে। ভাবটা যেন, দেখ লেও বেটা বা বেঠী। কী দেখবে—ভাবী জীবনসঙ্গী বা জীবন-সঙ্গিনীকে, না ভাবী শ্বশুরালকে? মোটকথা, এই ব্যবস্থায় ছেলেমেয়ের দেখাশোনার কাজ একবারেই সমাপ্ত হয়ে যায়, আত্মীয়স্বজনের অনুমোদনেরও কিছু বাকি থাকে না।

তবে অনুষ্ঠেয় সাগাই শেষ পর্যন্ত নাও হতে পারে, এবং সাগাই হয়ে গেলেই চুক্তি যে চূড়ান্ত হলো তাও মনে করা ভুল।

সাগাই-এ নিমন্ত্রণ করা হয় আত্মীয়স্বজন এবং অতি-ঘনিষ্ঠদের এবং সময় অনুকূল হলে ভুরিভোজনের ব্যবস্থাই থাকে, যা মাড়োয়ারীদের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অতি বিরল ব্যবস্থা।

এই রকম এক সাগাই-এ আমার নিমন্ত্রণ ছিল—দুপুরবেলা। বারটার আগেই পাত্রপক্ষের বাড়ি পেঁছে দেখি পরিচিত-অপরিচিত অনেকেই এসে গেছেন, তবে পাত্রীপক্ষের কেউ তখনও আসেননি। আমিও সেই অপেক্ষমান দলের শামিল হলাম। চায় ও ঠাণ্ডা আস্বাদন করা গেল, অবশ্য পানও।

সাড়ে বারোটার সময় বাড়ির সামনে একখানা গাড়ি এসে থামল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার: আ গিয়া···আ গিয়া—আমাদের বর এসেছে ···বর এসেছে-র মতোই। একখানা গাড়ি তা কি হয়েছে? নিশ্চয়ই আরও গাড়ি পেছনে আসছে।···অনুমান সঠিক, না বেঠিক প্রমাণিত হবার আগেই গাড়ি থেকে নামলেন চারজন ভদ্রলোক। দু'জনকে চিনলাম—একজন পাত্রীর পিতা আর অন্যজন সিটি কোর্টের মোটামুটি নামকরা ফৌজদারী উকিল। বাকী দুজনকে কুস্তিগীর বা অনুরূপ গোষ্ঠীর বলেই মনে হল।

ফটকের সামনে থেকেই পাত্রীর পিতার চিৎকার শোনা গেল : শাদি নেহি হোগা—ম্যয় সবকুছ্ নিগা করলিয়া !—কী ব্যাপার, কী নিগা করেছেন—ছেলের আর একবার শাদি হয়েছিল, না চরিত্র খারাপ ? কল্পনাকে আরও রাশ ছেড়ে দেবার আগেই পাত্রীর পিতার কণ্ঠস্বর আবার ধ্বনিত হল : হিন্দুস্থান কার্ডবোর্ড আউর আপকা নেহি হ্যায় · উয় বিক গয়া···আপ হামকো একদম নেহি বাতায়া···হম্ মার্কিটসে পত্তা করলিয়া।

পাত্রের পিতার দেখলাম একদম নরম সুর। কোনমতে বললেন, দেখিয়ে···

—কেয়া দেখুঙ্গা জী ?···সড়কপর ঘুমনেওয়ালা লেড়কাকা সাথ মেরা লেড়কীকা শাদি নেহি দুঙ্গা।

তারপর টি. ভি-র রামায়ণের ইন্দ্রজিতের মত তারস্বরে ঘোষণা : কভি নেহি, কভি নেহি।

ঠিকই কথা ! যাদের ব্যবসাপত্তর নেই—যারা পথে পথে ঘোরে তাদের ঘরে ব্যবসায়ী পিতা কন্যা-সম্প্রদান করেন কী করে ? মাড়োয়ারীদের শাদিতে বর নয়, ঘরই বিবেচ্য, এবং বড় ঘরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হ'ল নিজস্ব ব্যবসা, তা আবার ইণ্ডাস্ট্রি হলেই ভাল নয়।

বাঙালিদের ক্ষেত্রেও বহুল পরিমাণে না হলেও ঘর-বিচার করা হয়, এবং গুপ্ত কিছু ধরা পড়লে পাকা-দেখার পরও বিয়ে ভেঙে যেতে পারে। একবার পাকা দেখার দিনই ভেঙে গিয়েছিল। ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী অবশ্য আমি নই—বিশ্বস্ত ভদ্রলোকের মুখে শোনা। সেই ভদ্রলোকের জবানীতেই বলি :

—খুড়তুতো ভাই-এর ছেলের আশীর্বাদে যেতে হয়েছিল ঢাকুরিয়ায়। আমি তখন অ্যাডিশ্যনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ। বলতে পারেন, পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। আমায় নিমন্ত্রণ করায় বোধহয় এই ছিল তাৎপর্য। যাই হোক, ঠিক সময়ে হাজির হয়ে কন্যাপক্ষের জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি। লাভ ম্যারেজের ব্যাপার, এনিয়ে সামান্য আলোচনা হচ্ছিল। খুড়তুতো ভাইকে সম্বোধন করে একজন বললেন শুনলাম : আচ্ছা ভবেন, এতো লাভ ম্যারেজের ব্যাপার। এরজন্যে আবার পাকা-দেখার

অনুষ্ঠান কেন? সরাসরি রেজিস্ট্রি করে নিয়ে একটা পার্টি দিলেই হতো।...খুড়তুতো ভাই জবাব দিলেনঃ এ হ'ল কন্যাপক্ষের বিশেষ ইচ্ছার জন্যে, আর আমারও তো একটি মাত্র সন্তান—একটু ধুমধাম না হয় করা গেল...Man does not live by economy alone! ভদ্রলোক বোধহয় শেষের যুক্তিটিকেই সমর্থন করে করে বললেনঃ হ্যাঁ, তা বটে।

—এমন সময় একজন যুবক ঘরে ঢুকে খবর দিল: ওরা এসে গেছেন। ছেলেটি বোধহয় পাড়ারই—পাত্রের বন্ধু হবে, অভ্যর্থনা করবার জন্যে তাকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে অনুরোধ করা হয়েছিল মনে হয়।

—ভবেন এক রকম ছুটেই বাইরে গেল, কিন্তু কাউকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল না। তার পরিবর্তে বাইরে শোনা গেল কথা কাটাকাটি—গোলমাল। ভবেন বলছেঃ এখন ওকথা বললে চলবে কেন? নিমন্ত্রিতরা সব এসে গেছেন...আর কিছু শুনবার আগেই আমরা কয়েকজন বাইরে বেরিয়ে এলাম। তখন কথা কাটাকাটি প্রায় হাতাহাতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। এক ভদ্রলোকের হাত চেপে ধরে ভবেন বলছে, আশীর্বাদ না করে যেতেই পারবেন না। ভদ্রলোকও তেরিয়া হয়ে বললেন, বলেন কী! জোর করে আশীর্বাদ করাবেন? বলে অন্য হাত দিয়ে ভবেনের গলা চেপে ধরলেন। আমি তখন এগিয়ে গিয়ে দুজনকে ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। ভবেনকে সরিয়ে আনার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখে লাগল দড়াম করে এক ঘুসি—ভদ্রলোকই বাঁ হাত দিয়ে এই কাজটি করেছিলেন। আমার একটা দাঁত যেন নড়ে গেল। সেই ফাঁকেই ভদ্রলোক ভবেনের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে চলে গেলেন। পাড়ারই লোক বলে শুনেছিলাম। সুতরাং গাড়িটাড়ি করে আসেননি।

—পরে ব্যাপারটা ভবেনের মুখেই শুনেছিলাম। ভবেন ব্রাহ্মণ, আমারই খুড়তুতো ভাই, কিন্তু স্ত্রী অন্য জাতের। ওদেরও লাভ ম্যারেজ কিনা।

ভবেনের ছেলে যখন ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করছিল তখন ভদ্রলোক বাধা দেননি—ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে বিয়ের

ব্যাপার এগোচ্ছে—ঠিক আছে। তা'ছাড়া পাত্রও ভাল—লেখা-পড়ায় ভাল, ভাল চাকরি করে, বাপমায়ের একমাত্র সন্তান।

—পরে আশীর্বাদের দিনই জানলেন, বাবা ব্রাহ্মণ হলেও মা ব্রাহ্মণ নন—পাড়ার লোক হয়েও এ খবর আগে পাননি। তাই এসেছিলেন বিয়ে ভেঙে দিতে আশীর্বাদের দিনই।···

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম: বিয়ে শেষ পর্যন্ত ভেঙেই গেল?

ভদ্রলোক বললেন: না, শেষ পর্যন্ত হলো।

—শেষ পর্যন্ত হলো!—অবাক না হয়ে পারলাম না। ভদ্রলোক এবার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন: পাত্রীপক্ষের কোন উপায় ছিল না। মেশামিশি একটু বেশিদূর এগিয়েছিল কিনা!

ভদ্রলোকের প্রচ্ছন্ন ইংগিত বুঝলাম।

এরকম ব্যাপারে মাড়োয়ারীরা শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে শুরুতেই ফয়সলা করে নিতে চান। এতে মলও খসে না, লোকও হাসে না।

উত্তরবঙ্গের এক বড় চা-বাগানের মাড়োয়ারী মালিকের অর্থাৎ বড় অংশীদারের দৌহিত্র সেই বাগানেই কাজ করত, সহকারী ম্যানেজারের কাজ। দৌহিত্রটি ছিল ভদ্রলোকের বিশেষ প্রিয়। তাঁর ইচ্ছে ছিল ধীরে ধীরে তাকে তৈরি করে শেষ পর্যন্ত রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর করা। অর্থাৎ ওই জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর একরকম মালিক হবে ওই দৌহিত্রই।

ভদ্রলোকের কাছে খবর এল দৌহিত্রটি একটু দূরের এক চা-বাগানের বাঙালি ম্যানেজারের মেয়ের সঙ্গে পূর্বরাগ শুরু করেছে। সময় পেলেই জিপসি চালিয়ে সেই বাগানে যায়, রবিবারে তো বটেই।

ভদ্রলোক দৌহিত্রকে ডেকে সোজাসুজিই জিজ্ঞাসা করলেন: সব শুন লিয়া—লেকিন কেতনা দূর বাড়া?

দৌহিত্রটি চুপ করে আছে দেখে ভদ্রলোক সর্ত-সাপেক্ষে অনুজ্ঞা জারি করলেন: ঠিক হ্যায়। উয় লোক (অর্থাৎ মেয়েটির বাপ-মা) মানেগা তো শাদি কর লেও, নেহি তো কোর্ট ম্যারেজ। বাদমে উয় চাহেগা তো সেরিমনি আওর রিসেপশন।

ছেলেটি চলে গেল। তখন সামনে-বসা আমাকে ভদ্রলোক বললেন: ঠিকই হ্যায়। মেরা ডর থা জঙ্গলমে কোই কুলিকা লেড়কী না পাকড় লে।—তারপর একটু থেমে,—আওর ভি এক ডর থা···ছোকরা-ছোকরী মিলামিশা · কোই কুছ হো নেই যায়।

বললাম, এরই মধ্যে যে হয়নি তার নিশ্চয়তা কোথায়?

বললেন: হোনেসে পাপু খুদ আকর হামকো বুলতা থা। দেখা না, ম্যয়নেই নিগা কিয়া, ও কুছ বাতায়া নেহি।

জোরালো যুক্তি সন্দেহ নাই। দৌহিত্র যখন অনুরাগের ব্যাপারে নিজে কিছু জানায়নি, তখন নিশ্চয়ই কোন গড়বড়ি হয়নি। তবে হ'তে কতক্ষণ? সুতরাং এখনই ব্যবস্থা করা ভাল। এই হ'ল মাড়োয়ারীদের দৃষ্টিভঙ্গি। পরে নিরাময়ের প্রচেষ্টার পরিবর্তে আগেভাগে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করাই শ্রেয়।

অনেক সময় মাড়োয়ারীদের সাগাই হয় শাদির বেশ কিছুদিন আগে—আটদশ মাস থেকে এক বছরও হতে পারে। মধ্যবর্তী সময়ে পাত্রপাত্রীর ঘনিষ্ঠ মেলামেলা ও'রা পছন্দ করেন না। টেলিফোনে কথাবার্তা, পার্টিতে দেখাশোনা চলতে পারে—ব্যস ওই পর্যন্ত।

এক ক্ষেত্রে সাগাইয়ের পর পাত্রপাত্রী বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা শুরু করেছিল। একদিন আমার সামনেই ছেলেটির বিয়াল্লিশ বছর বয়স্ক, ইংরেজী শিক্ষিত পিতা ছেলেটিকে (বাইশ বছর বয়স্ক) ডাকলেন, এবং আমার সামনে বলেই বোধহয় ইংরেজীতে সতর্ক করে দিলেন: Look here, my son. I understand you are going a little too far. But see to it that there is no pre-marital sex.

ভূমিকাবিহীন এই ধরণের সতর্কবাণীতে আমি খানিকটা হতভম্ব হয়ে পড়লেও শেষের ব্যাখ্যাটিতে ভদ্রলোক কী বলতে চান তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ভদ্রলোক আধুনিক, ছেলেটি তো বটেই। সে উত্তর দিল: Yes Papa. We will keep that in mind,—তারপর আমার দিকে চেয়ে: Good morning, Sir.

ছেলেটি আমার ছাত্র এবং এক সময় তার বাবাও তাই ছিলেন। ও'রা আমাকে পরিবারের বন্ধু বলেই মনে করতেন। দেখলাম যে বাপ-ছেলেও পরস্পরের বন্ধু। ষোল বছরের হ'লে পুত্রকে মিত্র হিসেবেই নেওয়া উচিত—এই শাস্ত্রবাক্য মাড়োয়ারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেনে চলেন।

শ্রীগোপাল কাজারিয়া খানিকটা বিভ্রান্ত অবস্থাতেই তাঁর নিকট আত্মীয় পওয়নজী চোড়োড়িয়ার চেম্বারে ঢুকেছিলেন। মনে হ'ল আমাকে দেখে মুখ খুলতে যেন ইতস্তত করছেন। আমিও ব্যাপারটা বুঝে ওঠার উদ্যোগ করছি এমন সময় গোপালজীই বললেন: আপ বৈঠিয়ে, মাস্টারজী। আপকা সার্থভি সল্লা করনা হ্যায়।

শুনলাম সল্লা হ'ল তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের শাদি সংক্রান্ত। ছেলেটি একেবারে কালিঘাটে গিয়ে এক বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করেছে। সে এখন নবপরিণীতাকে ঘরে আনতে চায়। এ অবস্থায় কী করবেন গোপালজী বুঝতে পারছেন না।

শুনে সিদ্ধান্তে আসতে পওয়নজীর এক মিনিটও সময় লাগল না। শুধু প্রশ্ন করলেন: কালিঘাটমে শাদি! একদফে মীরা মন্দির ঘুমায়কে বহুকো ঘর লে যাইয়ে। তার কয়েক সেকেন্ড পরে,—বাদমে তো লে যানেই হোগা।

মাড়োয়ারীদের এইরকমই বাস্তব বুদ্ধি। ও'রা জল ঘোলা করার পক্ষপাতী নন।

সাগাই-এর অল্পবিস্তর দিন পরে শাদির সময় এগিয়ে গেলে শুরু হয় কার্ড বিতরণ। কার্ড বানানো ও বিতরণ—দু' ব্যাপারেই লক্ষ্য করা যায় বানিয়াবৃত্তির প্রকাশ।

কার্ড ছাপা হয় একখানা—পাত্র ও কন্যা দু'পক্ষের জন্যে। ডানদিকে থাকে পাত্রপক্ষের এবং বাঁদিকে কন্যাপক্ষের আহ্বায়ক বা আহ্বায়কদের নাম। শ্রীগণেশায় নমঃ (প্রজাপতয়ে নমঃ নয়) এবং আহ্বায়কদের মধ্যের জায়গায় থাকে পাত্রপাত্রীর কুলজি—কার সুপুত্র ও কার সুপুত্রী এবং কার সুপৌত্র ও কার সুপৌত্রী। ওই

একই কার্ড বিলি করা হয় উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব চেনা-পরিচিতদের মধ্যে। এটা ঠিক আনুষ্ঠানিক, না ব্যয়-সংক্ষেপের দ্যোতক আমি তা জানি না। কিন্তু বানিয়াবৃত্তি সাধারণত প্রকাশিত হয় কার্ডে নয়, খামে—সেখানে অনেক সময় মুদ্রিত করা হয় আহ্বায়কগণ যে যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের নাম—যেমন হিন্দুস্থান কার্ডবোর্ড কোং (প্রাঃ) লিমিটেড, বেঙ্গল টী কোম্পানী লিমিটেড, ইত্যাদি। খামেই শ্রেণীবিভক্ত করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান পাত্রপক্ষের, কোন্ কোন্‌টিই বা কন্যাপক্ষের। অনেক সময় অনুষ্ঠান-সূচীর মতো কার্ডের বিপরীত দিকটা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। বিষয়টা বোঝাবার জন্য একটা কার্ডের বাংলা তর্জমা দিলাম :

শ্রীগণেশায় নমঃ

মান্যবর

আয়ুষ্মান অজয়

(আত্মজ হরিপ্রসাদ চৌধুরী)

এবং

আয়ুষ্মতী অপর্ণা

(আত্মজা গৌরীশঙ্কর রুইয়া)

এ দুজনের শুভ-পরিণয় উপলক্ষে যথাস্থানে ও যথাসময়ে উপস্থিত হবার জন্যে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।

বিনয়াবনত

রঘুনাথ রুইয়া রামপ্রসাদ চৌধুরী

আসল কার্ডের খামের ভেতর আপনি আরও একটা ছোট খাম পেতে পারেন। তাতে থাকে এক বা একাধিক ছোট কার্ড—একখানা ভোজের, একখানা 'গীতমালিকা' বা গান শোনার, আর একখানা কক্‌টেইলসেরও হ'তে পারে। ভোজের কার্ডকে বলা হয় 'সজ্জন গোঠ' (চলতি ভাষায় সজন গোঠ)—অর্থ কন্যাপক্ষের আয়োজিত ভোজে আপনার সাদর আমন্ত্রণ। কন্যাপক্ষের স্বজন ও গোষ্ঠীভূক্ত ব্যক্তিরাও এই আমন্ত্রণ পেয়ে থাকেন। অতএব সজ্জন গোঠ হলো গোষ্ঠীভোজ। এর পরিধি বিশেষ সীমাবদ্ধ।

গীতমালিকার নিমন্ত্রণ আরও একটু ব্যাপক প্রকৃতির। ভাবটা

এই যে, দু' চারজন বেশি লোক গান শোনে তো শুনুক না। সঙ্গে সঙ্গে চায়-ঠাণ্ডা না হয় পিলানোই গেল।

কক্‌টেইলসের নিমন্ত্রণ করা হয় বিশেষ বাছাই করে। আপনি পানাসক্ত কিনা বা আপনি ওই ব্যাপারে আগ্রহী কিনা, সেটা বিচার্য বিষয়ের অন্যতর, অপরটি হলো আপনি আহ্বায়ক পরিবারের কাজে লাগবেন কি না—আপ্যায়নের ফলে ভবিষ্যতে পরিবারটির কোন উপকারে লাগতে পারেন কি না। ব্যয়বহুল কক্‌টেইলস সমাবেশের জন্যে যাকে তাকে তো আর আহ্বান জানানো যায় না!

অনেক ক্ষেত্রেই সজ্জন গোঠ ও গীতমালিকার কার্ড সচিত্র করা হয়, কক্‌টেইলসের নয়। সজ্জন গোঠের কার্ডে দেখানো হয় একজন উপবেশন করে ভোজন করছেন, আর পরিবেশক সামনে দাঁড়িয়ে। কালো রেখাচিত্র নয়, রঙিন ছবি—শিল্পীকে দিয়ে আঁকানো। অনেক সময় অবশ্য টেইল-পিসের মতন প্রেসেও ওই রকম ব্লক থাকে।

কোন্‌ বা কোন্‌ কোন্‌ কার্ড আপনার হাতে এসে পেঁছেছে সে সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে আপনি মুশকিলে পড়তে পারেন এবং তা বেদনাদায়কও হতে পারে। একবার আমার তাই হয়েছিল।

আমাদের এক অতিপরিচিত মাড়োয়ারী পড়শী—পাশাপাশি ফ্ল্যাটেই আমরা থাকি—তাঁর কন্যার শাদিতে সপরিবারে আমায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন। শাদির জন্যে তাঁরা লাউডন (ইউ. এন. ব্রহ্মচারী) স্ট্রিটে এক নামী বাড়ি ভাড়া করেছিলেন এবং শাদির দিন দুই আগে সেখানে প্রায় উঠে গিয়েছিলেন।

দিনের দিন বাঙালি রীতিমত উপহারের শাড়ি নিয়ে আমরা বিবাহ-বাসরে হাজির হলাম। সঙ্গে ছিল আমার সাত বছরের পৌত্রী। সে আশা করেছিল গুড়িয়াদিদির বিয়েতে সে তার প্রিয় আহার্য দই-বড়া অন্তত দু' ডিস খাবে। মাড়োয়ারীদের ভোজ তো! তার ঠাকুমা ঠাট্টা করে বলেছিলেন: দু' ডিস কিছুতেই দেবে না, বড় জোর এক ডিস দিতে পারে।

পেঁছে দেখলাম, কন্যাকর্তা স্বয়ং তাঁর শ্যালিকাকে সঙ্গে নিয়ে যুগলবন্দী হয়ে গেটে দাঁড়িয়ে অভ্যাগতদের সাদর অভ্যর্থনা

করছেন। আইয়ে, আও জী, কেতনা খুশ…। আমাদেরও সাদর অভ্যর্থনার ত্রুটি হ'ল না।

ভেতরে ঢুকে আমার স্ত্রী উপহারের শাড়িখানা মেয়ের মার হাতে দিলেন। কারণ, কন্যা তখন ফেরায়—অর্থাৎ সপ্তপদীতে।

একধারে তাকিয়ে দেখলাম খানা গরম হচ্ছে। আশা করেছিলাম সময় হলেই ডাক পড়বে। কিন্তু ডাক আর পড়ল না।…

অনেকক্ষণই ছিলাম। ক্রমে তিন-চতুর্থাংশের মত অভ্যাগত চা-পানি আস্বাদন করেই চলে গেলেন। আমরাও নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে গেটের দিকে পা বাড়ালাম।

একরকম ছুটে এসেই গেটের সামনে কন্যার পিতা আমাদের ধরলেন: মুখার্জি বাবু, আপলোগ যা রহা হো?…ঠাণ্ডাউণ্ডা ঠিক লিয়া তো?…আচ্ছা, ম্যয় যাতা হুঁ…অভি সজ্জন-গোঠকা খানা চালু হোগা।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমার পৌত্রী একবার অপসৃয়মান ভদ্রলোকের দিকে, একবার যেখানে খানা গরম হচ্ছিল সেদিকে চেয়ে বললে: চল দাদা,* বাড়ি চল ·, তারপর একটু থেমে,… আমার খুব খিদে পেয়েছে।

স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ-পৌত্রী সমভিব্যাহারে চলেই এলাম।

পরে জেনেছিলাম শাদির ভোজে পাত পাড়বার জন্যে চাই টিকিট—'সজ্জন গোঠ' মার্কা অতিরিক্ত কার্ড।

কার্ড বিতরণ: কার্ড বিতরণকে ওরা বলেন কার্ড বাঁটা। এ ব্যাপারে ওদের পদ্ধতিটিতে আন্তরিকতার বা শিষ্টাচারের হয়ত কিছুটা ঘাটতি থাকতে পারে, কিন্তু তা যে অর্থনীতিসম্মত তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং কার্যকরও বটে। কার্ড আপনার কাছে পৌঁছুলেই হ'ল, কী করে পৌঁছল তা বড় কথা নয়। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় নিজেদের গাড়ি, সাইকেল পিয়ন, প্রাইভেট কুরিয়ার, আত্মীয়স্বজন, চেনা-পরিচিতদের এবং ডাক ব্যবস্থারও। নিমন্ত্রণ-পত্রে 'পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা করিবেন'—কখনও লেখা থাকে না। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণই ওঁদের কৌলিক ব্যবস্থা—তাতে আবার ত্রুটি কোথায়?

* সে আমাকে দাদা বলেই ডাকে।

নিজেদের গাড়ি করে যখন কার্ড বাঁটা হয় তখন সাধারণত পরিবারের কেউ সঙ্গে থাকেন না, বণ্টনের ভার থাকে কোনো কর্মচারীর ওপর। সাইকেল পিয়ন তো কার্ড ফেলে দিয়েই চলে যায়।

আজকাল কলকাতায় বেশ কয়েকটা প্রাইভেট কুরিয়ার সার্ভিস গড়ে উঠেছে। ডাকে পাঠানোর চেয়ে তাদের কোনটার মাধ্যমে কার্ড বিলি কিছুটা ব্যয়বহুল হলেও সময়ে পৌঁছনোর দিক দিয়ে অনেক আকর্ষণীয়। তাদের লোক কার্ড বাড়ি পৌঁছে দিয়ে প্রাপ্তি-স্বীকারের স্বাক্ষরও নেয়।

আত্মীয়স্বজন চেনা-পরিচিতদের তাঁদের নিজেদের কার্ড দেওয়ার সঙ্গে আরও কয়েকখানি কার্ড ধরিয়ে দিয়ে অনুরোধ করা হয়: বাঁট দিজিয়েগা, হাঁ? এবং মাত্র দূরদূরান্তরে কার্ড পাঠানো হয় ডাকে। সেক্ষেত্রেও বড় শহর হলে সুযোগ নেওয়া হয় কুরিয়ার সার্ভিসের।

ডাক বিভাগের অধঃপতনের ফলে কুরিয়ার সার্ভিসের প্রচলন বহু পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে এবং ব্যবসায়ীরা—মাড়োয়ারীরা তো বটেই—এর বিশেষ পৃষ্ঠপোষক।

বাড়ির গাড়ি করে যদি আপনার কাছে কোন পুত্রসন্তানের শাদির কার্ড পৌঁছোয় তবে তার সঙ্গে আসল ঘিয়ে ভাজা এক বাক্স লাড্ডুর প্রত্যাশাও আপনি করতে পারেন—লাড্ডু ও কার্ড এক সঙ্গেই বাঁটা হয়। এই লাড্ডু আপাতদৃষ্টিতে পাত্রের পরিবার থেকে এলেও আসলে আসে কন্যাপক্ষের কাছ থেকে। কন্যাপক্ষকে আগে-ভাগেই পাত্রপক্ষ জানিয়ে দেন তাঁদের সজ্জন গোঠের মধ্যে ক'জনকে লাড্ডু দিতে হবে। কন্যাপক্ষ পাত্রপক্ষের দাবিমত পরিবারপিছু চারটি (বেশি নয় তবে দৈত্যাকারের) করে লাড্ডু সুদৃশ্য বাক্সে করে পাত্রপক্ষের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। এবং সেই বাক্সই আসে কার্ডের সঙ্গে।

কার্ডের সঙ্গে যদি লাড্ডুও আপনার বাড়ি পৌঁছোয় তবে খাম খুলে দেখবেন তাতে ছোট খামও আছে সজ্জন গোঠ, ইত্যাদির।

সম্প্রতি লাড্ডুর বদলে বাদাম-বরফির প্রচলন শুরু হয়েছে, বোধহয় আরও দামী বলে।

ভাত : সাগাই ও শাদির মধ্যে আর একটা অনুষ্ঠান হয় যাকে ও'রা বলে থাকেন ভাত-ভরা, বা সংক্ষেপে শুধু ভাত। তাৎপর্য হ'লো দম্পতির ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। এর জন্যে যে যৌতুক প্রদান করা হয় তার অধিকাংশই আসে পাত্র বা পাত্রীর মাতুলালয় থেকে। মাতামহ-মাতামহী, মাতুল-মাতুলানী ছাড়াও ওই পরিবারের খুড়ো-জেঠারাও ভাত-ভরাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন, এবং করে থাকেনও।

সামান্য কিছু গহনাপত্র, বস্ত্রাদি এবং বেশ কিছুটা নগদ নিয়ে শাদির দু-একদিন আগে নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে নানী বাড়ি থেকে শোভাযাত্রা যায় পাত্র বা পাত্রীর পিত্রালয়ে। সেখানে যৌতুকপ্রদান ও পানভোজনের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

দ্রব্যাদির পরিবর্তে নগদই কেন বেশি পছন্দ করা হয় তা জানি না। হতে পারে বৈশ্যরা অন্য কিছুর চেয়ে নগদকেই বেশি কাম্য মনে করেন; এও হতে পারে হিসাব-বহির্ভূত বা কালো টাকার প্রাদুর্ভাবের দরুণ নগদে দেওয়া নেওয়া দুই-ই সুবিধাজনক।

ভাত শাদির এক অপরিহার্য অঙ্গ। ছেলের ওপর বিশ্বাস না থাকলে অবিবাহিত দৌহিত্র-দৌহিত্রীর (ওদের ভাষায় নাতি-নাতনী) জন্যে উইলে ভাতের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হয়।

ভাতে যে যৌতুক কন্যা পায় তা হয় তার স্ত্রীধন—শ্বশুরালের তাতে কোন অধিকার নেই, অথবা তা দিয়ে বিবাহের ব্যয়নির্বাহও করা যায় না। এর সঙ্গে যোগ হয় নগদে প্রদত্ত পিতৃদত্ত যৌতুক। এই যৌতুক পণপ্রথারই একটা প্রকারভেদ। জামাতাকে বা বৈবাহিককে সরাসরি পণ দিতে হয় না, দিতে হয় স্ত্রীধন হিসাবে কন্যাকে যথাযোগ্য যৌতুক। পরিমাণ কম হ'লে পিত্রালয়ের অখ্যাতি—ছোটি ঘরকা বেটী আয়া।

এই স্ত্রীধন সুদে খাটানো বা ব্যবসায়ে লাগানো যেতে পারে, কিন্তু বেয়াজ বা নাফা পুনরাবর্তিত হয়ে স্ত্রীধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

নদীর একূকুল ভেঙে অন্য কুল গড়ার মত স্ত্রীধন-যৌতুক ব্যবস্থার দরুন পাত্রপক্ষের বিত্ত বৃদ্ধি পায় এবং কন্যাপক্ষের সম্পদে সূচিত হয় একটা ফাঁক—কোন কোন ক্ষেত্রে বিরাট ফাঁক।

এই প্রসঙ্গে একজন আধুনিক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক মন্তব্য করেছিলেন: We don't have dowry system as such, but there is the curse of the system of Stridhan on us.

পুত্রসন্তানের প্রতি মাড়োয়ারীদের বেশি আকর্ষণের বোধহয় এ হ'ল অন্যতর কারণ। অপর কারণটি হ'ল পুত্রসন্তান উপার্জনের অন্যতম উপায়, কিন্তু কন্যাসন্তান মাত্র খরচের খাত।

নিকাশি: নিকাশির অর্থ বরানুগমনের সূচনা—অর্থাৎ বর কোথা থেকে বেরুবে এবং কখন বেরুবে তারই নির্দেশনামা। সময় যে সন্ধ্যা বা সন্ধ্যার পর হবে এমন কোন কথা নেই, কারণ মাড়োয়ারীদের শাদি দিনের বেলাতেও হয়—পঞ্চাঙ্ক* অনুসারে তা সম্পূর্ণ বিধিসম্মত।

বরানুগমনকে ওঁরা বলেন বরাত। অর্থ বোধহয় পাত্রপক্ষের প্রতিনিধিত্ব করা। বরাতের জন্যে সময়মত পাত্রের বাড়িতে সবাই জমায়েত হন। এবং সেখান থেকে বিবাহবাসর অভিমুখে শোভাযাত্রা। বিবাহবাসর নিজেদের বাড়ি হতে পারে, উৎসব উপলক্ষে ভাড়া-করা বাড়ি বা লন হতে পারে, আবার নামী হোটেলের ব্যাংক্যুইট হলও হতে পারে।

শোভাযাত্রায় পদব্রজে যাওয়াই বিধেয়। তবে বিবাহবাসর কাছাকাছি না হলে বরাতে যোগদানকারীরা কাছাকাছি কোথাও নেমে পড়ে, দলবদ্ধ হয়ে পা বাড়ান গন্তব্যস্থলের দিকে—ওদের ভাষায় বিবাহস্থলের দিকে।

আজকাল মাড়োয়ারী মেয়েরাও উত্তরোত্তর বর্ধমান হারে বরাতে যোগ দিচ্ছেন। তাঁরা গাড়ি করে সরাসরি বিয়ে বাড়ি গিয়ে হাজির হন, এবং বর ও বরাত হয় তাঁদের অনুগামী।

বরাতে পুরুষদের যোগদান বাধ্যতামূলক কিন্তু মেয়েদের বেলায় তা ফালতু। কারণটা কৌলিক ও ঐতিহাসিক।

---

* পঞ্জিকা

আগেকার দিনে রাজওয়াড়ার দেশে পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্যে পাত্রকে দূরে যেতে হ'লে সঙ্গে সশস্ত্র সঙ্গী-সাথী নেওয়াই ছিল বিধেয়। কারণ, গমন বা প্রত্যাগমনের সময় রাহাজানির বিশেষ ভয় ছিল। নববধূ অপহরণের ভয়ও কম ছিল না।

এমত অবস্থায় যে স্ত্রীভূমিকা বর্জিত বরাত ব্যবস্থার উদ্ভব যে ঘটবে তাতে আর আশ্চর্য কি! পথি নারী অবশ্যই বিবর্জিতা। আদি বরাত ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ অন্যান্য কয়েক ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন ধরুন—

সেদিন ছিল এক বড় ঘরের বরাত— বেলা তিনটে নাগাদ। যথা-সময়ে পৌঁছে দেখি জমায়েত বেশ জমজমাট। তখনও অবশ্য আমন্ত্রিতরা আসছেন।

কিছুটা পরে মাটির ভাঁড়ে সরবত পান করতে করতে একজনের সঙ্গে গল্প করছি এমন সময় একটা দৃশ্য নজরে পড়ল—বেশ কিছুটা স্থূলকায় বরকে একটি সুসজ্জিত ঘোড়ায় তোলবার প্রচেষ্টা হচ্ছে, প্রচেষ্টা করছেন চারপাঁচ ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে দু'জন দ্বারোয়ান—হয়ত গৃহস্বামীরই কোন কারখানার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য।

অশ্বপৃষ্ঠে আসীন করবার প্রচেষ্টা সফল হবার পরই হঠাৎ পর পর দুটি বন্দুকের গুলির শব্দ! তাকিয়ে দেখি একটু দূরে আর একজন দ্বারোয়ানের হাতের দো-নলা বন্দুকের নল দুটি তখনও ধূমোদ্গার করছে।···

অনুষ্ঠান শেষ হলো। সেই ক'জনের সাহায্যেই বর অশ্ব থেকে অবতরণ করে উঠলেন বড় এক বিদেশী গাড়িতে। তারপরেই আমরা একে একে বেরিয়ে এলাম আসল বরাতের শামিল হবার জন্যে।

আমি প্রথম দিকেই বেরিয়ে এসেছিলাম। জানতাম আমার গাড়ি কোথায় পার্ক করা আছে। সেদিকে পা বাড়িয়েছি এমন সময় শুনলাম পেছন থেকে কে যেন বলছে: আপকা গাড়ি ইধার হ্যায়। উধার সব মাগ্‌নি।···বুলাউঁ? ফিরে দেখি বক্তা হল AAEI-এর মোটর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার পাশে দাঁড়ানো শাদি-বাড়িরই এক দ্বারোয়ান। সে আমাকে চেনে। লোকটি আবার বলল: উধার সব মাগ্‌নি · আপ ইধার আইয়ে।···

এই মাগ্নি বা গাড়ি চেয়ে-নেওয়া মাড়োয়ারী সমাজের উৎসব-অনুষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মাগ্নি চাইলে গাড়ি দিতেই হবে, আর প্রার্থী পরিবার জানেন যে চাইলেই পাওয়া যাবে। তবে ভাড়া করা WBY বা WRY গাড়ি হলে চলবে না, পুরোপুরি প্রাইভেট হওয়া চাই—লোককে বোঝাতে হবে গাড়িগুলো আত্মীয়-স্বজন-সহ নিজেদেরই। ঝড়ঝড়ে হলেও ক্ষতি নেই, তবে জ্বালানী ভরে দেবেন। ট্যাঙ্ক খালি করে গাড়ি মাগ্নিতে পাঠানো খালি মিষ্টান্নের হাঁড়ি পাঠানোর সমান—দুই-ই হ'ল উৎকট রসিকতার প্রকাশ।

বিবাহস্হল ছিল আলিপুর নিউ রোডের একটা ভাড়া বাড়ির লনে। বাড়িটা চিনতাম—অন্যের শাদিতে আরও বার দুই ওখানে যেতে হয়েছিল। হঠাৎ দেখি বাড়িটা থেকে একশ' গজের মতো দূরে সকলে এক এক করে গ্যাড়ি থেকে নামছেন। তখনই ব্যাপারটা কী বুঝলাম—এখন থেকেই শুরু হবে পদব্রজে প্রসেশন। আমিও তার শামিল হলাম।

সে এক দৃশ্য! তবে মোটেই অনন্যসাধারণ নয়। আপনার চোখেও বেশ কয়েকবার পড়ে থাকবে।

পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছেন কিশোর-যুবা-বৃদ্ধের দল। অধি-কাংশেরই পোশাক সাহেবী-স্যুট-টাই অথবা সাফারি, প্রাচীনদের কেউ কেউ ধোতি-কুর্তায়, কেউ কেউ বা সেই পুরনো শেরওয়ানী ও টোপী পরে। পেছনে জুড়ি বা চৌঘুড়িতে বর থাকতে পারে, তবে এক্ষেত্রে ছিল না—বর আগেই পৌঁছে গিয়েছিল।

এই জুড়ি-চৌঘুড়ির একটা ঘটনা।

এবারও বিবাহবাসর ছিল লাউডন (ইউ. এন. ব্রহ্মচারী) স্ট্রিটের সেই বাড়িতেই, কিন্তু এবার আমি ছিলাম কন্যাযাত্রী। সুতরাং বরাতের শামিল হওয়ার কোন প্রশ্ন ছিল না।

সময়মত পৌঁছে দেখি বর বা বরাত কোনটাই তখনও আসেনি। কন্যাপক্ষের কর্তাব্যক্তিরা অভ্যর্থনা করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কিছু পরেই দু'তিনখানা দেশী-বিদেশী গাড়ি এসে ফটকের

সামনে থামল, যা থেকে নেমে আরোহী-আরোহিণীরা ভেতরে গেলেন। হঠাৎ বাইরে সতর্কবাণী: হট্ যাইয়ে, হট্ যাইয়ে। চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি বরের চৌঘুড়ি ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকছে।…

না, জুড়ি-চৌঘুড়ির প্রচলন কমলেও একেবারে অনুষ্ঠান-বহির্ভূত হয়ে যায়নি। লাউডন স্ট্রিটের মত আধুনিক পল্লীতে বরের আগমনে অশ্বপদধ্বনি শোনা যায়; মহাত্মা গান্ধী রোড, বিবেকানন্দ রোড, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ প্রভৃতি মাড়োয়ারীদের বনেদী পাড়ায় তো বটেই। সেখানে জুড়ি-চৌঘুড়ির সঙ্গে থাকে কলুটোলার ব্যান্ডপার্টি; আর সন্ধের পর বরাত গেলে থাকে গতিশীল আলোক সজ্জা, যা বোধহয় প্রাচীনকালের মশাল-বহনের প্রতীক।

অন্য একটা শাদিতে আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম—অর্থনীতি বা ব্যয়সংক্ষেপের ব্যাপার। সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল প্রাক্-বিবাহ ভোজে, যা কয়েকটি বিশিষ্ট মাড়োয়ারী পরিবারে প্রচলিত। বলা যায়, এ আমাদের বাঙালিদের আইবুড়ো ভাত খাওয়ারই মত, তবে অনেক ব্যাপক পরিধির। মাড়োয়ারী প্রাক্-বিবাহ ভোজে পুরো সজ্জন গোঠ নিমন্ত্রিত হয়, এবং ভোজও হয় সাধারণের ওপরে। তবে যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন তাঁরা আর রিসেপশন বা অভ্যর্থনার পথে যান না। অর্থনৈতিক কারণে কিনা জানি না, ওটা বাদই দেন।

নিমন্ত্রণ-লিপি পেয়ে অবাকই হয়েছিলাম—একই জায়গায় পাত্র-পক্ষের প্রাক্-বিবাহ ভোজ ও বিবাহবাসর। পরে পাত্রপক্ষের একজনের কাছ থেকেই ব্যাখ্যাটা পেয়েছিলাম: জায়গাটা ভাড়া নেওয়া হয়েছে তিনদিনের জন্যে, প্যাণ্ডেলও ওই তিনদিনের জন্যে। ব্যয় পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষ বেঁটে নেবেন। অর্থাৎ খরচ হ'ল দু-পক্ষেরই—আধাআধি।

কয়েকটা ব্যাপারে কিন্তু মাড়োয়ারীদের বেহিসাবী বলেই মনে হয়। যেমন হলো বিবাহবাসরের অলংকরণে। এতে কোন কার্পণ্য নেই, বরং আছে আতিশয্য। অলংকর্তার কেরামতি ছাড়াও

আছে আলোকের ঝর্ণাধারা, ফুলসজ্জার প্রাচুর্য আর ভেতরে সুসজ্জিত বেয়ারার মাধ্যমে ঠাণ্ডা-গরম পরিবেশন। সঙ্গে সঙ্গে নিমক মিঠাইও কিছু থাকতে পারে। সেগুলো ওজনে না হলেও দামে ভারী—যথাসম্ভব অভিজাত প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত। মোটকথা, সবকিছুতেই থাকে প্রদর্শনবাদের নিদর্শন। গোষ্ঠীভুক্তরাই এর সমালোচনা করে একে বলে থাকেন শো-বাজী, (show-বাজী) নিন্দুকেরা বলেন, দো নম্বরি রূপেয়া কা খেল।

খেল এক নম্বরি বা দো নম্বরি—যাই হোক, সমস্ত আড়ম্বরটা যে সংগতির অপচয়ের—pecuniary waste-এর পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হনিমুন ও মেইলিং লিষ্ট : শাদির পর মাড়োয়ারীদের ছেলে-বৌ সোজা যায় মধুচন্দ্রিমা যাপনে, জোড়ে বা ধুলো-পায়ে নব-বিবাহিতের শ্বশুর-বাড়ি নয়। এ-ব্যাপার মাড়োয়ারীদের মধ্যে বড় একটা শ্রেণীবিভাগ নেই—অভিজাত-অভাজন সকলেই একে শাদি নামক সেরিমনির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। তবে খুব বড় ঘরের ছেলেরা হুনিমুনে যায় বিদেশে, মধ্যবিত্তেরা ঋতু অনুসারে দূরের কোন শৈলাবাস বা সমুদ্র-সৈকতে এবং অতি সামান্য ঘরের অপত্যরা কাছাকাছি কোথাও—পুরী, রাঁচী এবং তাও সম্ভব না হলে দীঘা বা ডায়মণ্ডহারবার। শান্তিনিকেতনের টুরিস্ট লজেও একবার মধুচন্দ্রিমা যাপনকারী এক নবদম্পতির সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

এই হনিমুন ব্যবস্থা সাহেবীয়ানারই প্রতিফলন। এতে নাকি স্মার্টনেসের ওপর আর একটা প্রলেপ পড়ে—যা কোন কোন সময় ওভার-স্মার্টনেসে পরিণত হয়ে বিপদ ডেকে আনতে পারে। কিন্তু বিপদ থেকে কীভাবে উদ্ধার পেতে হয় তা মাড়োয়ারীরা ভালো-ভাবেই জানেন—যা তাঁদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

একবার মধুচন্দ্রিমা যাপনকারী এক যুগলের ওভার-স্মার্টনেসের দরুণ আমরাই বিপদে পড়েছিলাম, এবং তার পরিণতি হিসাবে হয়েছিলাম ছেলেটির পরিবারের মেইলিং লিস্টভুক্ত।

জলগাঁও থেকে অজন্তায় এসেছিলাম আমরা তিনজন—তিন-

জনই পুরুষ। অজন্তা থেকে যাব আওরংগাবাদ, সেখান থেকে ইলোরা যাবার জন্যে।

অজন্তায় পেলাম একখানা খালি ট্যাক্সি। ট্যাক্সিটা আওরংগাবাদ ফিরে যাবে। দরদাম ঠিক হলো। ট্যাক্সিতে উঠতে যাব এমন সময় একটি যুগল এসে হাজির। ছেলেটি সরাসরি জিজ্ঞাসা করল: Will you take us with you, Sir? তারপর এক নিঃশ্বাসেই—We will also share the hire.

পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম। তাদের মাড়োয়ারী বলে মনে হল এবং just married—হনিমুনে বেরিয়েছে। মেয়েটিও দেখলাম ইংরেজী-বলা এবং সমান বা একটু বেশি স্মার্ট। আমাদের কেউ কিছু বলার আগেই সে ব্যাখ্যা করল: We also saw this empty cab and thought of taking it, but found you had already engaged it.

ট্যাক্সি-চালক পাশেই দাঁড়িয়েছিল। এবার সে মুখ খুলল: নেহি সাব, চারসে জায়দা সোয়ারি লেনা মারাঠাওয়াড়ামে* মানা হ্যায়—পুলিসমে পাকড়েগা। দেখলাম কথাবার্তা ইংরেজীতে হ'লেও ব্যাপারটা সে বুঝেছে।

অনুনয় প্রলোভন সত্ত্বেও ট্যাক্সি-চালক যখন পাঁচজন সোয়ারি নিতে রাজী হল না তখন ছেলেটিই প্রস্তাব দিল: ইনকী লে যাইয়ে, হাম বাদমে বাসসে আয়ুঙ্গা।

অবাক হয়ে দেখলাম মেয়েটিও মৌন থেকে স্বামীর সিভ্যালরি সমর্থন করল। আমাদের মধ্যে কেউ কিছু বলবার আগেই ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল: By the way, where are you putting up?—আমাদের মধ্যে কোন একজন উত্তর দিয়েছিল: Print Travel Hotel.—মনে হল সে ওই হোটেলের নামও শোনেনি, কারণ সে বলল: যোকুছ হোয়। You will kindly drop her at the Railway Hotel.—মানে আওরংগাবাদ হোটেল।

সেই ব্যবস্থাই হল। ট্যাক্সি-চালক বলল: ঠিক হ্যায়। রেলবে হোটেল (প্রিন্ট ট্র্যাভেল থেকে) জায়দা দূর নেহি।

আওরংগাবাদে পেঁছে ট্যাক্সি-চালক জিজ্ঞাসা করল: পইলে

* মহারাষ্ট্রের ওই অঞ্চলের নাম

বিবিকা মকবরা* যাইয়ে গা? সনঝামে মকবরা বহুৎ বাড়িয়া দিখাই দেতা।

হ্যাঁ শুনেছিলাম, সন্ধ্যার সময় কনে-দেখা আলোয় বিবিকা মকবরা দেখতে হয়, তাজমহল যেমন জ্যোৎস্না রাতে। মেয়েটিই আগে উৎসাহ দেখাল: হাঁ, পইলে হুঁয়াই চলিয়ে। তার নব-অধিকৃত জীবনসঙ্গী যে বাসে করে পরে আসছে তা সে বোধহয় ভুলেই গিয়েছিল।

বিবিকা মকবরা দেখতে বড় জোর আধঘণ্টা সময় লেগেছিল। সবে মকবরা ছেড়ে রাস্তায় পড়েছি এমন সময় হিন্দি সিনেমার মত পুলিসের জীপ এসে আমাদের গাড়ি আটকাল। ব্যাপার কী? ব্যাপারটা না জানিয়েই পুলিস অফিসারটি বললেন: You shall have to accompany me to the Police Station. You will know everything there. স্বাভাবিকভাবেই মনে নানা ভয়ভাবনার উদয় হল: মেয়েটি কি ছেলেটির সঙ্গে পালিয়ে এসেছে? না আমাদের বিরুদ্ধে মেয়ে ফোসলানোর অভিযোগ আনা হয়েছে? কি ফ্যাসাদ রে বাবা! নিশ্চয়ই একই মনের অবস্থা ছিল সঙ্গী দুজনেরও। পাশে দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে একবার চাইলাম। মনে হল সে যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছে।

থানায় পেঁছে অনুমানমতই দেখলাম ছেলেটি অফিসারের সামনে একখানা চেয়ারে বসে। আমাদের দেখে সে লাফিয়ে উঠল, আর হারানিধিকে পেয়ে সকলের সামনেই—হ্যাঁ, বেহায়াপনাই বলতে পারেন।···

শেষ পর্যন্ত রহস্য-যবনিকা উদ্ঘাটিত হল। অজন্তা থেকে আমরা গাড়ি ছাড়বার পরই ছেলেটি আর একখানা গাড়িতে সিট পেয়ে যায়। সোজা আওরংগাবাদ হোটেলে এসে দেখে তার নব-পরিণীতা পত্নী তখনও এসে পেঁছোয়নি। পথেও দুর্ঘটনা বা ওই রকম কিছুও তার নজরে পড়েনি। তখন সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থানায় এসে অভিযোগ লেখায়।

---

* আওরঙ্গজেবের প্রথমা বেগম দিলরস বানুর সমাধি, তাজমহলের অনুকরণে নির্মিত।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম : জীপের পুলিস আমাদের গাড়ি চিনল কী করে—তিনটি মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি তরুণীকে দেখে? এবার পুলিস অফিসার জানালেন : ইয়ে জেনটেলম্যান গাড়িকো নম্বর ভি বাতায়া।

ছেলেটিও স্বীকার করল : হাঁ, আপকা নাম্বার ইয়াদ রাখ্‌খা।

না, অন্যায় কিছু নয়, তবে সাংসারিক জ্ঞানের পরিচায়ক। মাড়োয়ারীদের সাংসারিক বা বাস্তব জ্ঞান খুবই প্রখর।

বাস্তব জ্ঞান যে সত্যিই প্রখর তার আরও পরিচয় পেয়েছিলাম পরদিন ইলোরায়।

থানা থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম করছি—এমন সময় অফিসারটি অনুরোধ করলেন : আপ লোগ যা রহা হো—এক কাপ চায় তো পিকে যাইয়ে।

থানা-পুলিসের হয়রানির পর সেখানে আর চা পান করবার ইচ্ছে ছিল না। সুতরাং আমরা বেরিয়েই এলাম। কিন্তু রয়ে গেল ছেলেটি আর মেয়েটি। বলা যায়, তাদের একরকম জোর করেই বসিয়ে রাখা হল।

পরদিন ইলোরায় আবার দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলাম : আমরা থানা ছাড়বার পর কী ঘটেছিল?

—Nothing much, Sir,—ছেলেটি উত্তর দিল,—চা-পানিকো কুছ পইসা মাংতা থা। And we settled for a couple of hundred bucks.

ব্যবসায়িক বুদ্ধিই ওদের বলেছিল, থানা-পুলিসের হাঙ্গামার পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্যে একেবারেই সেট্‌ল করে নেওয়া ভাল।

আর একটি ঘটনা, এবং এটি কলকাতার। আমি অবশ্য এর প্রত্যক্ষদর্শী নই—আমার শোনা ঘটনা।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের একটি ছেলের গাড়িতে আশ-পাশের কোন এক অফিসের এক বেয়ারার ধাক্কা লেগেছিল। চোট সামান্যই কিন্তু বেয়ারাটি ছিল দূরদর্শী।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্বয়ং গাড়ি-চালানো ছেলে! সঙ্গে সঙ্গে সে সামনের পার্ক স্ট্রিট থানায় গিয়ে অভিযোগ লেখায়।

তারপর দু'তিনজন সমগোত্রীয় লোককে নিয়ে ছেলেটি কলেজ থেকে বেরোবার সময় তাকে শাসায়। জানিয়েও দেয় যে থানায় এফ. আই. আর. লেখানো হয়েছে।

তখন একজন অধ্যাপকও কলেজ থেকে বেরোচ্ছিলেন। তাঁর মধ্যস্থতায় ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয় দু-শ' টাকা ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে।

তারপর থাকে থানায় গিয়ে এফ. আই. আর. তুলে নেবার প্রশ্ন। অধ্যাপক-সহ লোকটির সঙ্গে থানায় গিয়ে অনুরোধ জানানো হ'লে অফিসারটি একেবারে ফেটে পড়েন—অধ্যাপক ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে বলেন: দূর মশাই! আপনারা যদি বাইরেই সব মিটিয়ে নেবেন তাহলে আমাদের চলে কী করে?

অধ্যাপক মহাশয়ের বোধহয় ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে একটু দেরি হয়েছিল, তবে ছেলেটির নয়। সে সঙ্গে সঙ্গে তার মাস্টার মশাইকে অনুরোধ করেছিল: You may please go, sir. I am taking care of the situation.

পরের দিন ছেলেটি স্টাফরুমে এসেছিল মাস্টার মশাইকে ধন্যবাদ জানাতে। অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি চলে আসার পর থানায় কী হয়েছিল।

—The old game, sir. The matter was settled for hundred rupees—তারপর ব্যাখ্যাও করেছিল: If you were there, he would not have perhaps accepted the graft.

—তাতে তো তোমার ভালই হ'ত—টাকাটা বাঁচত,—অধ্যাপক বাংলাতেই বলেছিলেন। ছেলেটিও বুঝেছিল, এবং অধ্যাপক মহাশয়ের ভুল ধরিয়ে দিয়েছিল: The incriminating thing would then have remained. খাঁটি কথা! ঋণের শেষ, শত্রুর শেষ এবং আধিব্যাধির শেষ রাখতে নেই। থানা-পুলিস ব্যাধি না হ'লেও যে আধিরই শামিল। মাড়োয়ারীরা একথাটা ভালভাবেই বোঝেন।

প্রত্যক্ষদর্শীর—আমারই আর একটি বিবরণ। ওরাও হনিমুনে এসেছিল—সিমলায়। রোজই ওদের সঙ্গে রীজে একবার করে দেখা

হ'ত। সামান্য আলাপও হয়েছিল। ওরা উঠেছিল অভিজাত ক্লার্ক' হোটেলে, আর আমার একটু নিচের দিকে মেরিনা হোটেলে।

চতুর্থ বা পঞ্চম দিন থেকে ছেলেমেয়ে দুটি আর রীজে এল না। ভাবলাম নিশ্চয় চলে গেছে। না, চলে যায় নি। পরের দিন বেলা তিনটে নাগাদ ছেলেটি আমাদের হোটেলে এসে হাজির। আসবার উদ্দেশ্য জানলাম। বেহিসেবী খরচ করার দরুন ছেলেটির পকেট একেবারে খালি, এমনকি ফেরার টিকিটের টাকাটাও নেই। কলকাতায় জানানো হয়েছে টাকা পাঠাবার জন্য। দু'একদিনের মধ্যেই ক্লার্কের হেড অফিস কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলের মারফত টাকাটা আসবে। কিন্তু তখন আর ট্রেনের রিজার্ভেশনের সময় থাকবে না। মাত্র দু'খানা এ. সি. স্লিপার কোচের টিকেট আছে—হয়তো কাল সকাল অবধি থাকবে।...সুতরাং আজ রাত্রের মধ্যে, অন্তত কাল সকাল ন'টার আগে তার তিনশ টাকা দরকার—এসেনসিয়াল রাদার।

জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না : হোটেলের বিলের কী হবে ?

—No problem there. সাতদিন কা চার্জ কলকাত্তামে জমা করকে তব আয়া,—উত্তর দিল ছেলেটি।

ভাবছিলাম তিনশ টাকা দেব, কি দেব-না, এমন সময় দেখলাম ছেলেটি তার ঘড়ি-আংটি খুলছে। খোলার পর বলল : Keep these. As soon as money is received from Calcutta ...আর কিছু বলতে দিলাম না। শোবার ঘর থেকে তিনশ' টাকা এনে ছেলেটির হাতে দিলাম।

বিকেলেই ছেলেটি আবার এল টাকা ফেরত দিতে। বলল, কলকাতা থেকে টাকা এসে গেছে। ফিরে যাবার সময় নিয়ে গেল আমার একখানা ভিজিটিং কার্ড।

এ হ'লো পুজোর সময়ের ঘটনা। কলকাতায় এসে কালী-পুজোর সময় পেলাম একখানা দেওয়ালির গ্রিটিংস কার্ড কোন এক বাংকার কাছ থেকে। মনে পড়ল, সিমলার সেই ছেলেটিই ত বাংকা। আবার পেলাম বড়দিন-নববর্ষের একখানা শুভেচ্ছার কার্ড সেই বাংকার কাছ থেকে। বুঝলাম আমি বাংকা পরিবারের মেইলিং লিস্টভুক্ত হয়ে গেছি।

পরে—প্রায় একবছর পরে পেলাম অন্য এক বাংকার কাছ থেকে তাঁর পোতা হওয়ার জন্য সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ। পরে জেনে-ছিলাম সেই বাংকা ছেলেটিই বাবা। বুঝলাম, বাংকা পরিবারের আরও ঘনিষ্ঠতর হয়েছি—সজ্জন গোঠের পর্যায়ে এসে গেছি।

মাড়োয়ারীরা গোষ্ঠীপ্রিয়—ক্ল্যানিস বলে সুবিদিত। ওই গোষ্ঠী কিন্তু সময় সময় বিস্তৃতিলাভও করে।

একবার ওই বাংকা ছেলেটির কাছে আমার এক বিশেষ পরিচিত বাঙালি যুবকের চাকরির জন্যে একখানা দায়সারা-গোছের অনুরোধপত্র দিয়েছিলাম। ছেলেটির কিন্তু চাকরি হয়েছিল পরের মাস থেকেই—মোটামুটি ভালই চাকরি।

গোপাল কাজারিয়া নিজেই ফোন করেছিলেন। বক্তব্য: কাল সন্ধ্যায় তাঁরই ফ্ল্যাটে লালুর শাদির পার্টি—জরুর আইয়ে গা! আরও জানালেন, কার্ড বানাবার টাইম ছিল না। শেষে জিজ্ঞাসাও করলেন: মিসেস কী সাথ লেকর আইয়ে গা তো?···

ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই লাগল। শাদি হবে, না হয়ে গেছে? হ'য়ে গেলে আবার পার্টি কীসের! সাগাই বা কবে হ'লো?

যা হোক গেলাম। গিয়ে শুনলাম শাদি হয়েছে দু'দিন আগে—কোর্ট ম্যারেজ পদ্ধতিতে।

জিজ্ঞাসা না করে পারিনি: কোর্ট ম্যারেজ কেন?

উত্তর পেয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিন্তু বিস্তারিত: মুঝে কোইকো মালুম নেহি থা শাদি হো চুকা···I thought Lalu had gone somewhere. লেকিন বেটা বারা তক একদম জানানা লেকর হাজির! ওহি টেম ম্যয় ভি ঘরমে নেহি থে···অফিস গয়া···ঘরসে ফোন মিলা। ওয়াপিস আকর সবকুছ সমঝ লিয়া। তুরন্ত হমলোগ সবকুছ মান লিয়া ভি···লেড়কী গুজরাতী···উসসে কেয়া?

—লেকিন কোর্ট ম্যারেজ কেঁও? জিজ্ঞাসা করলেন পাশে দণ্ডায়মান এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক।

কাজারিয়াজী উত্তর দেবার আগেই আর একজন বলে উঠলেন: আচ্ছাই তো কিয়া! তুরন্ত কাম হো গিয়া। কৌন জানতা—বলে চোখের একটা ইংগিত করে ভদ্রলোক চুপ করলেন।

অবাক হলাম পার্টিতে লালু ও তার নবপরিণীতা বধূকে না দেখে। সাধারণত নবদম্পতি এইরকম পার্টিতে একটা প্ল্যাটফর্মের ওপর পাশাপাশি দু'খানি চেয়ারে বসে থাকে, অথবা দিদিটিদি কারও সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অতিথিদের সঙ্গে পরিচিত হয়, এবং কেউ কিছু উপহার দিলে (যদিও উপহার দেওয়ার রীতি খুব প্রচলিত নয়) তা নিয়ে দিদির হাতেই দেয় যথাস্থানে রাখবার জন্যে। যখন এই সাধারণ অনুষ্ঠানের কোন কিছুই দেখলাম না তখন জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না : Where is Lalu and বহু ? I don't find them here.

একগাল হেসে কাজারিয়াজী বললেন : উয় লোগ হনিমুনমে গয়া···

পার্টি ছেড়ে হনিমুন !—অবাক না হয়ে পারলাম না। কাজারিয়াই ব্যাখ্যা করলেন : শাদি করে বউ নিয়ে আসার পর থেকেই হনিমুনের কথা চলছিল। কিন্তু ট্রেন, প্লেন—কিছুরই টিকিট পাওয়া যাচ্ছিল না। ট্রাভেল এজেণ্ট হঠাৎ বিকাল পাঁচটায় ফোন করে জানাল আজই রাত্রের অমৃতসর মেলে দু'খানা টিকিট পাওয়া যেতে পারে।···সেই সুযোগই নেওয়া হ'লো—ওরা চলে গেল···পার্টি হাম চালায় গা·· আপলোগ তো আয়ই গিয়া।···

উপহারের শাড়িখানা কাজারিয়াজীর হাতেই দিলাম।

পুত্রকন্যা : দ্বিজেন্দ্রলাল সখেদে (না কৌতুক করে ?) বলেছেন :

বিয়ে হলে পুত্রকন্যা
আসে যেন প্রবল বন্যা।····

এ সম্পর্কে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মাড়োয়ারীরা অন্য যে-কোন সম্প্রদায়ের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতোই সচেতন হয়ে উঠেছেন, এবং এই সচেতনতা হলো প্রবীণ-প্রবীণা, নবীন-নবীনা সকলেরই। তবে যে পর্যন্ত না পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে সে পর্যন্ত ওঁদের এই সচেতনতা ঠিক প্রকাশ পায় না, বা ওঁরাই প্রকাশ পেতে দেন না। তারপর নিশ্চিত পদ্ধতি অবলম্বন—tubectomy, যাকে ওঁরা সিনেকড্যাকি অর্থালঙ্কার প্রয়োগ করে বলেন অপারেশন। অপারেশন কিন্তু ছেলেদের বেলায় নয়।

কিশোরীলাল লাইলার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সন্তান পাঁচ-পাঁচটি। তিনি কিছুটা সংগতিপন্ন কিন্তু নোকরি করেন আত্মীয় ঢনঢনিয়াদের কাছে।

একদিন কি একটা কাজে কিশোরীলালজীর টেবিলের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম ঢনঢনিয়া পরিবারের বড়কর্তা শ্যামকুমারজীও পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারপরই কিশোরীলালজীকে ভূমিকাবিহীন শিকাইৎ : কিশোরী, তুমারা পাঁচ বাচ্চা-বাচ্চি, শুনা হ্যায় ফিন একঠো ঘুসায় দিয়া!

বোধহয় সবার সামনে আচম্বিতে অভিযোগ করায় কিশোরীলালজীও তাঁর মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন নি। কারণ তিনি প্রশ্ন করলেন : আপকা ক্যা তকলিফ?

এবার শ্যামকুমারজী নিজেকে সামলে নিলেন। বললেন : ইস দফে অপারেশন করায় লেও।

কিশোরীলালজীর মেজাজ তখনও ঠিক হয়নি। জিজ্ঞাসা করলেন : কিসিকা?

—কেঁও, বহুকী!—শ্যামকুমারজী যেন বিরক্ত।

এবার কিশোরীলাল জানালেন : শোচতা হ্যায় খুদ অপারেশন করায় লুংগা।

—কেয়া!!—শ্যামকুমারজী যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। একটু সামলে নিয়ে ফিরে গেলেন নিজের চেম্বারে।

বর্তমানের মাপকাঠিতে যুগলকিশোর চৌধুরীর সন্তানসন্ততি সংখ্যায় একটু বেশি—ওঁদেরই ভাষায় থোড়া কুছ জায়দা হ্যায়। মোট ছ'টি—পাঁচটি কন্যা ও একটি পুত্র। পুত্রটি চতুর্থ। আগে তিনটি কন্যা, পরে দুটি।

ওঁদের ফ্ল্যাটেরই সিটিং-কাম-ডাইনিং হলে সঞ্জয় গান্ধীর জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সেখানে ছিল ওঁর সেই পুত্র যার বয়েস চোদ্দ-পনের হবে, দুই বিবাহিতা কন্যা, শেঠানী এবং আমার অর্ধাঙ্গিনী।

শেঠানী মন্তব্য করলেন : এ ক্যা জুলুম…লেড়কা লোগকো পাকড়কে নাসবন্দী!…

যুগলজী প্রতিধ্বনি করলেন : বহুত বুরা কাম···হাম শোচতা থা পারওতী (পার্বতী) পয়দা হোনেকো বাদ হাম ভি অপারেশন করায় দেংগে। লেকিন পরবীন পয়দা হোনেকো বাদ শোচা লেড়কা হোনা চালু হো গিয়া—আওর থোড়া দেখুঙ্গা।

যুগলজী আরও দো লেড়কী হওয়া অবধি দেখেছিলেন। তারপর শেঠানীর সেই টিউবেকট্যামি।

ব্যাপারটাতে আমি অবাক হইনি। অবাক হয়েছিলাম শেঠানী, ওঁদের দুই কন্যা, কিশোর পুত্র এবং একটি অনাত্মীয়া ভদ্রমহিলা—আমার স্ত্রীর সামনে এই রকম জন্মদান ও জন্মনিয়ন্ত্রণের খোলাখুলি আলোচনায়। এটা অন্য কোন সমাজে হয় কিনা জানি না, অন্তত বাঙালি সমাজে নয়।

প্রবল বন্যায় ভাসবার তোয়াক্কা না করে মাড়োয়ারীরা শাদির পর থেকেই পুত্র কামনা করে থাকেন। যদিও বা কন্যাকে—অন্তত প্রথম সন্তান হিসেবে কন্যাকে তাঁরা লছমী আখ্যাই দিয়ে থাকেন। আখ্যাটা অবশ্য অনেকটাই আনুষ্ঠানিক—যেমন 'মেরা ঘরমে এক লছমী আয়া', অথবা পুতিকে আদর করতে করতে বলেন 'ইয়ে মেরা ঘরকা লছমী হ্যায়' ইত্যাদি।

একবার এক অভিজাত নার্সিংহোমে এক আত্মীয়ের সদ্যোজাত শিশুসন্তানকে দেখতে গিয়েছিলাম। যেখানে সদ্য-প্রসূতেরা থাকে সেই গ্লাসকেসের সামনে দাঁড়িয়েছিল দু'জন তরুণ। পর্যবেক্ষণ করছিল গ্লাসকেসের ভেতর নবজাতকদের। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে মনে হ'লো তাদের লক্ষ্য তিনটি গ্লাসকেসের দিকে। অনুমান করলাম তরুণ দুটি প্রথম পিতৃত্বের মর্যাদা ও আনন্দ উপভোগ করছে। অনুমানের ভিত্তিতেই অভিনন্দন জানালাম দুজনকেই : Congratulations. First sweet taste being blessed with ···শেষ করার আগে অন্য তরুণটিকে নির্দেশ করে একজন বলে উঠল : Yes ! He is with twins—both sons. But me a daughter, unfortunately.

জিজ্ঞাসা করলাম এতে দুর্ভাগ্যের কী আছে ? প্রথম কন্যা-সন্তান হওয়ার তাৎপর্য হ'লো গৃহে লছমীর আগমন। উত্তর এল : Not perhaps. Rather, a daughter is a chilling liability.

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কাগজে-পড়া রাজস্থানের এম. এল. এ. ব্রিজেন্দ্র সিং-এর শিশুকন্যা হত্যার কাহিনী। সিংজী নাকি নিজের দুটি এবং চাচেরা ভাই-এর একটি কি দুটি শিশুকন্যার হত্যা একসঙ্গে সংঘটন করেছিলেন। এই নিয়ে রাজস্থান বিধানসভায় বেশ হৈ চৈ হয়েছিল।

প্রসঙ্গত আবার বলা যায়, কন্যাসন্তানের বিরুদ্ধে এই রকম দৃষ্টিভঙ্গির কারণ বোধহয় মাড়োয়ারীদের মধ্যে (পরোক্ষ) পণপ্রথা। (পরোক্ষে) পণ ও যৌতুক দিতে না পারাটাই কন্যাপক্ষের দিক থেকে অসম্মানজনক। এর একটা আঙ্গিক উপাদান হ'লো 'স্ত্রীধন', যাকে আমার এক মাড়োয়ারী বন্ধু তাঁদের সমাজের এক অভিশাপ—a curse on our society—বলেই বর্ণনা করেছিলেন।

স্ত্রীধনের তাৎপর্য হ'লো পাত্র (বা পাত্রের পিতাকে) যা দেবার তার ওপর কন্যাকে অলংকার ছাড়া আলাদা করে কিছু নগদ দেওয়া, যার পুরোটা কন্যারই থাকার কথা, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত তা থাকে না।

এই স্ত্রীধন, পাত্রকে যৌতুক, পাত্রের পিতাকে প্রকারান্তরে পণ এবং অপরিহার্য অলংকার ইত্যাদির দরুণ কন্যাপক্ষের অনেক সময়েই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। এই অবস্থায় কন্যাকে যে chilling liability বলে বর্ণনা করা হবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

একবার এক প্রথম শ্রেণীর মাড়োয়ারীর ছেলের সঙ্গে এক তৃতীয় শ্রেণীর মাড়োয়ারী বেত্তসায়ির কন্যার প্রেম হয়েছিল। প্রেমের পরিণতিতে কন্যাপক্ষের স্বাভাবিক উৎসাহ থাকলেও পাত্রপক্ষের তা একদম ছিল না। কারণ: 'পণপ্রদানে' কন্যাপক্ষের অসামর্থ্য। পাত্রের তাউজী[১] আমাকে বলেছিলেন: আউর সব ঠিক হ্যায়, লেকিন কিন্তু-পরন্তুকা বাত হ্যায়।

—কিন্তু-পরন্তু?

—হাঁ উয় লোগ দো লাখ রুপেয়া ভি খর্চ করনে নেহি সেকেগা।

শাদি শেষ পর্যন্ত হ'য়েছিল। পাত্রীর পিতার নাভিশ্বাস উঠলেও তিনি দু'লাখের ওপর খরচ করেছিলেন। বড় ঘরে

১. জেঠামশায়

কন্যাদান ফলপ্রসূতার দিক দিয়ে অবশ্যই কাম্য, অন্তত বেওসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে। একটা মাল-যোগানের ব্যবস্থা, একটা এজেন্সি, একটা বেওসায়ে অংশীদারী—ব্যস! গলি থেকে পাকা সড়কে। বড়বাজার থেকে কুইনস্ পার্ক অথবা আলিপুরে।

পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করলে মাড়োয়ারীরা প্রথমেই সজ্জন গোঠের বাড়ীতে পাঠান রসগুল্লা বা বাদামকা বরফি। এ মিষ্টান্ন অবশ্য বৈবাহিকের বাড়ি থেকে আসে না, নিজেদের অর্থে নিজেদেরই বিতরণ করতে হয়। লাড্ডু পাঠানো হ'লে তা কিন্তু বাড়িতে তৈরি করা হয়—সেই ম্যাক্সি সাইজেরই লাড্ডু। আপনার বাড়িতে যদি রসগুল্লা-বরফি-লাড্ডুর কোনটি আসে তবে বুঝে নেবেন অমুখ শেঠের পোতা[১] হয়েছে। ওই ঘরে জন্মের সংবাদ পাবার পরই মহিলারা যে থালাকাঁসি বাজিয়েছিলেন (শাঁখ নয়), তা অবশ্য আপনার কানে এসে পোঁছয়নি। তবে টেলিফোনে খবর পেয়ে থাকতে পারেন—মেরা একটো (বা আওর একঠো) পোতা হুয়া। সঙ্গে সঙ্গে আপনার রসগুল্লার প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষা।

আবার আপনি রসগুল্লা হজম করার আগেই পেতে পারেন জন্ম উপলক্ষে সজ্জন গোঠের ভোজে নিমন্ত্রণ, দ্বিপ্রাহরিক বা সান্ধ্য যে-কোনটি হতে পারে—তবে হাই টী বা লো টী কখনই নয়।

পুত্রসন্তানের জন্মের পর চারপাঁচ দিনের মধ্যেই ভোজের মাধ্যমে জন্মোৎসবের ব্যবস্থা বোধহয় ঠিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক নয়—এতে কোন কোন সময় ট্রাজেডির পদসঞ্চারে উৎসব বানচাল হয়ে যায় এবং তা হ'য়ে দাঁড়ায় আমন্ত্রয়িতা ও নিমন্ত্রিত—উভয়েরই অস্বস্তির কারণ। একবার আমার এরকম অভিজ্ঞতাই হয়েছিল।

এক অভিজাত মাড়োয়ারী বাড়িতে পুত্রসন্তানের জন্ম উপলক্ষে মধ্যাহ্নভোজে গিয়েছিলাম। সেখানে পোঁছেই মনে হ'লো কোথায় যেন কিছু একটা ঘটেছে—চারদিকেই একটা বিমর্ষ ভাব। কর্তাব্যক্তিদের কারোও দেখা নেই, যার পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে সেই প্রজন্মেরও কেউ নেই। অভ্যর্থনা করছেন মুনিমজী আর কয়েকজন কর্মচারী। মুনিমজীর 'আইয়ে'র প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলাম। কোন

---

১. পৌত্র

কিছু না বলে তিনি ভেতরে যেতে অনুরোধ করলেন। সেখানেই শুনলাম—নবজাতক হঠাৎ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং পরিবারের সবাই সেখানেই গেছেন। আনন্দভোজ বাতিল করার কথাও উঠেছিল কিন্তু বাতিল করার সময় ছিল না।

ভোজে আর যোগদান করতে ইচ্ছে করল না। একরকম লুকিয়েই পালিয়ে এলাম। পরে শুনেছিলাম নবজাত সেদিন বিকেলেই মারা গেছে।

শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি পুত্রলাভ না হয় তবে গোদ নেওয়াই মাড়োয়ারীদের মধ্যে সর্বজনীন ব্যবস্থা। গোদ নেওয়ার ব্যাপারে অবশ্য কোন বাছবিচার নেই—ভাই বোন বা আত্মীয়ের ছেলে হ'তে পারে, পৌত্র বা দৌহিত্র হ'লেও প্রথা ও বিধি-ব্যবস্থার দিক দিয়ে কোন আপত্তি নেই। তবে মাদার টেরেজা বা মৈত্রেয়ী দেবীর বা লিলুয়া হোমের ছেলে তত পছন্দ নয়। আসল মাড়োয়ারী-রক্ত থাকা চাই, আত্মীয়স্বজনের হ'লে আরও ভাল হয়। আবার কন্যা গোদ নেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। chilling liability ইচ্ছে করে নেওয়ার কোন অর্থ আছে কি? তা'ছাড়া গদিতেই বা বসবে কে? লায়াবিলিটির পরিবর্তে চাই ক্যাপিটাল অ্যাসেট।

পার্ক সার্কাস অঞ্চলের গোরাচাঁদ রোডের নিরঞ্জন শিকাতিয়া আশাহত হ'য়ে ক্ষান্তি দিয়েছিলেন পর পর চারটি কন্যাসন্তান জন্মের পর। কয়েক বছর পরে বড় মেয়েটি বিবাহযোগ্যা হ'লো। দিলেন তার শাদি। শাদির পর তিন বছরের মধ্যেই পর পর দুটি পুত্রসন্তান প্রসব। ব্যস! শিকাতিয়াজীর আশা পূরণ।

বড়টি তিন বছরের হ'লেই তিনি তাকে গোদ নিলেন। দৌহিত্র হয়ে গেল পুত্র, তার পদবি হয়ে গেল চৌধুরী থেকে শিকাতিয়া।

নিজের ছেলে থাকলেই যে গোদ নেওয়া যাবে না, এমন কোন কথা নেই। ছেলে ত' কো-পার্শোনারী—পারিবারিক সম্পত্তিতে সে তার অংশ তো পাবেই। তবে সে যদি বাপের বশবর্তী হয়ে না চলে তবে তাকে ত্যাজ্যপুত্র না করেও গোদ নেওয়া সম্ভব। এবং মাড়োয়ারী সমাজে এই সম্ভাব্যতা বাস্তবায়িত হওয়ার দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়।

প্যারেলাল পচিশিয়ার একটি মাত্র ছেলে। সাবালক হওয়ার কিছু পরেই সে বাপের সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ করে নেয়, পৃথগন্নও হয়ে যায়। বাপ তখন বড় কন্যার পুত্রকে নিজের কাছে এনে রাখেন, এবং রটিয়ে দেন যে তিনি তাকে গোদ নিতে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভগ্ন পরিবার আবার যৌথ ও একান্নবর্তী হ'লো।

আশাভঙ্গ হওয়াতে তাঁর কন্যা-জামাতা স্বাভাবিকভাবেই একটু বিরূপ হ'য়েছিল, কিন্তু প্যারেলালজী তা মিটিয়ে দিলেন সেই দৌহিত্রের নামে কিছু টাকা হস্তান্তর করে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল মার্ক্সীয় দর্শনের গোড়ার কথা— মানুষ ভাব বা আইডিয়া দ্বারা পরিচালিত হয় না, নিয়ন্ত্রিত হয় বস্তু—ম্যাটার দ্বারা।

গোদ নেওয়ার ফলে অনেক সময় একরকম অসুবিধাতেও পড়তে হ'তে পারে। মাড়োয়ারীরা কিন্তু এই অসুবিধা অতি সহজ—সরলভাবে মিটিয়ে নেন।

নিঃসন্তান মোদী দম্পতি গোদ নিয়েছিলেন শ্রীমতী মোদীর এক ভগিনীপুত্রকে। গোদ নেবার বছর পাঁচেকের মধ্যেই অঘটন-ঘটন পটীয়সী প্রকৃতি অঘটনই ঘটালেন—মোদী দম্পতির নিজেদের একটি পুত্রসন্তান হল। এর দরুণ গোদ বাতিল হ'লো না—মোদী দম্পতির দুই পুত্রই একসঙ্গে পালিত হ'তে লাগল।

বাঙালিদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় এই রকম ঘটে। রবীন্দ্রনাথের শোধবোধ নাটকের মূল থিম্ই ত এই! কিন্তু বাঙালিদের এই রকম অঘটন ঘটবার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ তাঁরা যদি দত্তক নেন তবে তা একেবারে শেষে, সম্পূর্ণ নিরাশ হ'য়ে। আর মাড়োয়ারীদের ক্ষেত্রে তা হ'লো তড়িঘড়ি ব্যাপার—ও'রা শাদির দশ বছরও পেরোতে দেন না। কারণ বোধহয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গদিতে বসবার প্রতিনিধিকে শিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার তাগিদ। অর্থাৎ আবার সেই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ব্যাপার। পুত্রসন্তান ও'দের কাছে মূলধন-সম্পদ—আয়প্রসূ উত্তরাধিকারী। অপর দিকে আমাদের কাছে পুত্রসন্তান একরকম ব্যয়বহুল দায়— যাকে খাওয়াতে ও পরাতে, পড়াতে ও পকেট-খরচ দিতে 'হই সর্বস্বান্ত'।

মাড়োয়ারীদের এ ভয় নেই। ছেলে পনের ষোল বছরের হ'লেই হ'য়ে দাঁড়াবে উপার্জনশীল, হয় গদিতে-দুকানে ব'সে, না হয় জান-পচান আদমিকা পাস নোকরি ক'রে। না হ'লে অন্য পথও আছে—দালালি। মাড়োয়ারী-তনয় গোঁফ না-উঠতেই দালালির কাজ শেখে কাজ—পিতা দালাল হ'লে পিতার কাছে শিক্ষানবিশী করে। এই কারণে পড়ার জন্যে মাড়োয়ারী ছেলেদের প্রাতঃকালীন বা সান্ধ্য কলেজই পছন্দ। আবার প্রভাতী ও সান্ধ্য কলেজের মধ্যে প্রথমোক্তটাই। সাত-সকালে নমঃনমঃ করে পড়াই সেরে ধান্ধায় ঘোরা যায়। অনুশীলনের দরকার হ'লে দুকান-গদি তো আছেই—সেখানেও বই খুলে বসার কোন বাধা নেই।

সম্বন্ধ-সম্বন্ধী : আমরা সম্বন্ধী বলি শ্যালককে, মাড়োয়ারীরা বলেন বৈবাহিককে। সম্বন্ধী কন্যার সূত্রে হ'লে তাঁর খাতির খুব, এমনকি জামাই-এর চেয়ে বেশি। 'আও জী, আও জী' বলে সাদর আহ্বান ছাড়াও থাকে অতিরিক্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা। কলকাতার বাইরে হ'লে সম্বন্ধীর খাতিরে দু-একখানা বিশেষ রান্নার ব্যবস্থাও করা হয়, যা দামাদ[১] বাবাজীর জন্যে সাধারণত করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে নৈশভোজের সময় পাশের টেবিলে রাখা স্টিরিওতে গানও চলে, হয় হিন্দি, না-হয় পাশ্চাত্য সঙ্গীত, তা বৈবাহিকের তাতে আগ্রহ থাকুক বা না-থাকুক।

সম্বন্ধী কলকাতাবাসী হ'লে অতি কালেভদ্রে আসেন, হয় ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, না-হয় খানেমে বুলানেকো পর। খানার সঙ্গে থোড়াসে পিনার ব্যবস্থাও থাকতে পারে। ধান্ধার তাগিদে খানা-পিনার ব্যবস্থা হ'লে কোন্ সম্বন্ধী কার বাড়ি খানা খেতে যাবেন তা নির্ভর করে প্রয়োজনীয়তার আপেক্ষিকতার ওপর। ধান্ধার আকর্ষণ যাঁর কাছে বেশি তিনিই অন্য সম্বন্ধীকে খানায় বুলান, তা তিনি নিম্নপদস্থ সম্বন্ধী—মেয়ের শ্বশুর হ'লেও।

অনেক সময়ই সম্বন্ধীদের মধ্যে থাকে উত্তমর্ণ-অধমর্ণ সম্পর্ক। সাধারণত খাতক-সম্বন্ধীই মহাজন-সম্বন্ধীকে খানায় ডাকেন এবং অপরপক্ষে মহাজন-সম্বন্ধী খাতক-সম্বন্ধীকে বাড়িতেই ডেকে পাঠান 'ঋণের কথা গোপনে বলিতে একা'। এ-কাজ করা বাড়িতেই সুবিধা

---

১. জামাই

এবং শোভনও। অফিসে ঢুকতে দেখলে পাঁচজনে হাঁ করে চেয়ে থাকবে, নানাভাবে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করবে।

বাড়িতে যখন ডাকা হয় তখন আর খানাপিনার ব্যবস্থা থাকে না বললেই হয়। আহ্বায়ক সম্বন্ধী শুধু সৌজন্যমূলক জিজ্ঞাসা করেন : চায় ? ঠাণ্ঠা ? বাড়িতে পানের ব্যবস্থা থাকলে এবং তাতে সম্বন্ধী অভ্যস্ত হ'লে নীরবে পানের ডিবা হয়তো এগিয়েও দেন। একদিন আমার সামনেই এক অধমর্ণ সম্বন্ধী একটু ভুল রসিকতা করে ফেলেছিলেন। আমি তখন উত্তমর্ণ সম্বন্ধীর সঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম, এমন সময় এলেন অধমর্ণ সম্বন্ধী। ঢুকে পরস্পরের মধ্যে সম্ভাষণ বিনিময় শেষ হ'তে না হ'তেই তিনি উত্তমর্ণ সম্বন্ধীকে বললেন : আপকা কামিজ থোড়া ফাটা হ্যায়।

—উসমে কেয়া ?—জবাব দিলেন উত্তমর্ণ,—হুণ্ডি তো ফাটা নেহি।

অধমর্ণ উত্তমর্ণের কাছ থেকে হুণ্ডিতে টাকা ধার করেছিলেন, জানতাম। ওঁদের সম্প্রদায়ে সম্বন্ধীদের মধ্যেও লেনদেন হয় হুন্ডিতে। যদি অবশ্য তা বুকস্‌কা—অর্থাৎ এক নম্বরি রুপেয়া হয়। আর দো নম্বরি রুপেয়া হ'লে শুধু একটা চিরকুটে অধমর্ণ দ্বারা ঋণ-স্বীকৃতির কাজ সারা হয়। চিরকুট দরকার, কারণ কে কখন চোখ বোঁজে কে জানে !

মাড়োয়ারী সমাজে উচ্চতর পর্যায়ের সম্বন্ধীদের—অর্থাৎ কন্যার শ্বশুরদের একটা বিশেষাধিকার একরকম সর্বজনস্বীকৃত। তাঁদের পরিবারের কারও প্রয়াণের পর মশান-ইয়াত্রিরা[১] বাড়ি ফিরে এলে ভূরি না হ'লেও মোটামুটি অনুমোদনযোগ্য ভোজের ব্যবস্থা করতে হয়। নিম্নতর পর্যায়ের সম্বন্ধী কলকাতার আশেপাশের হ'লে এ ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হয়। ব্যবস্থা বলতে বোঝায় ভোজ্য-দ্রব্যাদি কন্যার শ্বশুরালে পেঁছে দেওয়া মশান-ইয়াত্রি লোগ লৌটনেকা পইলেই।

ফলে যখন খবর আসে বাঈ-এর শ্বশুরালের অমুক গতাসু হয়েছেন তখন সেদিকে ছোটার আগে তোড়াজাড় শুরু হয়ে যায় : যাও তিবারিকো ফোন করো। পচাশ আদমিকো লিয়ে পুরি বানাকে

১. শ্মশানযাত্রীরা

দো ঘণ্টাকা অন্দর দেনে সকেগা কি নেহি। ছাপ্‌পান ভোগমে ভি নিগা করো, পচাশ আদমি কো লিয়ে চার কিসিম কা কৌন কৌন মিঠা স্টাকমে হ্যায়, পর সাল দো কিসিমকা মিঠা দিয়া, উস লেকে বহৎ বাত উঠা—সিরফ্‌ দো কিসিমকা মিঠা ! হাঁ, শুন্‌ ! উয় লোক রাবণগোষ্ঠী—পর সাল চালিশ আদমিকো ভোজন ভেজা থা। বাদমে উয় লোগ শিকাইৎ কিয়া, মশানমে পচাশ আদমি গয়া—ভোজন কমতি থা।···শাক দো কিসিমকা হোনা চাহিয়ে ; থোড়া আচার ভি লে আনা।···

পুরি শাক-আচার-মিঠাই-এর বন্দোবস্ত করে শেঠজী যখন বড় সম্বন্ধীর গৃহে হাজির হলেন তখন শবযাত্রার আয়োজন চলছে, এবং একজন নাই[১] করছে সম্বন্ধীর মস্তক মুণ্ডন—ঘোল ঢালবার জন্যে নয়, মুখাগ্নির প্রস্তুতি হিসাবে। সম্বন্ধীরই মাতৃবিয়োগ ঘটেছে, তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র। এবং মুণ্ডিত মস্তকে মুখাগ্নি করা ওঁদের স্মৃতির বিধান। পরবর্তী পুত্রদের বেলায় এই রকম কোনো বিধান নেই। তবে তাঁরা মস্তক মুণ্ডন করতেও পারেন। আবার জৈনরা এই বিধান মানেনই না।

একবার এক দ্বিতীয় শ্রেণীর বা মধ্যবিত্ত মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের বাড়িতে তাঁর ছোটা সম্বন্ধীর—ছেলের শ্বশুরের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করছিলাম। খাওয়াদাওয়ার পর ছোটা সম্বন্ধী তাঁর কামিজের তলার ফতুয়া থেকে একখানি একশ' টাকার নোট বের করে গৃহস্বামী বৈবাহিকের হাতে দিলেন। সম্বন্ধী নোটখানা হাতে নিয়ে একবার দেখে বললেন : এত্‌না ! অপরপক্ষের কোনো জবাব না পেয়ে নোটখানা পাকাতে পাকাতে অন্দরের দিকে চলে গেলেন।

ব্যাপারে তখন মোটেই বুঝতে পারিনি। ভোজনের পর লেনদেনই বা হ'লো কেন, আর বড় সম্বন্ধীই বা 'এত্‌না' বলে বিস্ময় প্রকাশ করলেন কেন? পরে জেনেছিলাম, এ এক বিপরীত ভোজন-দক্ষিণা বা ভোজনের মূল্য।

ছোটা সম্বন্ধীরা দৌহিত্র (ওঁদের ভাষায় 'নাতি') জন্মগ্রহণ না করা পর্যন্ত কন্যার শ্বশুরালে বিনামূল্যে অন্নগ্রহণ করেন

১· নাপিত

না। অন্নগ্রহণ যদি করতেই হয়, তবে তার মূল্য শোধ করেন। আগে ছিল একটা থেকে পাঁচটা রজত মুদ্রা। এখন রজত মুদ্রাও নেই, আর সব জিনিসের ভাও অকল্পিতভাবে বেড়ে গেছে। তাই ভোজন-মূল্য পরিশোধের রেট এখন ১০, ২০, ৫০, ১০০ টাকা বা তার ওপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে— যার যে রকম অবস্থা। এই বিবরণে বড়া সম্বন্ধীর কাছে টাকা নেওয়াটা রীতিসম্মত বলে গণ্য হলেও মূল্যের পরিমাণটা একটু বেশি বলেই মনে হয়েছিল— একশ' টাকার মতো ভোজনের ব্যবস্থা তো করা হয়নি। তাই তিনি বিস্ময়-মিশ্রিত প্রশ্নই করেছিলেন : এত্‌না! এখানেও হিসেবের কারবার। ওঁদেরই একটি কহ্‌বৎ : হিসাব পাই পাই, বক্‌শিস এক লাখ।

দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করতে করতেই বা অবস্থান্তর ঘটবে কেন— ভোজন-মূল্যই বা আর দিতে হবে না কেন? কারণ হ'লো মিতা-ক্ষর-ব্যবস্থা অনুসারে দৌহিত্রও যে তার পিতামহের সম্পত্তির মালিক—পিতার সঙ্গে কো-পার্শোনারী। তার ভাত খাওয়া অন্যায় নয়।

এর থেকে সিদ্ধান্ত হ'লো দৌহিত্রী জন্মগ্রহণ করলে অবস্থান্তর ঘটেনা। দৌহিত্রী তো আর কো-পার্শোনারী নয়! সুতরাং কন্যার পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ না করা পর্যন্ত ভোজন-মূল্য দিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। যদি অপেক্ষা নিরর্থক হয় তখন গোদের ব্যবস্থা কার্যকর হয়। বহিরাগত দৌহিত্রের ভাত খাওয়া চলে, কিন্তু নিজের দৌহিত্রীর নয়। ওঁদের সমাজ যে এখনও মূলত পিতৃ-তান্ত্রিক। হিন্দু অবিভক্ত পরিবার বা এইচ. ইউ. এফ-এর ব্যবস্থা করে দেশের আইন পিতৃতান্ত্রিকতাকেই সমর্থন জানিয়েছে। এর বিশেষ প্রকাশ হ'লো কর্মক্ষেত্রে ও কর্মকান্ডে, বিশেষ করে আয়কর-ব্যবস্থায়।

কর্মক্ষেত্র ও ক্ষেত্রকাণ্ড : পুনরুক্তি করা করা যেতে পারে, মাড়োয়ারী সমাজে বিড়লাদের অনেক সময় উল্লেখ করা হয় রাজবংশী বা দ্য রয়্যাল ফ্যামিলি বলে। এতে উপহাসের উপাদান বিশেষ নেই। সত্যিই বিড়লা-ভবন মাড়োয়ারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং ভারতের মধ্যে হয় প্রথম না-হয় দ্বিতীয়। সরকারী

হিসেব অনুসারেই তাঁদের ব্যবসায়িক সম্পদ বা বিজনিস অ্যাসেট্স-এর দিক দিয়ে তাঁরা প্রতি বছর টাটা-ভবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এইজন্যে লোক কথায় কথায় বলে টাটা-বিড়লা বা বিড়লা-টাটা।

১৮৭৪ সালে টাটারা যখন নাগপুর এম্প্রেস মিল প্রতিষ্ঠা করেন তখন জি. ডি. বিড়লার পিতা শিবনারায়ণজী এগার টাকা মাস-মাইনের চাকরি করতেন, যা ছিল তখনকার দিনেই অনেক জমিদারের নায়েব-গোমস্তার মাইনের চেয়ে কম। আর আজ বিড়লা ঘরানার বিনিয়োজিত সম্পদের পরিমাণ হ'ল ৪৭৭১ কোটি টাকা।[১] এও আবার দু' বছর আগেকার তথ্য। ইতিমধ্যে ওঁদের সম্পদের পরিমাণ ত কমেই নি, বরং আরও কিছুটা বেড়েছে। অতএব, বিড়লা-ঘরানার কাহিনী হ'ল 'শূন্য সে শিখর পর' চড়ার কাহিনী।

বাংগড়দের কাহিনী একটু অন্য রকমের। সাত-সাতটি পুত্র রেখে অকালে প্রয়াত হন রামপ্রসাদ বাংগড়। পিতৃহীনদের প্রতিপালনের ভার পড়ে তাদের বৃদ্ধ পিতামহ রামনারায়ণজীর ওপর। তিনিই দুই পৌত্র মাগনিরাম ও রামকুমারকে কলকাতা পাঠিয়ে দেন ভাগ্যান্বেষণ করবার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে উপদেশও দেন: যো কুছভি হোয় নোকরি নেই করোগে—বিশ রুপেয়া কা নোকরি[২] মিলনেসে ভি নোকরি নেই লেগা।

দু'-ভাই-ই পিতামহের নির্দেশ শুনেছিলেন, নোকরির ধারে-কাছেও যাননি। তারপর সট্টে মে আচ্ছা পয়সা কমানে কে বাদ আজ বাংগড় ঘরানে কি সংস্থা ৭৫, আর ব্যবসায়িক-সম্পদের পরিমাণ ৬৫০ কোটি টাকায় পৌঁছে গেছে।[৩]

আরও প্রকাশ পঞ্চাশ বছর আগে পর্যন্ত কাপাস তুলোর গাঁইট বেচনেওয়ালা বাজাজ ঘরানা আজ স্কুটার, মোটর-সাইকেল, ইস্পাত, চিনি ও দাবাই-এর ক্ষেত্রে অগ্রণী হৈ। বাজাজ-ঘরানা আজ নই তকনিক[৪]কে প্রতিনিধি।'

---

১. ১৫ জুন, ৮৯,-এর ইন্ডিয়া টু-ডের হিন্দি সংস্করণ থেকে গৃহীত।

২. মাস-মাহিনা।

৩. ইন্ডিয়া টু-ডের ঐ একই সংখ্যা

৪. নয়া টেকনিক

এই রকম উত্থানের কাহিনী আরও অনেক আছে—সিংহানিয়াদের, মোদীদের, গোয়েঙ্কাদের, তবে একেবারে পতনের ঘটনা খুব একটা নেই। এক পুরুষে হয়ত বেশ কিছুটা নিম্নগতি দেখা গেল, তারপর আবার লক্ষ্য করা যাবে পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা এবং মোটামুটি সফলতাও। এর মূলে কাজ করে ওঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—ঈথশ, যা বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত ওদের কর্মকাণ্ডে।

কর্মক্ষেত্রকে ওঁরা মুক্তি-মার্গ বলে মনে করেন। ঐ সম্প্রদায়ের একটি ছেলের ভাষায়, therein lies our salvation.

ছেলেটি আমার কাছে এসেছিল সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ছেড়ে অন্য কোথাও ভর্তি হওয়া যায় কিনা, তারই খোঁজে। সে লেখাপড়ায় খুবই ভাল, আর সমান বলিয়ে-কইয়ে। অনার্স নিয়ে কমার্সে পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়েছিল। অনার্সে সে যে প্রথম শ্রেণীতে থাকবে তাতে কারও কোন সন্দেহ ছিল না; আমারও নয়। এই অবস্থায় অন্য কলেজে যাওয়ার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে, বুঝলাম না। আচরণজনিত কারণে কলেজ তাকে বিতাড়িতও করেনি।

ছেলেটি নিজেই কারণ ব্যাখ্যা করেছিল: তার সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়ার অসুবিধা আছে। ওখানে পড়লে সারা সকালটাই 'নষ্ট' হয়ে যায় পড়াই-এর জন্যে। ঐ সময়ই পার্টিরা আসে তাদের তৈরী ফ্ল্যাটের খোঁজ করতে, কনট্রাক্টাররা আসে নির্দেশ নিতে। সাপ্লায়াররাও আসে। মোটকথা, সকালটাই তার কাজের সময়। তার পাপা অনেক সময়ই কলকাতার বাইরে থাকেন। সুতরাং তাকেই সব দেখতে হয়।

প্রতিবাদ করেছিলাম কিন্তু তোমাদের ছেলেদের বেশির ভাগই ত' সকালে পড়তে যায়।···Leave them aside, sir,—উত্তর দিয়েছিল ছেলেটি, Nature of my business is different from theirs. Besides—বলে ছেলেটি থেমেছিল।

—Besides, what?

জেরায় পড়ে ছেলেটি আসল কারণ ব্যাখ্যা করেছিল: Besides, the college is very strict about attendance.

আমি তখন সতর্ক করে দিলাম: এইভাবে কলেজ বদলালে,

নিজেকে ঠিকমত নিয়োজিত না করলে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পাওয়ায় হয়তো অসুবিধা হ'তে পারে।

—I know, sir,—উত্তর দিয়েছিল ছেলেটি। তারপর একটু থেমে, After all, we are businessmen. And therein lies our salvation.

মাড়োয়ারীদের এই যে ঈথশ তা সুপরিস্ফুটিত করেছিলেন সেই রামচন্দ্রজীই (২৯ পৃষ্ঠা) আর এক আখ্যানের মাধ্যমে :—

—বহুৎ দিন হুয়ে পাটলিমে[১] এক রাজা থা। তাঁর বড়া লেড়কা বড়া হ'লে তাকে যুবরাজ বানানেকো বাত উঠা। রাজা বললেন, অভিষেককা পইলে রাজকুমারকা ট্রেনিং দেনা জরুরত হ্যায়।

তাই ঠিক হ'লো—রাজকুমারের শিক্ষণ শুরু হ'লো। আওর সব শিছ্ছা সমাপত্ হো যানেকো বাদ রাজকুমারকে দেশভ্রমণে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হ'তে লাগল। এটাও শিক্ষার এক অঙ্গ।

রাজা বললেন : ঘটা করে—লোকজনের সঙ্গে ভ্রমণের দরকার নেই, রাজকুমার একাই যাবেন এবং ভেষ বদলকে।[২]

মন্ত্রী পরামর্শ দিলেন, রাজকুমারকে সম্পূর্ণ একলা পাঠানো ঠিক হবে না, সঙ্গে অন্তত দেহরক্ষী হিসেবে কয়েকজন থাকা যুক্তিযুক্ত। রাজা যুক্তি মেনে নিলেন না।

শেষ পর্যন্ত ফয়সলা হ'লো রাজকুমারের সঙ্গে যাবে তার দুই আবাল্য সহচর—বন্ধু। তারাও শস্ত্রচালনায় পারদর্শী—দেহরক্ষীর কাজও করতে পারবে।

যাত্রার পূর্বে রাজকোষ থেকে প্রত্যেককে ৫০০ টি করে স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হ'লো—কাউকে কমবেশি নয়। রাজা উপদেশ দিলেন : যতদিন পার ঘুরবে—চাতুর্মাসের[৩] পইলে তক, যত পার দেশ দেখবে, চোখকান খোলা রাখবে—আর পাথেয় ফুরিরে যাবার মত হ'লেই ফিরে আসবে।

রাজার উপদেশের মধ্যে একটা বিষয় উহ্য ছিল, তা রাজপুত্র ও

১· তৎকালীন পাটলিপুত্র—বর্তমানে পাটনা

২· ছদ্মবেশে

৩· বর্ষাকালের চার মাস

তাঁর একজন বন্ধু বুঝতে পারেনি, দ্বিতীয় বন্ধুটি কিন্তু বুঝতে পেরেছিল।

দিন সাতেকের মধ্যেই তিন বন্ধু ফিরে এল—রেস্ত যা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে।

—সাত দিনকা ভিতর!—রাজা বিস্ময় প্রকাশ না করে পারলেন না।

জবাবে রাজপুত্র ও তার প্রথম বন্ধু 'জী, হাঁ' বললেও দ্বিতীয় বন্ধুটি কিন্তু চুপ করে রইল।

—হয়েছিল কি,—ব্যাখ্যা করলেন রামচন্দ্রজী,—একটু দূরের একটা রাজ্যে তিন বন্ধু গিয়ে দেখে সেখানে এক বড় মেলা হচ্ছে। সেখানের সরাইখানাতেই তারা রয়ে গেল এবং লেগে গেল সমান খরিদে এবং মৌজ-মজায়।

মেলায় য়ুনানি, না কাঁহাসে এক বড়া তলোয়ার-বেপারী আয়া থা। তার তলোয়ারের স্টকের মধ্যে একখানা রাজকুমারের খুব পছন্দ হয়ে গেল। লেকিন রুপেয়া সব খতম।

পইলা দোস্ত—কোতোয়ালকা বেটাকো ভি আওর এক তলোয়ার পছন্দ হুয়া থা। তারও কিন্তু রুপেয়া ছিল না।

দ্বিতীয় দোস্তটির কাছে বেশকিছু ছিল বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু সে বলল তারও কিছু নেই।

শুনে রাজা সেই মেলায় লোক পাঠানো ঠিক করলেন, যদি তলোয়ার দু'খানা বিক্রি না হ'য়ে গিয়ে থাকে—মেলা বোধহয় তখনও শেষ হয়নি।

লোক আর পাঠাতে হ'লো না। ওহি দিন সামকো দ্বিতীয় বন্ধুটি দু'খানা তলোয়ার নিয়ে রাজার কাছে এসে হাজির।···

তার মুখেই রাজা সব শুনলেন: রাজকুমার ও কোতোয়ালকা বেটাকা খুব পছন্দ হ'য়েছে দেখে বন্ধুটিই লুকিয়ে তলোয়ার দু'খানা কিনে তার সমানের মধ্যে রেখে দেয়। এখন মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন···।

তখুনি মহারাজ তলোয়ার দু'খানা খরিদ করে নিলেন, কীমৎ হিসাবে দিলেন প্রত্যেকটির পাঁচশ স্বর্ণমুদ্রা।

—হাঁ, বোলনে ভুল গিয়া,—উপসংহার টানলেন রামচন্দ্রজী,

—রাজকুমারকা ওহি সেকেণ্ড দোস্ত থা সওদাগরকা বেটা।…ওহি সমঝা রাজাকা বাত : কামানেসে আওর ভি ঘুমনে সকতা।…

তারপর একটু চুপ করে থেকে রামচন্দ্রজী আরও জ্ঞানপ্রকাশ করেছিলেন : দেখিয়ে বাবু! আপলোগ বাঙালী ওই রাজা-কোতোয়ালকা লেড়কাকা মাফিক হ্যায়।……মৌজ-মজার দিকেই আপনাদের ঝোঁক বেশি……আপলোগোসে বেওসা হোবে না। দো পইসা কামায় তো, উসকা বাদ মোকান-ফ্ল্যাট ঢুরেংগে, গাড়ি লেনে মাঙেঙ্গে।…আপ কাম বানানে নেহি জানতা।…

কথাটা সত্যিই। বাঙালীর ব্যবসা ঠিক হয় না। ভালভাবে সুরু করলেও শেষরক্ষা করতে পারে না। প্রয়াত শান্তিপ্রসাদ জৈনজী আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : বলতে পার, কলকাতা এতদিন ধরে ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও বাঙালীরা ব্যবসায়ে বিশেষ এগুতে পারেনি কেন? বলতে পার, অধিকাংশ বাঙালী ব্যবসায়ী পরিবার আজ রাস্তায় দাঁড়িয়েছে কেন?

উত্তর আমি দিতে পারিনি, দিয়েছিলেন শান্তিপ্রসাদজী নিজেই : The reason is you have not been able to imbibe what is called business ethos.

মাইকেল মধুসূদনই বোধহয় বলেছিলেন : ইংরেজী শিখতে গেলে ইংরেজী বলতে হয়, ইংরেজী লিখতে হয়, ইংরেজীতে ভাবতে হয়, এমনকি ইংরেজীতে স্বপ্নও দেখতে হয়।

অনুরূপভাবে বলা যায়, ব্যবসা করতে গেলে ব্যবসায়ে ধেয়ান দিতে হয়, তাকে ভালবাসতে হয়—ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ব্যবসার কথা ভাবতে হয়। বিজনেস ঈথশের এই হ'লো মৌল উপাদান। বিজনিসের জন্যেই বিজনিস—বেওসা পররতং নেহি। রামচন্দ্রজীর প্রথম কহানীতে (২৯-৩২ পৃষ্ঠা) একদিনকা সুলতান হ'য়ে বানিয়াকা লেড়কা বিজনিস করতেই এসেছিল, এবং কাজ গুছিয়েই ফিরে এল। অপরপক্ষে ব্রাহ্মন-সন্তান পড়ে গেল মৌজ-মজার ফাঁদে—সে ফিরে এল আপসোস করতে করতে। এই দ্বিতীয় কহানীর কোটালপুত্রটিকেও নিশ্চয় ঐরকম আপসোস করতে হয়েছিল।

—উয় আপসোসকা বাত নেহি থা, উয় বেওকুফি থা,—মন্তব্য করেছিলেন রামচন্দ্রজী।

ব্যবসায়ের বড় কথা হ'লো চলমান জগতে অনুপ্রবেশ। এ-ব্যাপারেও মাড়োয়ারীদের জুড়ি নেই। ব্যবসায় জগৎ প্রবহমান নদীর মত, একই জলে দু'বার ডুব দেওয়া যায় না। ও'রা ডুব দেবার চেষ্টাও করেন না, লক্ষ্য রাখেন নদীর জল কীভাবে, কোন্‌দিকে এবং কতটা জোরে বইছে। ব্যস, প্রয়োজনমত সেখানেই ডুব দেবার প্রচেষ্টা। এর দরুন অনেক সময় গড্ডলিকা-প্রবাহও দেখা যায়, এবং এক ভেড়া যব খাদে গিরে তখন 'সবকোই উসিমে ঘুসে।' তবুও কিন্তু ও'দের অনেকেই এই গড্ডলিকা-প্রবাহের শামিল হ'তে পিছপাও হন না।

পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে ওঠবার পর লাইন লেগে গেল বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্যে। হরিবাবু বোথরাও দেখি এ-ব্যাপারে তোড়জোড় করছেন। তাঁকে সতর্ক করেছিলাম : অনেকেই ইতিমধ্যে এগিয়ে গেছেন, এখনও আপনার··· !—উসমে কেয়া ? আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না বোথরাজী ;—যো নেহি সেকেগা উনকো হটনে পড়েগা। মাড়োয়ারী কহবত জানতে হে আপ ?

কহবতটা হ'লো এইরকম : একটা বেঞ্চে বড়জোর চারজন ধরে। ইতিমধ্যেই চারজন সেখানে বসেছে। পঞ্চম ব্যক্তি এসে বলে, হাম ভি বৈঠেগা, আপলোগ থোড়া হট যাইয়ে ত।

দু'জন প্রতিবাদ জানায় : জাগা কাঁহা ? আপ কাঁহা বৈঠেগা ?

—মেরে বৈঠনা হ্যায়ই,—জবাব দেয় পঞ্চম ব্যক্তিটি,—যিনকা তকলিক হোগা উয় হট যায়গা।

ব্যবসাবাণিজ্যের ধর্মই এই—অপরকে সরিয়ে জায়গা যোগাড় করে নিতে হবে। এ-ব্যাপারে আপন-পর গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠী বিচারের কোন প্রশ্ন নেই। জীবন-সংগ্রামের মূলসূত্রও বোধহয় এই।

এরজন্যে মাঝে মাঝে হয়তো মূল্য দিতে হয়—মাঝে মাঝে লোকসান হয়। লেকিন ও কোই আপসোসকা বাত নেহি। বিজনেস মে লুকসান নেহি হোগা ? এগ্‌জাম মে সব লেড়কা পাস হোগা ?

যে পরীক্ষা যত কঠিন সেখানে ফেলের হার তত বেশি। অনুরূপ-ভাবে যে ব্যবসায়ে যত নাফার সম্ভাবনা সেখানেই ব্যবসায়ীরা ঝাঁপাবেন তত বেশি। ফলে ফেলের সম্ভাবনাও বাড়বে।

এর ওপর আছে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট মামলা-মকদ্দমার আশংকা। মাড়োয়ারীরা তাতেও পিছপাও নন। কারণ এযে ব্যবসায়ের গোড়ার কথা—ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত। বরং নাফার দিক দিয়ে বিচার করে ওঁরা এই সব ঝুঁকির সঙ্গেই কোলাকুলি করেন।

আমি একবার পরিচিত এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের কাছে তাঁদের বহুতল বাড়িতে ফ্ল্যাটের সন্ধানে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক জানালেন, তিনটি ফ্ল্যাট খালি আছে, দু'টি প্রথম বিলি এবং একটি হাত-ফেরতা। হাত-ফেরতাটি কিছুটা অনির্দিষ্ট মালিকানার। ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন : ওইঠোই লিজিয়ে—তিন লাখ কেস ডাউন, আউর এক লাখ কোর্ট-কেস কো লিয়ে রাখ দিজিয়ে গা। ঐ যে তিনখানি খালি ফ্ল্যাট আছে তার এক-একটির কীমৎ পাঁচ লাখ টাকার কমি নেহি হোগা—পাঁচশ রুপেয়া করকে স্কোয়ার ফুট।

ভদ্রলোক আমাকে আশ্বাসও দিয়েছিলেন : মামলায় তদ্বিরের ভাবনা নেই—উসকো লিয়ে আদমি হ্যায়, ভকিলভি ফিট কর দুঙ্গা।...

এখানেও সোজা কস্‌ট-বেনিফিট অ্যানালিসিস। তিন লাখ টাকার ফ্ল্যাট নিলে একলাখ টাকা যদি মামলায় খরচ হয় তবুও ত' একলাখ টাকা নাফা রইল। এ-ধরনের হিসেব সামন্ততান্ত্রিক রীতি-পদ্ধতির সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

উত্তরপাড়ার এক জমিদার ছিলেন বিশেষ কৃপণ, এবং এই কারণেই তিনি পাই পয়সার হিসেব রাখতেন। একবার তিনি আমাকে হিসেবের খাতা খুলে দেখিয়েছিলেন একটি বাবলা গাছের জন্য মামলায় দেড় হাজার টাকা খরচ হয়েছে। মামলা হাইকোর্ট অবধি চলেছিল।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম : বাবলা গাছটার দাম কত হবে ?

—বড়জোর দেড় টাকা।

—দেড় টাকার গাছের জন্যে দেড় হাজার টাকা খরচ !

—টাকার প্রশ্ন নয়,—দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন জমিদার-

বাবু,—প্রশ্ন হ'লো পারিবারিক মর্যাদার।···আমার গাছ অপরে জোর করে কাটবে, তা সহ্য করার চেয়ে সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য নেওয়াই ভাল। আগে এসব ব্যাপারের মীমাংসা হোত লেঠেলের মাধ্যমে। সে দিনকাল আর নেই। তাই কোর্টেই যেতে হয়—সেখানেই দেখতে হয় শেষ পর্যন্ত।

এই শেষ পর্যন্ত দেখার পক্ষপাতী মাড়োয়ারীরা নন। তাঁরা আগেভাগেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চান। তাতে খরচ কম হয় এবং ফলে নাফাও থাকে। একলাখ টাকা মামলার জন্যে রেখে তিন লাখ টাকায় ফ্ল্যাট কিনতে পরামর্শ যে মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আমাকে দিয়েছিলেন তিনি এ আশ্বাসও দিয়েছিলেন: ওতনা তক্ খর্চ নেহি ভি হোনে সকতা—পচাশ হাজার টাকা পেলেই হ'য়ত বাদীপক্ষ মিটিয়ে নেবে। কোর্ট কেস মানেই নুকসান—ওদেরও হয়রাণি। ময় লোগ তো জমিন্দার নেহি হুঁ।

নববাবু বিলাস: কচিৎকদাচিৎ মাড়োয়ারীদের মধ্যেও সামন্ত-তান্ত্রিক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। একবার কলকাতা বিমান-বন্দরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় একখানা লিমুজিন এসে থামল। গেটের পাশে দাঁড়িয়ে দু'তিন জন লোক। তাদের মধ্যে একজন ছুটে এসে দরজা খুলে দিল, আর দু'জন অ্যাটেনশন হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পেছনের সীট থেকে নামলেন খদ্দরের আলিগড়-পাজামা ঢিলে-হাতা মোটা কলারের কুর্তা পরিহিত আসল সওয়ারি, আর সামনের সীট থেকে দু'জন চাপরাশী-গোছের লোক। দু'জনেই বাহক—একজন তাম্বুল-করঙ্ক, আর একজন ব্রীফ্‌কেশ। হুঁকার প্রচলন থাকলে সঙ্গে হয়ত হুঁকা-বরদারও থাকত।

অবতীর্ণ ব্যক্তিকে চিনলাম—এক মধ্যবয়স্ক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। নাম স্মরণ ছিল—শারদ মুর্মুরিয়া। একবার তার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল ঢপের এক মুজরায়। সেদিন তিনি ছিলেন পারিষদ-সমভিব্যাহারে। সেদিনও সঙ্গে তাম্বুল-করঙ্কবাহী ছিল, তবে ব্রীফকেসের প্রয়োজন ছিল না বলে ব্রীফকেশবাহী ছিল অনুপস্থিত।

গাড়ি থেকে নেমেই মুর্মুরিয়াজী জিজ্ঞাসা করলেন: সিকিউ-

রিটিকা অ্যানাউনস্‌মেণ্ট হো গিয়া?—আভি তক নেহি বাবু—উত্তর এল একজনের কাছ থেকে। ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলেন, পেছনে তাঁর দলবল এবং তার পেছনে আমি।

ঢুকেই ভদ্রলোক ডাকলেন: Mr Raju! তিনজনের একজন এগিয়ে এল সর্টহ্যাণ্ডের খাতা-পেন্সিল নিয়ে। ভদ্রলোক নির্দেশ দিলেন ফিরে গিয়ে দলকে কী কী করতে হবে—Cable to Mr. Mithal of Lucknow, wishing him on his birthday. Man to Lalsingh for collecting olive oil. 4 tickets from Anamika Kala Sangha for Sadat Ali's sitar recital. Regret lunch invitation of B. K. Kanoria at Bengal Club……

রাজু সর্টহ্যাণ্ডে লিখে চলল। আমার মত আরও কয়েক জন দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিলেন। বাবুর অনুচরবর্গও দাঁড়িয়েছিল। বাবু যখন বসেন নি তখন দলের কেউ বসেন কি করে? আর বাবুর বেলায় মনে হ'লো, সাধারণ যাত্রী ও অন্যান্যদের সঙ্গে এক-রকম একাসনেই বা বসেন কি করে? প্লেনে অন্য কথা। সেখানে গা-বাঁচিয়ে চলবার সুযোগ নেই—y ক্ল্যাসেও নয়[১]।

সিকিউরিটি চেকের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাবু নোট দেওয়া থামালেন। তারপর তাম্বুল-করঙ্কবাহীর এগিয়ে দেওয়া পাত্র থেকে এক খিলি পান মুখে দিয়ে, আর একজনের থেকে টিকিট ও বোর্ডিং কার্ড নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'লেন অবশ্যই সিকিউরিটি ক্যাবিনের দিকে। আমিও বোর্ডিং কাউণ্টারের দিকে পা বাড়ালাম।

প্রায় অনুরূপ একটা ঘটনা ঘটেছিল আমারই চোখের সামনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার বেশ কিছুটা আগে—বোধহয় ১৯৩৪ কিম্বা ১৯৩৫ সালে। ঘটনাটি বাঙালী সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের পরিচায়ক, এবং তার ভূমিকায় ছিলেন এক স্বনামধন্য ব্যক্তি—যাঁর পরিচয় পরে জেনেছিলাম।

বাড়ির লোকদের সঙ্গে শিয়ালদহ স্টেশনে এসেছিলাম দার্জিলিং মেল-এ এক আত্মীয়কে তুলে দিতে। আত্মীয়টি যে কামরায় উঠলেন তার পাশের এক প্রথম শ্রেণীর কামরার সামনে দেখি

১. Executive Class

কয়েকজন লোক মালপত্র প্ল্যাটফর্মে রেখে দাঁড়িয়ে—যেন কার অপেক্ষা করছেন। হয়তো মনে প্রশ্ন জেগেছিল, ওঁরা মালপত্র কামরায় তুলে অপেক্ষা করছেন না কেন?

ট্রেন ছাড়ার সময় হ'লো। আমরা আমাদের দার্জিলিং যাত্রী আত্মীয়কে শেষ বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁর দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে নেমে এলাম।[১] দেখি, তখনও সেই প্রথম শ্রেণীর কামরাটির সামনে সেই সমাবেশ—সবাই যেন বিশেষ উৎকণ্ঠা নিয়ে গেটের দিকে তাকিয়ে আছেন।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বাঁশী বাজিয়ে সবুজ পতাকা ওড়াল। ট্রেনেরও হুইসিল শোনা গেল। এমন সময় দৃষ্টি গোচর হ'লো কয়েকজন ভৃত্যজাতীয় ব্যক্তির সঙ্গে এক ভদ্রলোক গেট পেরিয়ে এগিয়ে আসছেন। সমাবেশের একজন চেঁচিয়ে উঠলেন—এসে গেছেন। আর একজন মন্তব্য করলেন—আর কি হবে, গাড়িতো ছেড়ে দিয়েছে। গার্ড অবশ্য তখনও গাড়িতে ওঠেনি। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে দেখে যাঁর যাবার কথা তিনি পা আর না বাড়িয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর সবাইকে ইঙ্গিত করলেন চলে আসতে। কুলির মাথায় মালপত্র দিয়ে সবাই ফিরে গেলেন।

কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। হয়তো একটু জোরে পা চালালেই ট্রেন ধরতে পারতেন, তখন দরজা দিয়ে ছুঁড়ে মালপত্রও ভেতরে চালান করা যেত। আবার গার্ডকে অনুরোধ করলে গাড়ি হয়তো কয়েক সেকেণ্ড রুকত—দু'টোর কোনটাই ঐ শ্রেণীর অভিজাতদের পক্ষে সম্ভব নয়। কার্যসিদ্ধির জন্য অশোভন আচরণ, বা অপরের কাছে হাত-পাতা যে সেই অভিজাত্যকে ক্ষুণ্ন না করে পারেনা।

বর্ণনার অভিজাতটি ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরিচয় জেনেছিলাম পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক রেল-কর্মচারীর কাছ থেকে।

---

১. তখনকার দিনে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল আসমান-জমিন ফারাক। তখন ছিল চারটে শ্রেণী—প্রথম, দ্বিতীয় মধ্যম ও তৃতীয়। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়ার দ্বিগুন। তখনকার প্রথম শ্রেণীকেই বাতানুকূল কামরায় পরিণত করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন থেকে আহরণের ঘটনাটিও মনে পড়ে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় আইনসভার সদস্য মনোনীত হয়েছেন। পরের দিনই প্রথম অধিবেশন। কি পোশাকে তিনি আইনসভায় যাবেন সেই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি গোলদিঘিতে পায়চারি করছিলেন। সামনে দেখলেন জীর্ণ অথচ অভিজাত মুসলমানী পোশাকে সজ্জিত এক স্থূলকায় ব্যক্তি গোলদিঘি পরিক্রমা করছেন। পোশাক দেখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে হ'লো ব্যক্তিটি কলুটোলা-বাসী কোন অভিজাত মোঘলের দীন বংশধর।

পেছন থেকে ছুটে এসে হঠাৎ একজন খাদিমজাতীয় লোক মোঘল ভদ্রলোককে বলল : খোদাবন্দ ! খোদাবন্দ ! আপকা কোঠিমে আগ লাগ গিয়া—কোঠি জ্বলতা হ্যায়।

ভদ্রলোক স্থির হ'য়ে শুনে ফিরে দাঁড়ালেন। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে অভিজাত পদক্ষেপেই গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমনে উদ্যোগী হ'লেন।

তাঁর মন্থর গতি সহ্য করতে না পেরে খাদিম তাগিদ দিল : খোদাবন্দ, থোড়াসে জলদি চলিয়ে···।

ফিরে দাঁড়ালেন সেই অভিজাত মোঘল, ধমক দিয়ে খাদিমকে যা বললেন তার মর্মার্থ হ'লো : হতভাগা! কয়েকটা কাঠকুটো পুড়ছে বলে আমি আমার পূর্বপুরুষদের পদক্ষেপ-প্রণালী ছেড়ে দেব !

বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনই ঠিক করলেন যে তাঁর চিরাচরিত পোশাকেই তিনি আইনসভায় যাবেন।

আভিজাত্যের এই রকম পরিচয়-প্রদর্শনের চিন্তাও কোন মাড়োয়ারী বা কোন বৈশ্যই করবেন না। আভিজাত্য বোধহয় সামন্ততন্ত্রের একচেটিয়া—এর নকল হয় না।

উত্তরপাড়ার এক জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ইংরেজ জেলা-শাসক কালেক্টার। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছি আমরা ক'জন বালখিল্য—বাবু তখনও ওপর থেকে নামেন নি, সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে হাত কচলাচ্ছেন সদর নায়েবমশাই।

মনে হ'লো সাহেব যেন একটু বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন। জিজ্ঞাসা করলেন—বাবুর আর কত দেরি হবে? কী করছেন

তিনি ?—প্রশ্ন ইংরাজীতে করা হ'লেও বুঝতে পারলাম। তখন বোধহয় থার্ড ক্লাসে পড়ি।[১]

শুনলাম নায়েবমশাই হাত কচলিয়েই দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব দিলেন—বাথিং স্যর।—হঠাৎ আমাদের দিকে সাহেবের দৃষ্টি পড়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—হু আর দে ?

—আওয়ার সনস্ স্যর,—নায়েবমশাই জবাব দিলেন। তারপরই আমাদের তেড়ে উঠলেন—তোরা কি কচ্ছিস ওখানে ? রগড় দেখছিস ! যা···। তার আগেই অবশ্য আমরা ছুট।

পরের দিন আমরা ওখানেই খেলছিলাম। জানলার ফাঁক দিয়ে কানে এল নায়েবমশাই একজনকে বলছেন—সাহেবকে বাবু কাল আধ ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছিলেন, জান ?

—আধ ঘণ্টা!

—হ্যাঁ। আমি খবর দিতে গেলাম, বাবু বললেন আধ ঘণ্টার আগে দেখা হবে না। বললেন, সেদিন ওযে ওর বাংলায় আমাকে আধ ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছিল, মনে আছে ? যাও বল গিয়ে।···—

—বললেন ?

—না, তা আর বলিনি। বললাম, বাবু স্নান করছেন—বাথিং। তারপর বুঝিয়ে দিলাম বেশি দেরি হবেনা—হুজুর একটু অপেক্ষা করুন।

—সাহেব শুনল ?

—নিশ্চয়ই ! যা ইংরিজি বললাম···তবে কি জান, মনে হ'লো সাহেব যেন চটে গেছে···যদি মনে করে থাকে অপমান করা হয়েছে—তার বাংলায় বাবুকে বসিয়ে রাখার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে—ডেঞ্জেরেস ব্যাপার ! বুঝলে ?···শ্রোতা ভদ্রলোকও স্বীকার করলেন—হ্যাঁ, বাবুর অতটা প্রাউডনেশ দেখানো ঠিক হয়নি।···

এই রকম বিপজ্জনক পথের ধারেকাছেও মাড়োয়ারীরা যান না—সম্মানহানির এই রকম প্রত্যাঘাতের প্রচেষ্টা তাঁদের ক্ষেত্রে একরকম কল্পনাতীত। কারণ, তাঁরা এই রকম পরিস্থিতিতে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি দ্বারাই পরিচালিত হন। এয়ারপোর্টে দেখা সেই শারদ মুমুরিয়ার কথাই আবার ধরুন না।

১. এখনকার ক্লাস এইট

হোলির পর, এক বহুতল বাড়ির চত্বরে সেই ঢপের আসরের কথা (৫৩ পৃষ্ঠা)—

আসর জমে উঠেছে—সবাই কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ করছে, এমন সময় প্রবেশ করলেন ওঁদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। সঙ্গে উপযুক্ত পোশাকে সজ্জিত এক করঙ্কবাহী এবং কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গো। চারদিকে সোরগোল উঠল: শারদবাবু আ-গিয়া; শারদবাবু আ-গিয়া···সঙ্গীত পরিবেশনাই থেমে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

একটা কোচে একরকম মধ্যমণি হ'য়েই শারদবাবু বসলেন। করঙ্কবাহী কোচের হাতায় একখানা পানজর্দার ট্রে রেখে বাইরে চলে গেল।···

ঢপ আবার জমে উঠেছে···হঠাৎ ঐ বহুতল বাড়ির নিরাপত্তা বাহিনীর একজন এসে সংগঠকদের একজনের কানে কানে কি বলল, এবং পর্যায়ক্রমে সেই ভদ্রলোক আবার শারদবাবুর কানে কানে কি বললেন। শারদবাবু এবার সরবে নির্দেশ দিলেন—উনকো অন্দর লে আইয়ে।

হঠাৎ শারদবাবুর উচ্চতানে ঢপে আবার যতি পড়ল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই প্যাণ্ট ও হাওয়াই সার্ট পরা একজন যুবক এসে হাজির, এবং দু'জনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত সংলাপ উচ্চৈস্বরেই চলল। ঢপ বিরতিতেই রইল।···

—কেয়া বোলা? সাকসেনাজী কলকাত্তা আ-গিয়া!

—জী।

—উনকো তো কাল আনেকো বাত থা···আজ ছুট্টিকা দিন।···

যুবকটি চুপ করে রইল। তখন শারদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁহা উতরা?

—নিজাম প্যালেসমে। আপকো কোঠিমে ফোন কিয়া থা।

—ফোন কিয়া থা! তব তো যানেই হোগা।

—হঁ্যা, আপকো আট বাজেকা ভিতর যানে হোগা। বোলা, রাতমে তুরন্ত শো যায়েঙ্গে—কাল সুবেকা ফ্লাইট পাকড়না হ্যায়।

—হঁ্যা, যানেই হোগা!—উঠে দাঁড়ালেন শ্রীশারদ মুর্মুরিয়া।

পাশে দণ্ডায়মান একজন জিজ্ঞাসা করলেন—কৌন হ্যায় ইয়ে সাক্‌সেনা ?

—ইণ্ডাস্ট্রিজ জয়েণ্ট সেক্রেটারী,—সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন শারদবাবু। তারপর তিনি প্রস্থানপথের দিকে পা বাড়ালেন। তাঁর সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গোরাও, পেছনে সেই যুবকটি। সে একবার পেছন ফিরে ঢপের থালায় দু'খানা একশো টাকার নোট রেখে দিল। মনে হ'লো শারদবাবুরই ইঙ্গিতে।

অতি-অভিজাত মাড়োয়ারীরা সাধারণত নিজেদের কাছে পয়সা-কড়ি রাখেন না। রাহাখরচের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বহন করে ভৃত্যজাতীয় সমভিব্যাহারী—ড্রাইভারও হতে পারে।

শারদবাবুর প্রস্থানের পর একজনের মন্তব্য কানে এল : কেয়া বখেড়া! হিঁয়াভি শারদবাবুকা বিজিনেস্‌।

আর একজন একরকম প্রতিবাদই করলেন : কেয়া করেগা বেচারী। ভারত সরকারকা সচিব! এয়স্যা আদমি বুলানেসে বিবিকা গর্দিভ ছোড়কে যানে পড়তা।···

ভদ্রলোকের কথায় বড়দের সঙ্গে বাচ্চারাও হেসে উঠল। সে হাসিতে সেই রসিক ভদ্রলোকটিও যোগ দিলেন।·· ঢপ আবার সুরু হ'লো।

ঢপের মাঝখানেই আমি ভাবছিলাম শারদজীর কথা। ভারত সরকারের শিল্প-মন্ত্রকের জয়েণ্ট সেক্রেটারী ডাকলে সবকিছু ফেলে তখনই ছুটতে হয়। মনে পড়ল আমার সেই ছেলেবেলায় অভিজ্ঞতা—জমিদারবাবু ইংরেজ কালেকটরকে আধঘণ্টা বসিয়ে রেখেছিলেন।

না, সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের নকল হয় না। সঙ্গে করঙ্কবাহী থাকতে পারে, পয়সাকড়ি অপরে বহন করতে পারে, কিন্তু যেখানে লাভক্ষতি—ধান্ধার প্রশ্ন সেখানে আভিজাত্যের খোলস খসে পড়ে। হয়তো বৈশ্যশ্রেণীর ঈথশই এই। মাড়োয়ারীদের নিজেদের ভাষায়, কাম বানানেকো লিয়ে—ফয়দা উঠানোকো লিয়ে কভি কভি রাজী-খুশিকা সড়ক পড় যানে পড়তা।

যে প্রবীন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এই জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন তাঁকেই প্রতিবাদস্বরূপ বলেছিলাম—কৈ স্যার বীরেন ত' কখনও ঐ পথে চলেন নি বলেই শুনেছি।

—মালুম হ্যায়,—থামিয়ে দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন ভদ্রলোক,—উসি লিয়ে ত উনকো সবকুছ খতম হো গিয়া।···মিনিস্‌টার কা মুখপর বোল দিয়া আই ডোণ্ট টাক টু মিনিস্‌টার।[১]

মনে হয় স্যার বীরেন ঠিক পরধর্ম—বৈশ্যধর্ম বরণ করতে পারেন নি।

অনেকেই পারে না।

মনে পড়ল কোন এক জায়গায় পড়া সেই জমিদার-তনয়ের কথা।—

যুবক জমিদার ঠিক করেছিলেন উচ্চশিক্ষিত এক আধুনিক ম্যানেজার রাখবেন—ম্যানেজমেনটের আধুনিকীকরণ আর কি!

বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'লো, সাড়াও পাওয়া গেল। বেছে রাখা হ'লো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উচ্চশিক্ষিত, আইন ডিগ্রীধারী তরুণকে।

তরুণ শব্দটির একটা অর্থ অপরিণত। অপরিণত ছিল সে নিশ্চয়ই। সব কাজই মন দিয়ে, খুঁটিয়ে, নিজেকে প্রয়োগ করে করত, কিন্তু একটু বেশি বেশি। সে জমিদারবাবুর মুসাবিদাও সংশোধন করতে সুরু করল, বিশেষ করে ইংরেজী মুসাবিদার। কথাটা তরুণ জমিদারের কানেও গেল যথাসূত্রে এবং যথাসময়ে।···

একদিন অনেক রাত্রে তিনি ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন। তরুণ ম্যানেজার এলেন হন্তদন্ত হ'য়ে।

—কি ব্যাপার, স্যার? কোন খাতাটাতা ফাইলটাইল আনতে হবে? কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে?

তাঁকে বসতে না বলেই জমিদারবাবু নির্দেশ দিলেন—আমার কলমটা টেবিলের নিচে পড়ে গিয়েছে, কুড়িয়ে দিন ত।

টেবিলের তলা থেকে কলম খুঁজে তুলে এনে টেবিলের ওপর রেখে ম্যানেজারবাবু জমিদারের মুখের দিকে চাইলেন আদেশের প্রতীক্ষায়। তখনও তিনি দাঁড়িয়ে—জমিদারবাবু তাঁকে বসতে বলেন নি।

---

১. তথ্যটি সমর্থিত—The Statesman পত্রিকাতেই বেরিয়েছিল। অপরেটার থেকে একান্ত সচিবের হাত ঘুরে ফোন গিয়েছিল স্যার বীরেনের কাছে। ফোনটা নিয়ে স্যার বীরেন বলেছিলেন: L. N. Misra! Who? ···Oh minister! I don't talk to minister.

—না আর কোন কাজ নেই,—ধীরে ধীরে বললেন জমিদারবাবু, —আপনাকে কলমটা তুলে দেবার জন্যেই ডেকেছিলাম।...

পরের দিনই তরুণ ম্যানেজার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

কাহিনীটি শুনে সেই প্রবীন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক মন্তব্য করেছিলেন: আপকো ছোকরা মেনেজার আসলি কাম নেহি শিখা থা—বোসকো—ভি. আই. পিকো রাজী-খুশি রাখনা।

এই রাজী-খুশিকে বাংলায় হয়তো খাতির বলা চলে। মাড়োয়ারীরা খাতির করেন সংশ্লিষ্ট আয়কর অফিসারদের, সেলস্ ট্যাকস অফিসারদের, ইউনিয়ন লিডারদের, প্রয়োজনে লাগতে পারে এমন বিভাগীয় সচিব, উপ-সচিব, অধিকর্তাদের, করেন কোলাবোরেটারদের এবং এলাকার থানার বড়বাবু থেকে সুরু করে সবচেয়ে ছোটবাবু পর্যন্ত—সবাইকে। আর ভয় করেন বিশেষ বিশেষ এলাকায়—সর্বত্র নয়—'বাংগালী চেংড়াদের।' ওরা বোমা-বাজিতে দোরস্ত, আর অকুতোভয়ও বটে। বেপাড়ায় এসে আস্তানা গাড়লে ওদের ভয় করে চলতেই হবে।

রাজনীতির ধারেকাছে কলকাতার মাড়োয়ারীরা বড় একটা যেতে চান না, ফলে রাজনৈতিক নেতাদেরও যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেন। ভয় মূলত দোহনের—কখন যে ইলেকসানের জন্যে চাঁদার অনুরোধ আসবে, চাকরির উমেদারের জন্য ফোন আসবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তা'ছাড়া দলীয় পরিস্থিতি নিয়মিত পরিবর্তিত হচ্ছে। ব্যবসাদারের মার্কামারা না হওয়াই ভাল।

তবুও মাঝে মাঝে গায়ে দাগ পড়ে যায়। তখন তাঁরা এই দাগ থেকেই ফয়দা ওঠাবার প্রচেষ্টা করেন।

গিয়েছিলাম ওঁদের এক বিবাহ বাসরে। গৃহস্বামী এবং কন্যার পিতা ঠিক আপন জন না হলেও খুবই অন্তরঙ্গ। তবুও কিন্তু আহ্বানটা খুব উষ্ণ হ'ল না। ভদ্রলোক কার যেন প্রতীক্ষা করছেন। সঙ্গে তিনচার জন পার্শ্বচর, যাদের মধ্যে দু'জনের হাতে ক্যামেরা, যেন প্রতীক্ষিত ব্যক্তির পদার্পণ মাত্রই ফোটো তোলা হবে। বর এসে গেছে, আদর-আপ্যায়ন চলছে—তবে কার প্রতীক্ষা?

ব্যাপারটা দেখবার জন্যে একটু দূরেই স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। পাশেই অবশ্য আর একজন ছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে পেলাম অনুসন্ধিৎসার উত্তর। বিরাট এক গাড়ি থেকে নামলেন এক অতি হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি, সঙ্গে দু'জন অনুচর। আমার পাশের ভদ্রলোক মৃদুস্বরে জানিয়ে দিলেন অভ্যাগত ব্যক্তিটি একজন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী।

গৃহস্বামী তাঁর পাশে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোককে হাত ধরে কাছে টেনে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফোটো তোলার ফ্ল্যাস—ইঙ্গিত নিশ্চয়ই দেওয়া ছিল।

ফোটো তোলা হয়ে গেলে ভি. আই. পি. কে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হ'লো।

আমার পাশের ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : ব্যাপারটা দেখলেন ?

—কি ব্যাপার ?

—কেন ঐ ফোটো তোলা।…ঐ সব ফোটোর কী কীমৎ জানেন? আর যাকে পাশে টেনে নিয়ে ছবি তোলা হ'লো তাকে চেনেন ? দুটো প্রশ্নের উত্তরেই চুপ করে আছি দেখে ভদ্রলোক বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন : ঐ এক একখানা ফোটো মন্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার পরিচায়ক হিসেবে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হবে—দিল্লীতে বিভিন্ন দপ্তরে, ব্যাঙ্কে এবং অন্যান্য সংস্থায়।…আর ঐ যে ব্যক্তিটি যাকে পাশে নিয়ে ফোটো খিঁচা হ'লো সে হ'লো…ব্যাঙ্কের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাডভান্সের ম্যানজার। ওযে একেবারে দ্রবীভূত হোয়ে গেছে, দেখলেন ? হাজার হোক মিনিস্‌টারের পাশে দাঁড়িয়ে ফোটো খিঁচা !…

ভদ্রলোকের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে আমি অনেকটা অন্যমনস্ক হয়েই পড়েছিলাম। তা দেখে ভদ্রলোক ব্যাখ্যা থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : আপ কেয়া শোচতা হ্যায় ?…

—হ্যাঁ, ভাবছিলাম আর এক মড়োয়ারী-বাড়ি বিয়ের দিনের কথা।

শাদির বিরাট মণ্ডপ ও আসর। লোক গিজগিজ করছে। গৃহস্বামী অভ্যর্থনার জন্যে গেটে দাঁড়িয়ে। একখানা সাধারণ

অ্যামবাসাডার গাড়ি এসে থামল। তা থেকে নামলেন লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণজী। গৃহস্বামী কৃতাঞ্জলিপুটেই তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু মনে হ'লো গৃহস্বামীর যেন উদ্বিগ্ন ভাব।

যাই হোক্, লোকনায়ককে নিয়ে তিনি ভেতরে গেলেন আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরিয়ে নিয়ে এসে অপেক্ষমান গাড়িতে তুলে দিলেন। এবার মনে হ'লো গৃহস্বামী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

পরে জেনেছিলাম সত্যিই গৃহস্বামী হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। কারণ, তখন ছিল এমারজেনসীর সময়। ঐ সময় জয়প্রকাশজীর মত অভ্যাগত সম্মানিত হ'লেও বিপদজ্জনক অতিথি। তিনি পরিবারটির খুবই জানাশোনা, তাঁকে নিমন্ত্রণ নিশ্চয়ই করা উচিত—কিন্তু তিনি যে সত্যি সত্যি এই সময় কলকাতায় থাকবেন আর বিবাহবাসরে এসে হাজির হবেন তা কে জানত! সাধারণ অবস্থায় তাঁর সঙ্গে ফোটোও তোলা যেত, কিন্তু এখন ?···

আর একটি ফোটো তোলার কাহিনী। ফোটোর সঙ্গে টি. ভি. নিউজ রীলের জন্যেও ব্যবস্থা ছিল।

ঠাকুরপুকুর ক্যানসার সেণ্টারে কিছু টাকা দিতে এসেছেন এক সওদাগরি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ইউনিয়নের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সঙ্গে কিন্তু তথাকথিত মালিকদের একজন, যিনি বয়সে নবীন।

সেন্টারের অধিকর্তা ডাক্তার সরোজ গুপ্ত তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। অভ্যর্থনা-পর্ব শেষ হবার পর তাঁরা ডাক্তার গুপ্তকে অনুরোধ করলেন বাইরে আসতে।

—বাইরে !

—হ্যাঁ, বাইরেই ভাল। সেখানেই চেকটা তাঁর হাতে দেওয়া হবে,—জানালেন তাঁরা।

বাইরে এসে দেখেন ফোটোগ্রাফার, টি. ভি. টিমের লোকজন সব তৈরি।

—কি ব্যাপার !—আবার ডাক্তার গুপ্তের বিস্ময়ের পালা।

ব্যাপার আর কি! ফোটো তোলা না হ'লে এতদূর এসে চেকটি দেওয়ার সার্থকতা কোথায় ?

অনুষ্ঠান শেষ হলো। চেকটি নিয়ে ডাক্তার গুপ্ত তাঁর চেম্বারে ফিরে গেলেন হয়তো এই ভাবতে ভাবতে, এই অনুষ্ঠানের টাকাটাও কি ক্যানসার সেণ্টারে দেওয়া যেত না অনুষ্ঠানটাকে অনাড়ম্বর করলে ?

ভাবনাটা দু-জন নেতার মনেও উদয় হয়েছিল। তাঁরা নবীন মালিককে একথা বলেছিলেনও। নবীন মালিক তাঁদের বুঝিয়েছিলেন এই কথা বলে—That part of the expenditure will be put down to our publicity account. আবার ইউনিয়নই টাকাটা তুলেছিল সদস্যদের কাছ থেকে, ম্যানেজমেন্টও অবশ্য কিছু দিয়েছিল।

টাকা যখন দেওয়া হবে তখন ফয়দা ওঠাতে হবে বৈকি ! তার জন্যে কিছুটা অতিরিক্ত ব্যয় হয় ত হোক না।

ঘটানাটি শুনেছিলাম ডাক্তার সরোজ গুপ্তর এবং ঐ ইউনিয়নের একজন নেতার মুখ থেকে। নেতাটি মন্তব্য করেছিলেন : পাবলিসিটি যদি নাই হলো তবে মালিকরা টাকা দেবেন কেন, আর কাজকর্ম ছেড়ে মালিক নিজেই বা হাজির হবেন কেন ? সবই give and take-এর ব্যাপার মশাই ! বুঝলেন ?

এই গিভ অ্যাণ্ড টেকের নীতিপদ্ধতি ব্যবসায়ীদের মজ্জাগত, বিশেষ করে মাড়োয়ারীদের। তাঁরা যে লিখিত ইতিহাসের সূচনা থেকেই ব্যবসা করে আসছেন।

প্রাচীনকালে ওঁরা খাতির করতেন বিভিন্ন শ্রেণীর রাজকর-সংগ্রাহককে[১], নগরপালদের, সাউকারদের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দূরবস্থিত বণিক-স্বার্থ সম্পর্কিত রাজপুরুষকেও। রাজাকে বড় একটা নয়, কারণ তার সঙ্গে বিশেষ দেখাসাক্ষাৎ হোত না।

এই রাজকর-সংগ্রাহকদের উত্তরপুরুষ হলেন ইনকাম ট্যাক্স ও কমার্শিয়াল ট্র্যাক্স এবং উৎপাদন-শুল্ক বা একসাইজ ডিউটি

১· এ ধারণা ভুল যে তখন শুধু উৎপন্ন শস্যের ওপরই কর ধার্য করা হোত। মনুসংহিতা, মহাভারত, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে তখনকার দিনে উৎপাদন-শুল্ক (excise duties) ছিল, বৃত্তি-করও (professional tax) ছিল।

দপ্তরের অফিসাররা, নগরপালদের পুলিশ কর্মচারীরা, সাউকারদের বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকাররা এবং বণিক-স্বার্থ সম্পর্কিত রাজপুরুদের সচিব ও উপসচিবরা—দ্য সেক্রেটারি অ্যান্ড অল্ দিজ।

পরশুরামের 'ভরতের ঝুমঝুমি' ছোট গল্পে সাধুবাবা ওরফে দুর্বাসা মুনি একটি বালককে 'রাজা হও' বলে আশীর্বাদ করেছিলেন। কাহিনী-কথক তার উত্তরে সাধুবাবাকে বলেছিলেন: 'ও আশীর্বাদ আর ফলবার উপায় নেই, রাজাটাজা লোপ পেয়েছে। বরং এই আশীর্বাদ করুন যেন ও মন্ত্রী হ'তে পারে। অন্তত পাঁচ বছরের জন্য।'

হ্যাঁ, মন্ত্রী-রাষ্ট্রমন্ত্রীরাই প্রাচীন কালের রাজাদের উত্তরপুরুষ, অন্তত প্রতীক হিসাবে। মাড়োয়ারীরা কিন্তু তাঁদের গা-ঘেঁসে বড় একটা চলতে চান না। কারণ, তাতে আগমনের আশার চেয়ে নির্গমনের আশঙ্কাই থাকে বেশি, তাই তাঁদের দৃষ্টিকোণ মোটামুটি সীমাবদ্ধ থাকে ঐ চার শ্রেণীর মধ্যেই—ট্যাক্স-অফিসারস্, পুলিশ অফিসারস্, ব্যাঙ্কারস্ এবং সচিব-উপসচিবদের মধ্যে। অনেক সময় অবশ্য এই সব রাজপুরুদের কাছে পেঁছিতে হয় তীর্থস্থানের মত পান্ডাদের হাত ধরে। তাঁরা ভেতরের লোক হতে পারেন, বাইরের গো-বিটুইনও হতে পারেন। সুতরাং তাঁদেরও খাতির করে চলতে হয়।

খাতির করা শুরু হয় ইংরেজী বছরের সূচনা থেকে ডায়েরি-ক্যালেন্ডার পাঠিয়ে, বড়দিন ও নববর্ষের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে। তারপর বছরের শেষ দিকে দেওয়ালির অভিনন্দন ত আছেই! এর ওপর কেউ কেউ আবার বাংলা নববর্ষ এবং/অথবা বিজয়া দশমী উপলক্ষেও শুভেচ্ছা পাঠিয়ে থাকেন, তবে বাঙালীদের কাছে মাত্র।

শুধু কার্ড-ক্যালেন্ডারে যে মন ভরে না সে-সম্বন্ধে মাড়োয়ারী-সম্প্রদায় সচেতন। তাই অনেক সময় সঙ্গে যায় বিকানীরের পাঁপড়, ফরক্কাবাদের সীম-বীজ এবং আগরবাতি।

বিকানীরের পাঁপড় হয়তো বড়বাজারেই কেনা, ফরক্কাবাদের সীম-বীজ কলকাতাতেই পাওয়া যায় এবং আগরবাতি ইস্কন, রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম ইত্যাদি অনেক জায়গাতেই তৈরি হয়।

তবুও পাঠানো হয় বিকানীরের পাঁপড় ইত্যাদি বলে। নইলে উপঢৌকনে বিশিষ্টতা রইল কোথায় ?

পরিকৌশলটা অবশ্য নতুন বা মাড়োয়ারীদের একচেটিয়া নয়। আমাদের জমিদাররাও রাজপুরুষ ও অন্যান্যদের যে পুকুরের মাছ ও বাগানের আম ভেট পাঠাতেন তা অনেক সময়ই ছিল হাটবাজার থেকে জোগাড় করা। অনুরূপভাবে জমিদার বাড়িতেও ঐ রকম ভেট যেত।

জলপথ-যাত্রা : দেওয়ালির সময় বিশেষ ভেট পাঠানো হয়, কিন্তু বেছে বেছে। তার মধ্যে বাজি-বাসন ছাড়া থাকতে পারে এবং অনেক সময় থাকেও—বোতল।

বোতল-ভেট আবার সব সময় দেওয়ালির অপেক্ষা করে না—মরশুমে বে-মরশুমে কারণে-অকারণে তা পেঁাছে যায় যথাস্থানে—যিসিসে কাম বনেগা উসিকো পাশ। এ ব্যাপারে মাড়োয়ারীদের বাছাই করার ক্ষমতা অতি সূক্ষ্ম, দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ম। এবং তাঁরা নিজেরাও বহুলাংশে ঐ জলপথের পথিক হয়ে পড়েছেন—ছেলেবুড়োর মধ্যে কোন বাছবিচার নেই।

একবার আমাদের কাঠমাণ্ডু যাওয়া ঠিক হয়েছিল—আমি, আমার ছেলে আর তার এক সমবয়সী মাড়োয়ারী বন্ধু। ছেলেটি আমারও পরিচিত—কিছুদিন আগে বিদ্যায়তনের গণ্ডি পেরিয়ে পুরোপুরি বাপের ব্যবসায়ে ঢুকেছে।

ছেলেটিই প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করেছিল। দেখলাম ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বদলে রয়্যাল নেপাল এয়ারলাইনসের টিকিট কেটেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল : Better flight, more eamnities.

অ্যামিনিটিজ যে বেশি তার পরিচয় পেলাম প্লেন ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই। নেপালী এয়ার-হোস্টেস্ এসে জিজ্ঞাসা করল : What drink…? আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোবার আগেই ছেলেটি আমার দিকে চেয়ে বলল : If you don't mind uncle, I shall have a sip…: বুঝলাম সে কি চায়, এবং না বলে পারলাম না : No objection. Go ahead.

আমি ও আমার ছেলে অবশ্য সফ্‌টই নিলাম। কয়েকটা বিষয়

কিন্তু না ভেবে পারলাম না : আমি সঙ্গে না থাকলে আমার ছেলে কি সফ্টের বদলে তার বন্ধুর মত স্পিরিটের দিকেই ঝুঁকত? আমার বদলে ঐ মাড়োয়ারী ছেলেটির বাবা যদি সঙ্গে থাকতেন তবে আমার ছেলে কি করত—সে কি বলতে পারত : If you don't mind, uncle...? নেপাল এয়ারলাইনসের অ্যামিনিটিজের তালিকা কি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ? না, আর কোন অ্যামিনিটিজের সন্ধান সেই ফ্লাইটে পাইনি।

জলপথে যাত্রা বাঙালী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এর থেকে কীভাবে ফয়দা ওঠাতে হয় মাড়োয়ারীরা তা শুধু রপ্তই করেন নি, বলা যায় শৈলীতে পরিণত করেছেন। কোন পার্টি দিনে তাঁরা কক্‌টেইলসের কথা আগে ভাবেন। নইলে চা-কফি-স্ন্যাকস্‌-এর আকর্ষণে আকাঙ্ক্ষিত নিমন্ত্রিতদের অধিকাংশই আসবেন না—বেশির ভাগই যে 'regrets his inability' জানিয়ে দেবেন, তা তাঁরা ভালভাবেই জানেন।

একবার এক অতি রক্ষণশীল পরিবারের একজনের কাছ থেকে কক্‌টেইলসের নিমন্ত্রণ পেয়ে একটু আশ্চর্যই হয়েছিলাম। পরে নিমন্ত্রণকারীই ব্যাখ্যা করেছিলেন : Fifty per cent of the invitees would have declined if drinks were not promised. And you Bengalees mostly, sir.—খুবই খাঁটি কথা।

আর একবার এক বৃহৎ মাড়োয়ারী শিল্প-ভবনের পক্ষ থেকে গ্রান্ড হোটেলে ডাকা এক সাংবাদিক সম্মেলনে গিয়েছিলাম। নিমন্ত্রণপত্রের বিপরীত দিকে অনুষ্ঠান-সূচীর সর্বশেষ বিষয়টি ছিল কক্‌টেইলস্‌। ব্যস—একেবারে বাজিমাৎ!

বর্ধমান স্যুইটে সম্মেলন শেষ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা : ...Please move to the Viceroy's suite. Arrangements are there. সবাই সেদিকে পদক্ষেপ করলেন, আর আমি জলপথ যাত্রা-বিমুখ বলে কিছুটা দাঁড়ানর পর পা বাড়ালাম নিষ্ক্রমণ-দ্বারের উদ্দেশে। আমার গতি অনুধাবন করেই বোধহয় কর্তাব্যক্তিদের একজন আমার দিকে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন :

Ye not going to the Viceroy's suite ? উত্তর দিলাম : না, ও আমার চলে না। সুতরাং গিয়ে আর কি করব ?—But snacks are there—সংবাদ পরিবেশন করলেন কর্তাব্যক্তিটি।

স্ন্যাকসের আকর্ষণেই গেলাম ভাইসরয় স্যুইটে। সেখানে খেতে খেতে আর এক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমি মন্তব্য করেছিলাম মনে আছে : Your House, too, has arranged for cocktails !

—Yes. Otherwise, few would have shown up. The house's full, you see.

তা বটে ! দেশী-বিদেশী, কলকাতার এবং কলকাতার বাইরের সব সংবাদপত্রেরই রিপোর্টার এসেছেন দেখলাম। পরের দিন প্রতিবেদনও ভাল বেরুল। দ্রব্যগুণের মাহাত্ম্য সন্দেহ নেই !

দৈবী ও আধিদৈবিক : দ্রব্যগুণ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ কার্যকর সে সম্বন্ধে মাড়োয়ারী সম্প্রদায় সম্পূর্ণ সচেতন। অবশ্য যেখানে পুরোপুরি কার্যকর নয় সেখানে ওঁরা আশ্রয় গ্রহণ করেন দৈবীশক্তির, এবং আধিদৈবিকেরও। ঈশ্বর (এবং অপদেবতা) যে মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল !···

কালিঘাটে গিয়েছিলাম পুজো দিতে। মন্দিরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় দেখি দু'জন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদেরই নারাণদা—শ্রীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অ্যাণ্ড ইনকাম ট্যাক্স প্রাক্‌টিসনার—বেরিয়ে আসছেন। স্যুটেড-বুটেড্ নারাণদার গলায় জবাফুলের মালা, কপালেও সিঁদুরের লম্বা রেখা —এবং ভদ্রলোক দু'জন দু'পাশে, যেন দেবতাকে উৎসর্গ করার জন্যে কোন অহিংস্র জীবকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

না, বধ্যভূমিতে নয়, পার্ক-করা গাড়ির দিকেই তাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন দেখলাম। তারপর তিনজনেই গাড়িতে উঠলেন। নারাণদা তখন নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে পাননি।

কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে পেয়েছিলেন—লোয়ার রডন স্ট্রীটে ইনকাম ট্যাক্স ট্রাইব্যুনালের অফিসের সামনে। তখনও নারাণদার সেই বলিদান-সজ্জা, আর দু'পাশে সেই দু'জন ভদ্রলোক। মন্দির থেকে তাঁরা যে সঙ্গে সঙ্গেই আছেন তা অনুমান করা বিশেষ

কঠিন ছিল না। মধ্যে বোধহয় তিনজনই খাতাপত্র দেখতে ও নিতে অফিস গিয়েছিলেন। দু'ঘণ্টার ফারাক যে!

আমি হেঁটেই যাচ্ছিলাম। ওঁরাও হেঁটে গলিতে[১] ঢুকেছিলেন —বোধহয় গাড়ি ওঁদের লোয়ার সার্কুলার রোড ও লোয়ার রডন স্ট্রীটের সংযোগস্থলে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

—কি নারাণদা, কি ব্যাপার?

আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমতা আমতা করে নারাণদা বললেন: এই ট্রাইব্যুনালে একটা কেস আছে কিনা।—তারপর গলার মালাটা খুলে এক পাশের ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে নারাণদা ট্রাইব্যুন্যালের বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লেন। ভদ্রলোক দু'জনও তাঁর অনুগামী হ'লেন।

কয়েক দিন পরে নারাণদার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঐ দিন তাঁরা কালিঘাটে গিয়েছিলেন কেন?

নারাণদা সোজাসুজিই জবাব দিয়েছিলেন: একটা বড় কেস ছিল কিনা। তাই ক্ল্যায়েনট্‌রা ধরলেন, মা কালীর পুজো দিয়ে তবেই ট্র্যাইব্যুনালে যাওয়া ভাল।

কিন্তু তিনি বধ্যপশু সেজেছিলেন কেন, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিনি। তবে সেটাও যে মক্কেলের নির্দেশে তাও অনুমান করতে মোটেই অসুবিধা হয় নি। এই রকম নির্দেশ (অনুরোধ?) মেনে নেওয়াই ভাল। না মানলে মক্কেলই দরজা বন্ধ করে দেবে।

এ-ব্যাপারে বোধহয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে একটা সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের সহরতলীর এক জমিদার-গৃহে বড় মামলার প্রেমটারী হিয়ারিং-এর দিনে সকালে ঘটা করে সত্যনারায়ণ দেওয়া হোত, আর উকীলবাবুদের সেই সিন্নি খেয়ে আদালত যেতে হোত। জবাফুলের মালা অবশ্য পারতে হোত না।

মাঝে মাঝে এই রকম কম্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও ঘটতে দেখা যায়।—

এক প্রথম শ্রেণীর আর্কিটেক্‌ট এসেছেন এক প্রথম সারির শিল্পপতির বাড়ি। বাড়িটার বেশ কিছুটা রদবদল হবে।

---

১. নামে স্ট্রীট হলেও লোয়ার রডন স্ট্রীট একটা অন্ধ গলি ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে খানিকটা চওড়া।

পোর্টিকোয় গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে প্রবেশের মুখেই আর্কিটেক্ট সাহেব বাধা পেলেন দ্বারোয়ান-কাম-টেলিফোন-অপারেটরের কাছ থেকে : জুতি খুলিয়ে সাহাব।

—কেঁও,—Why ?—আর্কিটেক্ট সাহেব জিজ্ঞাসা না করে পারেন না।

উত্তর আসে : এহি কোঠিকা এইসি দস্তুর।

বলতে বলতে মালিকদের একজন এসে হাজির। ব্যাপারটা শুনে নিয়ে তিনিও আর্কিটেক্ট সাহেবকে অনুরোধ করেন জুতো খুলতে।

—But why ?—আর্কিটেক্ট সাহেবের স্বর একটু চড়া। ঐ মালিকের কিন্তু আরও চড়া, বলেন : Slmply because this is the practice of our household.

—তা হলে ত' আমাকে দিয়ে আপনাদের কাজ চলবে না,—স্থপতি মহাশয় জানান।

এবার মালিক একটু ঘাবড়ে যান। কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই আর্কিটেক্ট সাহেব তাঁর অপারগতার কারণ ব্যাখ্যা করতে সুরু করেন : এখন আপনারা বলছেন, জুতো খোল। ভেতরে গিয়ে হয়তো বলবেন, জামা খোল, ট্রাউজারস্ খোল—গামছা পর··· No, sir. I am sorry—I won't be able to fit myself in your scheme.

গাড়িতে উঠে আর্কিটেক্ট সাহেব চলে গেলেন, আর আমি যেন অজান্তেই নিজের খালি পায়ের দিকে তাকালাম,—উক্তি করেছিলেন ঘটনার বিবরণ-দাতা বাঙালী ভদ্রলোক—ঐ শিল্প-ভবনের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

খালি পায়ে বাড়ির ভেতরে ঢোকার কারণটার ব্যাখ্যা পেয়েছিলাম কলকাতায় নয়—বারাণসীর এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের—(শেঠ) আত্মারাম ঢনঢনিয়াজীর কাছ থেকে।

কলকাতার একজনের থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। যদি ঘোরাঘুরির জন্যে একখানা গাড়ি মাগ্‌নি পাওয়া যায় তার জন্যে।

চনচনিয়াজীর অফিসে ঢুকতে গিয়ে দেখি সকলেই যাতে আকর্ষিত হয় সেইভাবে ইংরেজী ও হিন্দিতে এক বিজ্ঞপ্তি সাঁটা। ইংরেজী বিজ্ঞপ্তিটা ছিল এইরকম : It is the practice of us Indians to keep one's shoes outside before entering any room.

জুতো খুলেই শেঠের অফিস-ঘরে ঢুকলাম। পরিচয়পত্রের দৌলতে খাতিরযত্ন হলো, গাড়িও পাওয়া গেল।

দরজার বাইরে এসে জুতো পরতে পরতে বিজ্ঞপ্তিটির দিকে আবার তাকালাম। তারপর ভেতরে বসা শেঠজীর দিকেও একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করলাম। বোধহয় মনের ভাব অনুমান করেই শেঠজী বললেন : আপ শোচতা হ্যায়, ইয়ে লুটিশ কেঁও। ইয়ে মেরা ধরম্ হ্যায়। বাংগালী বেওসায়িভি ইয়ে মানতা হ্যায়। মন্দিরমে আপ জুতি খুলতা নেহি ?

মনে পড়ল, সত্যিই ত—বাঙালী বণিক-সম্প্রদায় ঐ একই আচার পালন করে থাকেন। বোধহয় আচারটির উৎপত্তি স্বাস্থ্য-বিধি থেকে, এবং পরে তা ধর্মের ছাপ পায়। তবে নয়া জমানায় অন্যান্যের মত এই আচরণেরও অবলুপ্তি ঘটছে। তাই বোধহয় ইংরেজীতে বিজ্ঞপ্তি লিখে লোককে সতর্ক করে দিতে হয়।

অনেকে আবার এ-ব্যাপারে একটা মীমাংসার পথও খুঁজে বের করেছেন।

অন্য একবার আমি অভিজাত পল্লীর এক মাড়োয়ারী বাড়ির ভিজিটার্স রুমে জুতো খুলেই ঢুকেছিলাম। কিন্তু আমার অবস্থানকালীনই আর একজন দর্শনার্থী এলেন জুতো পরে। তিনি চলে যাবার পর আমি গৃহস্বামীর কাছে বিষয়টির উল্লেখই করে ফেললাম—ভদ্রলোক জুতো পরে ঢুকলেন যে !

—It's allowed *here*,—গৃহস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন,—but not in the hall or elsewhere.

পান ও ভোজন : গান্ধীজীর অন্যতম জ্ঞানগর্ভ উক্তি হলো : ভারত এক ব্যক্তি-শুচিতা কিন্তু যৌথ অপরিচ্ছন্নতার দেশ—India is a country of individual cleanliness but of corporate filth. তাঁর এই বোধোদয় ভূয়োদর্শন-প্রসূত কিনা

জানি না। কারণ, উচ্চশ্রেণীর—অর্থাৎ সাহেব মাড়োয়ারী ছাড়া আর সবাই-এর ক্ষেত্রে এর তাৎক্ষণিক পরিচয় পাওয়া যায় বাড়িতে এবং কর্মক্ষেত্রে—দু' জায়গাতেই।

মাড়োয়ারীরা সাধারণত মাঞ্জন-স্নান-মার্জন করেন অনেকক্ষণ ধরে—এই পরিষ্করণ কাজে বোধহয় সময় একটু বেশিই নেন, রোজই ধোলাই-ইস্তিরি করা পোশাক পরেন, ঘরের মেঝেতে ধুলো-ময়লা একদম থাকতে দেন না, দরজা-জানলা-গ্রিলেও ধুলো জমতে পায় না, প্রবেশদ্বারে পেতলের নেমপ্লেট থাকলে তা ঝকঝক করে, লবিতে গদি থাকলে তার চাদর সদ্য-পরিষ্কৃত বলেই মনে হবে, —কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখের দেয়াল অনেক ক্ষেত্রেই দেখবেন তাম্বুলরাগ-চর্চিত, ঘরদোর পরিষ্কার করে কুঁড়া[১] করপোরেশনের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর না করে তা সদর দরজার সামনেই ফেলা হয়—ময়লাজঞ্জাল ফেলার জায়গা একটু দূরে থাকলে সেখানে যাওয়া হয় না, ফ্ল্যাট-বাড়ি হলে তাঁর সিঁড়ি দিয়ে উঠলে গা-ঘিনঘিন না করে পারে না—সাদা দেওয়াল তাম্বুলরাগে বিশেষ শোভায় সজ্জিত।

পার্ক সার্কাসে চাঁদঘোটিয়া পদবিধারী এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটে যাবার জন্যে তাঁর সঙ্গেই সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলাম। সিঁড়িতে তিনি বার দুয়েক পিক ফেললেন—প্রত্যেক ল্যান্ডিং-এর কোণে একটা করে স্পিটন ছিল, কিন্তু তাতে নয়—দেওয়ালে। তারপর নিজের দরজার সামনে এসে আর একবার। এবার আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না—বলেই ফেললাম : এ কেয়া কিয়া? জেড়াসে রুকনে নেহি সেকা?

—মতলব? —একরকম তীব্র প্রতিবাদই করলেন চাঁদঘোটিয়াজী, —নেহি তো অন্দর গন্দি করুংগা?—এবার আমি চুপ করেই রইলাম—সত্যিই ত অন্দর নোংরা করা উচিত নয়, যা-কিছু নিষ্কাষণের—প্রক্ষেপনের কাজ বাইরেই সারা উচিত।

ফ্ল্যাটে ঢুকে চাঁদঘোটিয়াজী আধা-অনুরোধ আধা-অনুজ্ঞার সঙ্গে একটা স্থান নির্দেশ করে বললেন : জুতি উতারনেকো জাগা এহি হ্যায়।

১. জঞ্জাল—ময়লা

জুতো খুলেই ভেতরে ঢুকলাম। ভারত যে ব্যক্তি-শুচিতা কিন্তু যৌথ অপরিচ্ছন্নতার দেশ তাতে সন্দেহ নেই।

অফিসের অবস্থাও অনুরূপ। মালিক বা বাবুদের চেম্বার সুসজ্জিত—গদি সুবিন্যস্ত, কর্মীদের বসার স্থান কিন্তু নয়। পানাসক্ত বাবুদের চেয়ারের পাশে থাকে পিকদানি, কর্মীদের কিন্তু বাইরে গিয়ে পিক ফেলে আসতে হয়। একটু বড় অফিসে বাবুদের টয়লেট আলাদা হয়, পিক ফেলার জন্যে তার ওয়াসবেসিনও ব্যবহার করা চলে। পরের দিন জমাদার তা ঠিকই পরিষ্কার করবে।

অফিসে পানের ব্যবস্থা শুধু নেশার কারণে নয়, অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়নের জন্যেও বটে। খাতিরের কেউ এলে চা-কফি বা ঠাণ্ডা পানীয় অফার করা হয়, আর পানের ডিবে বাড়িয়ে দিয়ে বলা হয়, লিজিয়ে। আর অভ্যাগত পানাসক্ত না হলে বাড়িয়ে দেওয়া হয় পানের মসলা। মাড়োয়ারী হৌসে মালিকদের সিগারেট অফার করতে কখনও দেখিনি—ওঁদের বিয়েশাদি ও অনুষ্ঠানেও সিগারেটের ব্যবস্থা থাকে না। পানই হলো আপ্যায়নের প্রধান আনুষংগিক উপাদান।

অভ্যাগতদের মর্যাদা এবং নিজের প্রয়োজনীয়তার প্রকৃতি অনুসারে অভ্যাগতদের জন্যে ভোজনের ব্যবস্থাও মাঝে মাঝে করা হয়—রেস্তোরাঁয় বা ক্লাবে। হৃদয়ের অন্তস্থলে পৌঁছুবার পাকা সড়ক যে উদরের মধ্যে দিয়ে, ব্যবসায়ীরা—মাড়োয়ারীরা তা ভালভাবেই জানেন।

সাধারণত মাড়োয়ারীরা নিরামিষাশী, ওঁদের মধ্যে জৈনরা ত বটেই। এই 'সাধারণত' সত্য হিসেবে বজায় থাকলেও 'বটেই' আর থাকতে পারছে না। উপরন্তু, অভ্যাগতদের মধ্যে যাঁরা আমিষাশী তাঁদের নিরামিষ ভোজনে আহ্বান করলে খাতির ঠিক জমে না।

রেস্তোরাঁ বা ক্লাবে আমিষাশীর সঙ্গে একই টেবিলে বসতে মাড়োয়ারীদের মোটেই আপত্তি নেই—বর্ব[১] না মারলেই হোল। ছুৎমার্গ থেকে ওঁরা দূরেই থাকেন।

একবার পার্ক স্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁয় দু-তিনটি মাড়োয়ারী

১. উগ্রগন্ধ

ছেলের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে গিয়েছিলাম—তাদের পাশ করার আনন্দ-ভোজে। ছেলেদের মধ্যে দলপতি গোছেরটি আমাকে মেন্যু-কার্ড ধরিয়ে দিয়ে বলল: Sir, you please choose your own items.—কার্ডে চোখ বোলাচ্ছি এমন সময় ছেলেটি আবার বলল: Please don't choose any fish item, sir—বহুৎ বর্ব্ মারতা হ্যায়।

নয়া দিল্লীর ওবেরয় ইন্টার-কন্টিনেন্টাল হোটেলে কলকাতার এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে বিকেলবেলা দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন তাঁর স্যুইটে অন্য একজন ভদ্রলোকও এসেছিলেন। সেই ভদ্রলোকে তাঁর সান্ধ্য নাশতা সারছিলেন। তা থেকে এবং নাশতার পরিমাণ ও প্রকৃতি থেকে বুঝতে দেরি হয়নি যে তিনি খুব খাতিরের লোক।

আমাকে তাঁর শোবার ঘরে বসতে বলে অতিথি-আপ্যায়ক যেন আগের রেশ ধরেই অতিথির কাছে নাশতার গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে চললেন: I didn't order fish for you. That doesn't suit our system. But prawn is there. You will like it, I trust.

মধ্যের দরজা খোলা থাকায় সবই আমার কানে আসছিল। ভাবলাম, জীববিজ্ঞানে চিংড়িমাছ মাছ-প্রজাতিভুক্ত নয় বলেই কি পাংক্তেয়, আর আর সব মাছ অপাংক্তেয়? আর 'doesn't suit our system'—তারই বা মানে কি? ও'রা নিজেরা খান না, না পরিবেশন করেন না? দরকার হলে মাছ পরিবেশন যে করেন তা আমি জানি—ঘরে না হলে বাইরে—হোটেলে ক্লাবে। একটু বর্ব্ মারে ত মারুক না! যাঁরা কখনই জলপথের যাত্রী নন, উগ্র পানীয় কি তাঁদের কাছে বর্ব্ মারে না? ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে মানুষ আমি নিজেই ত কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ সহ্য করতে পারি না। মোটকথা, ব্যাপারটা হলো একটা মীমাংসার যাতে, মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের জুড়ি পাওয়া ভার, বিশেষ ক'রে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমুদয়কে খাতির করার বেলায়। আমি নিজে দেখেছি একজন (হিন্দুদের) নিষিদ্ধ মাংস তৃপ্তি সহকারে আহার করছেন, আর তার পাশেই নিরামিষ আহারে লিপ্ত মাড়োয়ারী ভদ্রলোক।

মৌড্যাস অপ্যারান্ডাই—(১) বুকস্-উকস্ : বুকস্-উকস্ নিশ্চয়ই ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং অনুপ্রাসের গোষ্ঠীভুক্ত। শব্দযুগল কিন্তু দেশী নয়, আবার বিদেশীও নয়—কোন ভাষার অভিধানেই (বোধহয়) ওদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় হিন্দি-ভাষাভাষী ব্যবসায়ী মহলে, বিশেষ করে মাড়োয়ারীদের গদিতে। অনেক সময় এদের যথাক্রমে এক-নম্বরি ও দো-নম্বরি খাতা বলেও উল্লেখ করা হয়।

এইভাবে উল্লেখ করাটা নিশ্চয়ই ভুল। কারণ, উকস্‌ই আসল এবং বুকস্ হলো নকল—দো-নম্বরি খাতাপত্র বা ব্যালান্স-সীট, যা ইনকাম স্টেটমেন্ট্, ইনকাম ট্যাক্স, সেলস্ ট্যাক্স, একসাইজ ডিউটি ইত্যাদির জন্য তৈরি করা হয়। ভাষা ও পদ্ধতি দেশী হতে পারে, বিদেশীও হতে পারে—তবে বিপুলাকার হওয়া চাই, যাতে প্রথম দর্শনেই কর-সংগ্রাহকের মাথা ঘুরে যায়।

এই রকম মাথাঘোরার কথাই বলেছিলেন মিহির সেন মহাশয়।

মিহির সেন হলেন ইনকাম ট্যাক্সের একজন অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসিস্-ট্যান্ট কমিশনার।[১] পদোন্নতির আগে অবশ্যই তিনি আই. টি. ও. ছিলেন। সেই আই. টি. ও. থাকার সময়েরই কথা, এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাঁর নিজের ভাষায় :—

—স্যালারি ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমায় বদলি করা হলো কমার্শিয়াল ডিস্ট্রিক্ট-এ, বোধহয় আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে। কিন্তু বড় বড় বিজনেস হাউস আমার এলাকার বাইরে রাখা হলো, মাঝারিদের ভার দেওয়া হলো আমাকে—বোধহয় কিছুটা অনভিজ্ঞ বলে।

—দু'দিন পরেই ছিল এক মাড়োয়ারী ফার্মের কেস। সময় মতই হাজির হলেন এক ব্যক্তি—তিনিও মাড়োয়ারী, বয়সে বৃদ্ধ। ঢুকেই—'রাম রাম' করে বললেন : মেরা ভাকালতনামা হ্যায়। আপনার আগের আই. টি. ও. সাহাব আমাকে আচ্ছা তরে জানতেন।...

—তাঁর পরিচয়প্রদান শেষ হতে না-হতেই সুইং ডোর ঠেলে

১. সাহিত্য-সাধক সংসদের প্রতিষ্ঠাতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক প্রয়াত রমেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র।

ঘরে ঢুকল দু-জন ঝাঁকামুটে—প্রত্যেকের ঝাঁকায় একরাশ করে খেরো খাতা।

—মুটে দু-জন তাদের ঝাঁকা মেঝেতে নামাল, এবং তা থেকে কয়েকখানা করে খাতা নিয়ে ওকালতনামা-প্রাপ্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার টেবিলে সাজাতে লাগলেন।

সেন মহাশয়ের বিস্ময়ের ঘোর আর কাটতে চায় না—বেশ খানিকটা সময় তাঁর বাক্যস্ফূর্তি ঘটল না।

অনেকক্ষণ পরে তিনি কোনক্রমে জিজ্ঞাসা করতে সমর্থ হলেন : What are these··· ?

খাতা সাজাতে সাজাতেই ওকালতনামা-প্রাপ্ত বৃদ্ধ সংক্ষেপে জবাব দিলেন : বুকস্, সাহাব—দেখ লিজিয়ে।

এত খাতা দেখতে হবে ! মিহির সেন মহাশয়ের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। টেবিলের ওপর রাখা গ্লাস থেকে তিনি খানিকটা জল পান করলেন। আচ্ছন্নভাবে শুনলেন, সেই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করছেন : আওর সব বুকস্ কাঁহা রাখুঙ্গা ? আপকা টেবুল পর আওর জাগা হ্যায় নেহি।

সত্যিই ত' টেবিল ভরে উঠেছে কিন্তু অর্দ্ধেক খাতারও স্হান সংকুলন হয় নি। সেন মহাশয় ইংরেজী-হিন্দি মিশিয়ে বললেন : Wait—ঠারিয়ে।

ভদ্রলোককে থামিয়ে সেনমশায় একখানা খাতা খুললেন। এবার আর ঝিমঝিম নয়, মাথা পুরোপুরি ঘোরারই পালা—সব মাউড়ী বা মাড়োয়ারী ভাষায় লেখা। এ ভাষা তাঁকে শিখতে হয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই জ্ঞান এর পাঠোদ্ধারের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

সেন মহাশয়ের হঠাৎ বোধোদয় হলো। উঠে গেলেন পাশের ঘরে এক পোক্ত আই. টি. ও.-র কাছে। পোক্ত অফিসার পাকা পরামর্শই দিলেন : দেখবেন বলে খাতাগুলো রেখে দিন। আর একটা ডেট দিন···সেইদিনই ফাইল খুলবেন। এধার-ওধার একটু-আধটু দেখবেন···জিজ্ঞাসা করবেন 'উকস্' আছে কিনা···নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে। তখন আরও দু'একটা প্রশ্ন করবেন···দু-একটা অ্যাড-ব্যাক করে অ্যাসেস করে দেবেন। মোদ্দা দু-তিন দিন ঘোরাবেন।

কিছুই বিশেষ করতে পারবেন না। তবে করার ভান করবেন।

পোক্ত অফিসারকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের চেম্বারে ঢোকার সময়ই মিহির সেন মশায় অনুভব করলেন, মাথা আর ঘুরছে না—এমনকি ঝিমঝিমও করছে না।

(২) উল্‌টা-ফুল্‌টা : উল্‌টা-ফুল্‌টা হলো বুকস্‌-উকসের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত। অর্থাৎ উল্‌টা-ফুল্‌টা করার জন্যেই বুক্‌স-উক্‌সের—বা আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে, উক্‌স থেকে পার্থক্য করে বুক্‌স-এর—ব্যবস্থা করতে হয়। বাংলা উলটো-পালটার হিন্দি (না মাড়োয়ারী ?) প্রতিশব্দ যুগলের অর্থ হলো গোলমেলে বা দু-নম্বরি কাজ, যা বিশেষ করে আজকের দিনে ব্যবসার অংগীভূত—ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। অর্থনীতির ব্যাখ্যা অনুসারে আসল মুনাফার উদ্ভব ঘটে এই ঝুঁকি ও অনিশ্চতারই দরুন।

অর্থনীতিতে আরও বলে যে প্রত্যেক আয় বা উপার্জন (প্রাপ্তি নয়) সম্ভব হয় উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ থেকে, এবং উপার্জন হলো চার রকমের : মজুরি খাজনা সুদ ও নাফা। এই নাফা থেকে অন্য তিন রকমের আয় ভিন্ন প্রভৃতির। যেমন, নাফা চুক্তিভিত্তিক নয়, উদ্বৃত্তাংশ বলেই পরিগণিত—অন্য সবাই-এর পাওনা এবং সরকারের দাবি বা কর মিটিয়ে যদি কিছু বাঁচে তবে তাই নাফা। আর না বাঁচলে নাফা শূন্য। ঋণাত্মকও হতে পারে। এখানেই রয়েছে ব্যবসার ঝুঁকি (ও অনিশ্চয়তা) যা হলো নাফার সূত্র। আর অন্য সবাই-এর পাওনা কতটা কম মেটানো যায় তাই নির্ধারণ করে ব্যবসায়ীর দক্ষতা ও তাঁর নাফার পরিমাণ। এই 'অন্য সবাই-এর' মধ্যে আছে সরকার, যা তার পাওনা আদায় করে করের মাধ্যমে।

সুতরাং কর যত কম দেওয়া যাবে নাফার পরিমাণ ততই বাড়বে। অনুরূপভাবে মজুরি সুদ ইত্যাদি খাতে বোঝা যতটা হালকা করা সম্ভব হবে নাফার পরিমাণও ততটা স্ফীত হবে। এই দ্বৈত কাজ *সম্পাদনই হলো উল্‌টা-ফুল্‌টা করা।* এই উল্‌টা-ফুল্‌টার জন্যে প্রয়োজন হয় বুক্‌স-উক্‌স ফরমুলার।...

শ্রীপৎ ডালমিয়াজীর চা-বাগান ভাল চলছিল না, লোকসানই হচ্ছিল বোধহয়। না হলে বাগিচা বিক্রি করে দেবার কথা তিনি ভাববেন কেন ? চা-এর বাজার ভাল কিন্তু পরপর তিন বছর ধরে প্লাকিং—অর্থাৎ চা-পাতা তোলা বেশ কিছুটা কমই হচ্ছিল। ফলে বিক্রির জন্যে তৈরী চা-এ ঘাটতি পড়ছিল দু-তিন লাখ কিলোগ্রাম করে। ২৫ টাকা করে গড়ে দাম ধরলে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০-৭৫ লাখ টাকা। অবশ্য ডালমিয়াজীর আয়ের অন্যান্য সূত্রও আছে। কিন্তু ঐ চা-বাগিচাই প্রধান—অনেক অ্যাসেট ঘুচিয়ে, সব জায়গার টাকা জড়ো করে তিনি ঐ বাগিচা কিনেছিলেন। তখন চা-এর বাজার আগুন। ভুল করেছিলেন ঐখানেই। কারণ, বাগিচাও কিনতে হয়েছিল আগুন দামে। নাফা হোত চা-এর দাম ঠিকমত থাকলে। কিন্তু দাম একটা পর্যায়ে পেঁছে স্থিতাবস্থায় রয়ে গেল। ফলে ডালমিয়াজী পড়লেন ফাঁপরে—সুদ পুঞ্জীভূত হয়ে ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ দিন দিন স্ফীত হতে লাগল।

বাগিচা থেকে অর্থাগম না হওয়ায় সংসারের আগের সচ্ছলতা আর রইল না, বাগান ও কলকাতার অফিসের সঙ্গে বাড়িতেও ব্যয়-সংকোচনের ব্যবস্থা করতে হলো।

শ্রীপৎজীর এক ভাই-এর চিনির কল। আর এক ভাই-এর তৈরী পোশাক রপ্তানির কারবার। দু-জনেরই বর্ষাৎকা মাফিক রুপেয়া আনা সুরু করল। এতদিন পর্যন্ত সমৃদ্ধিতে শ্রীপৎজী ছিলেন ভাই-দের মধ্যে প্রথম, দু-তিন বছরেই হয়ে গেলেন তৃতীয়। বাগিচা বিক্রি করে অন্য কোন ব্যবসায়ে নামবেন কি না, তাই হয়ে দাঁড়াল শ্রীপৎজীর সমস্যা। পড়তি দামের সময় বিক্রি করাও নুক্সান।

এমন সময় চা-এর দাম হঠাৎ আবার ঊর্ধ্বমুখী হতে সুরু করল—তিন মাসে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি, পাঁচ মাসে প্রায় দ্বিগুন। আর শ্রীপৎজীকে পায় কে ?

এই নিয়েই আলাপ হচ্ছিল শ্রীপৎজীর ছোট ভাই চিনি-কারখানার মালিক মহাবীরজীর সঙ্গে, তাঁরই অফিস-চেম্বারে। আমার পাশে ছিলেন আর একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। তাঁকেও চিনতাম—চিনির দালালদের একজন।

মহাবীরজী মন্তব্য করলেন : আভি ভেইয়াকো সব ঠিক হো যায়গা···আরামসে রহেংগে।···

—কিন্তু ব্যাঙ্কের কাছে দেনা শোধ করার পর ত'!—আমি টিপ্পনী না কেটে পারলাম না।

—You seem to know very little, sir.—ভাষার মারপ্যাঁচ করে আমার বক্তব্য উড়িয়ে দিলেন শ্রীমহাবীর ডালমিয়া,—the production of the garden is 22-25 lakh kgs.—twenty to twentyfive per cent উল্‌টা-ফুল্‌টা করনেসেই কাম চলা যায়গা। উ কোই ভয়ঙ্কর কাম নেহি।

কেন কাজটা বিশেষ কঠিন নয় তার ব্যাখ্যা পেতেও দেরি হলো না : Suppose, he decides to sell only three-forths through auction.

মহাবীরজীকে আর বলতে হলো না—এক মুহূর্তে বুঝে গেলাম। ব্যাপারটা হলো এই রকম :

ডালমিয়াজীর চা-বাগান উত্তরবঙ্গে—সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনানুসারে চা নিলামের মাধ্যমে না বেচলে সেস দিতে হবে—বিপরীত দিক দিয়ে নিলামের মাধ্যমে বেচলে সেস মকুব।

কিন্তু নিলামের মাধ্যমে বেচলে সব টাকাটাই বুক্‌স-এ দেখাতে হবে এবং দিতে হবে সবটার ওপরই ট্যাক্স। ট্যাক্স দেওয়ার পরও যদি কিছু থাকে তা শেয়ার-হোল্ডারদের মধ্যে বাঁটতে হবে। কারণ, ব্যবসাটি যৌথ এবং ফলে মালিকানা যৌথভাবে শেয়ার-হোল্ডারদের।[১] আরও আছে। নাফা বেশি হলে আয়ব্যয়ের হিসাবে তা দেখাতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে লেবার ইউনিয়নগুলো দাবি তোলে বেশি বোনাসের, ঘরবাড়ি র‍্যাশন সংক্রান্ত আরও সুবিধার। সুতরাং মালিকদের চিনির বলদের কাজই করতে হয়।

অপরদিকে ফ্রি সেল করতে পারলে উল্‌টা-ফুল্‌টা করার সব সুযোগই পাওয়া যায়—সবাইকে অন্তত আংশিক কাঁচকলা দেখিয়ে পাকা ফলারের বেশির ভাগটা নিজের পাতে পড়ার ব্যবস্থা করা যায়।

১. কোম্পানী আইনে যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় 'কোম্পানী', আর অংশীদারী কারবার অভিহিত হয় ফার্ম বলে।

দামের মধ্যে সেস ঢোকায় দাম হয়তো কিছুটা বাড়ে। কিন্তু তাতে নুকসান দুসরেকা, মেরা নেহি। আর উঠতি দামের সময় এ লোকসান লোকে খুব একটা বুঝতেই পারে না। প্রাপকরাও কিছুটা বেশি পেয়ে খুশি থাকে, ন্যায্য পাওনা পাওয়া গেল কিনা তার হিসাবই করে না। অতএব, উঠতি বাজারই উল্টা-ফুল্টা করবার সুযোগ এনে দেয়। এবং সে সুযোগ শ্রীপৎ ডালমিয়াজীর সামনে এসে গেছে।

—পারচেজসে ভি কুছ পরবস্তি[১] হো যায়গা,—ফোড়ন কাটলেন পাশে-বসা চিনির দালাল ভদ্রলোক।

সে ব্যাপারটাও সত্যি। শীতের মরশুম আসছে। হাজারের মত শ্রমিকদের প্রত্যেককে একখানা করে কম্বল দিতে হবে। তেজী বাজারে এবার নিশ্চয়ই একটু ভাল কম্বল। দামে যদি ৫ টাকাও উল্টা-ফুল্টা করা যায় তবে সোজা ৫০ হাজার টাকা। কিছুটা অবশ্য বিশ্বস্ত পারচেজ অফিসার ও তার অ্যাসিস্ট্যানটকে দিতে হবে। তা হলেও ত বেশ কিছুটা থাকবে। তারপর আছে কয়লা, র‍্যাশন, লেবার কোয়ার্টার মেরামতি—এসব ক্ষেত্রেও উঠতি দাম কামাই-এর সুযোগ এনে দেবে না কী ?[২]

—লেকিন চিনিমে এতনা মজা হ্যায় নেহি, —বোধহয় স্তাবকতা করেই মন্তব্য করলেন চিনির দালাল ভদ্রলোক।

—হ্যায়, —প্রতিবাদ করলেন স্পষ্টবক্তা শ্রীমহাবীর ডালমিয়া, —সবমেই হ্যায়। লেকিন আঁখ খুলা রাখনা পড়তা হ্যায়। চিনিমে কয়সাল নাফা হুয়া নেহি ?

হ্যাঁ, চিনিতে ক-বছর ধরেই চলছে তেজী বাজার—অধিকাংশ সময়ই উঠতি দাম, ফলে অধিকাংশ সময়ই এসেছে উল্টা-ফুল্টা করবার সুযোগ।

সুযোগের উপস্থিতি অনেকাংশেই সরকারী নীতির দরুন। সরকারী নীতি হলো উৎপাদনের একটা অংশ র‍্যাশন ইত্যাদির জন্যে লেভির মাধ্যমে নেওয়া, বাকিটা ফ্রি সেলের জন্যে—অর্থাৎ

১. কামাই—ভরণপোষণ
২. চা-বাগানে শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয় এবং সস্তায় জ্বালানি সহ র‍্যাশান দিতে হয়।

খোলা বাজারে যে দামে পারা যায় তাতে বেচবার জন্যে। এবং এই ফ্রি সেলের ক্ষেত্রেই আছে উল্‌টা-ফুল্‌টা করার সুযোগ। যে দামে বাজারে বেচা হয় সেই দামই কি বুক্‌স-এ ওঠে? বোরাতে ১০ টাকার ফারাক একদিনেই এনে দিতে পারে কয়েক হাজার টাকা, এবং মাসে কয়েক লাখ টাকা।

দালালরাও বাদ পড়েন না। এক দিনে একশ' বোরার মধ্যস্থ করতে পারলে একদিনেই হাজার টাকা আয় করা সম্ভব। এবং এই আয় আয়করের জালে ধরা পড়ে না।

—আপ থোড়া কুছ রুপেয়া কামায়া নেহি ইয়ে কয় মাস?—দালাল ভদ্রলোকের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন চিনিকলের মালিক শ্রীমহাবীরপ্রসাদ ডালমিয়া।

—শাক-রোটী ত জরুর মিলা,—জবাব দিয়েছিলেন দালাল ভদ্রলোক, —লেকিন নাফা নেহি।

এখানে নাফা হলো প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে অতিরিক্ত-উপার্জন। তার জন্যে দরকার হলো উল্‌টা-ফুল্‌টা করা, যে সুযোগ দালাল-শ্রেণীর বিশেষ নেই। ও'দের বড় একটা বুক্‌স রাখতে হয় না এবং ফলে উক্‌স রাখারও প্রয়োজন নেই। উল্‌টা-ফুল্‌টা করা, বুক্‌স ও উকসের মধ্যে পার্থক্য করাও হলো ব্যবসায়—বিজনিস। দালালরা ত আর বিজ্‌নিস্‌মেন নন, পেশাদার মাত্র।

দালাল ভদ্রলোক হঠাৎ সংবাদ পরিবেশন করলেন: তিনি শুনেছেন সরকার নাকি চিনির দাম বে'ধে দেবার সিদ্‌ধান্ত্‌ নিয়েছে —কোই মিল সাড়ে আট টাকার বেশি দামে বেচতে পারবে না। ছাপাতে[১] নাকি সংবাদটি বেরিয়েছে। —তারপর জিজ্ঞাসা করলেন মিল-মালিক মহাবীরজীকে: আপ কুছ শুনা? মহাবীরজী জানালেন, তিনিও শুনেছেন—ছাপাতেও পড়েছেন—লেকিন উসমে আচ্ছাই হোগা।

কিভাবে আচ্ছা হবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণও শুনলাম: তখন বুক্‌সমে সারকারি দামই লিখা হোবে, আর বেচা হবে যেইস্যা মউকা মিলেগা তেইস্যা—আই. টি. ও. কোন তং করতে পারবে না।

অতএব, বিজ্‌নিস্‌ ঠিকই চলবে—হয়তো আর একটু ভাল

১. সংবাদপত্রে

চলবে, তবে কর্মপদ্ধতির কিছুটা প্রকারভেদ করতে হবে—এই মাত্র। অর্থনীতি অনুসারে ব্যবসায়ীর কাজই ত তাই।

হঠাৎ দালাল ভদ্রলোককেই বলে ফেলেছিলাম, মেরা কুছ চিনি চাইয়ে···।

—কেতনা ?—স্বভাবতই প্রশ্ন করেছিলেন ভদ্রলোক।

—দশ-পনের কেজি—আউর কেতনা ?

—নেহি, এক বোরা ভেজ দুংগা।

এক বোরা মানে একশ' কেজি! অত চিনি নিয়ে কি করব!

—কেঁও ? —ভদ্রলোক সমাধানের নির্দেশ দিলেন,—সব পড়োশী মিলকে বাঁট লিজিয়েগা।

সমাধানটি মনঃপূত না হওয়াতে জানালাম, এখন থাক। পরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব।

যোগাযোগ করবার আর সুযোগ পেলাম না। সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই একটি ছেলে ট্যাক্সি করে এক বোরা চিনি নিয়ে এসে হাজির। বলল, কেডিয়াজীনে ভেজা।

কি আর করি? রাস্তা থেকে দু-জন রিক্সাওয়ালাকে ডেকে বোরাখানা ঘরে তুললাম। দাম জিজ্ঞাসা করাতে ছেলেটি বলল, সে কিছুই জানে না—জানেন কেডিয়াজী। ধরে নিলাম বাজার-দামের চেয়ে কিছু কমই হবে।

গৃহিণীর মনোভাব দেখলাম হর্ষ-বিষাদ মেশানো—ইংরেজীতে যাকে বলে ambivalence. হর্ষ এইজন্য যে সস্তায় প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনি পাওয়া গেল এবং বিরক্তির কারণ হলো বণ্টনের দায়িত্বভার।

কিন্তু দাম না জেনে বণ্টন-ব্যবস্থা করি কি করে? লোককে ত বলার সঙ্গে সঙ্গে দামও জানাতে হবে। তিন দিনেও দালাল ভদ্রলোকের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করতে পারলাম না। ফলে বাজার-দাম থেকে কিছুটা কমেই চিনি বেচে দিলাম। ভাবলাম, দাম যদি আরও কম হয় তবে প্রত্যেককেই হিসাবমত টাকা ফেরত দেব।

তা আর দিতে হলো না। পঞ্চম দিনে সেই ছেলেটিই এল ফর্দের মত লম্বা কাগজে একটা বিল নিয়ে। দেখলাম বাজার-দামের সঙ্গে কোন ফারাক নেই—আমার অনুমিত দামের চেয়ে কেজি পিছু এক টাকা বেশি। তার ওপর ধরা হয়েছে পোস্তা থেকে

ট্যাক্সি-ভাড়া ২৪ টাকা এবং (পোস্তায়) ট্যাক্সিতে তোলবার জন্যে মুঠে-ভাড়া ৪ টাকা।

ছেলেটির কাছে পরোক্ষ প্রতিবাদই করলাম। সে বলল, সে কিছুই জানে না, লেকিন কেডিয়াজী পুরো টাকাটাই নিয়ে যেতে বলেছেন।

অগত্যা পুরো টাকাটাই মিটিয়ে দিলাম বেশ কিছুটা গচ্চা দিয়ে। কিন্তু একটা ভূয়োদর্শনমূলক নীতিশিক্ষা ত হলো : Profession of professionals is professionalism.

এই আপ্তবাক্যের সমর্থন অন্যত্রও পেয়েছিলাম।

একবার এক সলিসিটারের কাছে কয়েকজন পড়শীকে নিয়ে গিয়েছিলাম—বলা যায় বাহাদুরি করেই গিয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাই ছিল—দুই পরিবারের মধ্যে যাতায়াতও ছিল।

আমি যে বহুতল বাড়িতে ফ্ল্যাট নিয়েছিলাম তার প্রোমোটারের সঙ্গে কিছুটা মনোমালিন্য চলছিল। সে-সম্পর্কেই আইনগত পরামর্শ নিতে গিয়েছিলাম অন্য ক'জন ফ্ল্যাট-মালিকের সঙ্গে দল বেঁধে। সেই অন্য ক'জনের সবাই ছিলেন মাড়োয়ারী।

আমি তাঁদের এবং অন্যান্যদের আশ্বাস দিয়েছিলাম,—ফী-টি কিছুই লাগবে না—আমার অন্তরঙ্গ লোক।

সলিসিটার সাহেব পরামর্শ দিলেন মিনিট দশ-পনের। পথ-নির্দেশিকা পেয়ে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে এসে সকলের সামনে একটু আত্মম্ভরিতাই প্রকাশ করে ফেললাম : দেখলেন ত', ফী লাগল না!

দলের একজন মন্তব্য করলেন : হাঁ, আভি ত' দেনে নেহি পড়া।

কয়েকদিন পরে সলিসিটার সাহেবের অফিস থেকে একটা বিল এল : To cost of time for consultation…। অর্থাৎ, ঠিক পরামর্শদানের জন্য বিল নয়, সলিসিটার সাহেবের সময় ব্যয় করবার জন্যে বিল—সেই 'মূল্যবান সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে' (বঙ্কিমচন্দ্র)।

এতে আমি অবাক হলেও মাড়োয়ারী ভদ্রলোকেরা হননি, তাঁরা সলিসিটার সাহেবের আচরণকে স্বাভাবিক—নাহ্য বলেই মেনে নিয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোক তাঁর পূর্ব-মন্তব্যেরই পুনরুক্তি করেছিলেন :

মুঝে বোলা না, আভি ত' দেনে নেহি পড়া ?···জহুরীর জহর চেনার মতই বৈশ্যরা পেশাদারদের ভালোভাবেই চেনেন, অবৈশ্যরা বোধহয় নন।

প্রসঙ্গত পরমুখে শোনা একটা বিবরণ মনে পড়ল।

একজন প্রখ্যাত সলিসিটার হিন্দু ধর্মশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। কয়েকখানা বইও তিনি লিখেছিলেন। তার মধ্যে নাকি ছিল 'হিন্দুধর্মে ঈশ্বরবাদ' বা ঐরকম কিছু।

সলিসিটার মহাশয় প্রতিদিন পার্কে প্রাতঃভ্রমণ করতেন। সেই সময় তাঁর ধারেকাছে কেউ ঘেঁসত না। একবার আর এক প্রাতঃভ্রমণকারী তাঁর সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলেন। উদ্দেশ্য, আলাপের মধ্যে দিয়েই বিনা ব্যয়ে কিছু আইনগত পরামর্শ নেওয়া।

খানিকক্ষণ পরে সলিসিটার সাহেব চলে গেলে পরামর্শ-প্রত্যাশী ভদ্রলোক আবার তাঁরই নির্দিষ্ট বেঞ্চের নির্দিষ্ট জায়গায় পরিচিত ভদ্রলোকদের মধ্যে এসে বসলেন। ভদ্রলোকদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন : ওঁর সঙ্গে পায়চারি করতে গিয়েছিলেন কেন ?

—না, এমনি···একটা পরামর্শ নেওয়ার ছিল।

—সর্বনাশ করেছেন,—আর একজন মন্তব্য করলেন,—নাম-ঠিকানা জেনে নেননি ত ? উনি হিন্দুধর্ম থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিয়েছেন, জানেন ? দেখুন কত বিল আসে !

ভদ্রলোককে নাম-ঠিকানা প্রকাশ করতে হয়েছিল কিনা, এবং শেষ পর্যন্ত বিলও এসেছিল কিনা জানিনা। তবে বিবরণটা শুনে বুঝেছিলাম পেশাদার-ভীতি অনেকের মধ্যেই সঞ্চারিত।

আমাদের মহাবীর ডালমিয়ার চিনি কোম্পানীরই বার্ষিক সাধারণ সভা—ইংরেজীতে সংক্ষেপে এ. জি. এম.। সভার শেষে আপ্যায়ন করা হয় এক বাক্স খাবার, ডায়েরি-ক্যালেণ্ডার এবং প্যাক করা দু-কেজি চিনি দিয়ে। আকর্ষণীয় ব্যাপার, সন্দেহ নেই ! তবুও কিন্তু এ. জি. এম.-এ ভিড় হয় না—মেম্বার বা শেয়ারহোল্ডারদের এক-দশমাংশের বেশি হাজির হন না। তাঁদের মধ্যে আবার (অফিসের) কর্মচারী বেশ কয়েকজন—তাঁদের দু-একখানা করে শেয়ার দেওয়া আছে। কোরাম বা ভোটের জন্যে এর দরকার হয়।

এও উল্‌টা-ফুল্‌টার একটা দিক।

সভা শেষ হলো। সভাঘরের বাইরে দেখলাম চারখানা টেবিল পাতা—একটাতে নাশতা, আর একটাতে ডায়েরি-ক্যালেণ্ডার আর শেষের দুটোতে চিনির ঠোঙা। প্রথম টেবিলের ঠোঙার চেয়ে দ্বিতীয় টেবিলের ঠোঙাগুলো আকারে দ্বিগুণ ত হবেই—পাঁচ কেজির বলেই মনে হলো।

আমরা—মেম্বাররা পেলাম এক একটা ছোট ঠোঙা। তবে বড় ঠোঙাগুলো কি হবে? অনুসন্ধিৎসা দমন করতে না পেরে এবং শালীনতার প্রতিবন্ধক না মেনে পরিবেশক বেয়ারাকেই জিজ্ঞাসা করে ফেললাম। সেও জবাব দিতে দ্বিধা করল না—ভেজনা হ্যায় থানেমে, বেংকমে, আডিটারকো দপ্তরমে, ছোকরা লোগকো কিলাবমে···আওর সব ফলানা জাগামে। হ্যাঁ, ঐ সব সংস্থার সঙ্গে খাতির করেই বিজ্‌নিস্‌ চালাতে হয়। সুতরাং তা কর্মপদ্ধতির অন্তর্গত।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম, চিনির বড় ঠোঙাগুলো এক মারুতি ভ্যানে তোলা হচ্ছে, এবং দু'জন বেয়ারা ডায়েরি-ক্যালেণ্ডার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভ্যানে তোলবার জন্যে। নাশতার প্যাকেট অবশ্য দেখলাম না।

বনোয়ারিলাল পাতোদিয়া শেয়ার মার্কেটে যাতায়াত-সহ অন্য দু-একটা ব্যবসা করেন। সম্প্রতি নেমেছেন অংশীদারীর ভিত্তিতে বহুতল বাড়ি নির্মাণে। এতে নাকি নাফা খুব।

প্রথম প্রকল্পেই বেশ কিছুটা নাফা, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একটা দুশ্চিন্তাও।

এই দুশ্চিন্তার কথাই বলছিলেন বনোয়ারিলালজী—ইস সাল টেক্স জাদা পড় যায়গা।

বললাম : এত স্বাভাবিক ব্যাপার—বেশি কামাই করলে বেশি ট্যাক্স ত দিতেই হবে।

—উয় বাত নেহি,—আমার মামুলি মন্তব্য উড়িয়ে দিয়ে বনোয়ারিলালজী বললেন,—শোচতা থা সাট্টামে কেতনা ঘাটা দেখানে সেকতা।

মুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম—পুরো নাফার ওপর ট্যাক্স

না দিয়ে, শেয়ারে লোকসান দেখানোর মাধ্যমে তার থেকে কিছুটা বাঁচাবার কথাই ভাবছেন বনোয়ারিলালজী।

বললাম, তবে আর চিন্তার কি আছে?

—চিন্তা ইস লিয়ে,—ব্যাখ্যা করলেন বনোয়ারিলালজী, —সাট্টা-কো বুকস্ ভি ঠিক করনে পড়েগা—লেকিন কেতনা তক?

সত্যিই ত চিন্তার—দুশ্চিন্তার কথা। বনোয়ারিলালজীর সুরাহা করতে গিয়ে শেয়ার-ডিলারকেও উল্টা-ফুল্টা করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে নাফার বখরা নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু কার ভাগে কতটা পড়বে তা নিয়েই হলো বনোয়ারিলালজীর সমস্যা—আসল সমস্যা।

শ্রীরামলাল চৌধুরী আমাকে ধরেছিলেন শ্রীপ্রেমচন্দ্র ধানুকার কাছ থেকে কিছু কর্জ পাইয়ে দিতে। প্রেমচন্দ্রজীর তথাকথিত ইনভেস্টমেন্টের কারবার। তিনি অনুরোধ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান—কোনটাই করলেন না। শুধু নির্দেশ দিলেন রামলাল চৌধুরীকে সব বুক্স-উকস্ লে কর তাঁর সঙ্গে পরদিন সকাল ১০টায় দেখা করতে। সঙ্গে আমিও থাকতে পারি।

পরদিন ঠিক সকাল ১০টায় দু-জনে গিয়ে পেঁছুলাম ধানুকাজীর অফিসে। বেশ খানিকক্ষণ খাতাপত্র নাড়াচাড়া করে তিনি জানালেন যে দু-একদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন। কিন্তু সিদ্ধান্তটা যে কি হতে পারে—ইতিবাচক না নেতিবাচক, তা আমাদের দু-জনের কেউই আঁচ করতে পারলাম না।

পরের দিনই ধানুকাজী আমাকে জানালেন যে তাঁর পক্ষে চৌধুরীজীকে কর্জ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ অতি সহজ—চৌধুরীজী নাকি বুক্স রাখতেই জানেন না—আসলি-নকলি সব একমেই ঘুসায়া।

—এ কোই বিজ্নিস্ হ্যায়!—মন্তব্য করলেন ধানুকাজী এবং তারপর ভবিষ্যদ্বাণীও করলেন: Chowdhury is a third class businessman—কোহিদিন পাকড় যায়গা—লেণ্ডারকো ভি ফাঁসায়গা।

তবুও কিন্তু ফার্স্টক্লাস বিজ্নিস্ম্যানরাও মাঝে মাঝে ধরা পড়েন। বুক্সের সঙ্গে তাঁদের উক্সের সন্ধানও করা হয়, তবে

তা অন্যভাবে—ভিন্ন পদ্ধতিতে।

(৩) **সার্চ অ্যাণ্ড সিজার** : এই ভিন্ন পদ্ধতির পুরো নাম হলো সার্চ অ্যান্ড সিজার—তল্লাসী এবং পরীক্ষার জন্যে খাতাপত্র নিয়ে যাওয়া। শুধু খাতাপত্র বা কাগজপত্র নয়। তল্লাসীতে নগদ টাকা ইত্যাদির সন্ধানও মিলতে পারে এবং অনেক সময় মিলেও থাকে। চলিত ভাষায় একে বলা হয় রেইড—ইনকাম ট্যাক্স রেইড। এমনি এক রেইডেরই ঘটনা—

বেলা ১১টা নাগাদ খেমকাজীর পাঁচতলার অফিসে যাবার জন্যে লিফটের কিউ-এ পেঁছুবার আগেই দেখি তাঁর খাস বেয়ারা লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে। সে যে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল তা বুঝলাম তাকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। সামনে এসে সে অনুচ্চস্বরে জানাল, শেঠ তাঁর নিউ আলিপুরের কোঠিতে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়েছেন।

—নিউ আলিপুর কেঁও ?—জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

এদিক ওদিক চেয়ে বেয়ারা গোপন সংবাদ পরিবেশন করল : হিঁয়া ইনকম্ টেক্সকা তল্লাসী চলতা হ্যায়। সাথ সাথ কোঠিমে ভি।...মালিক লোগ সবাই নিউ আলিপুর চলে গেছেন....সেখানে আপনার জন্যে প্রতীচ্ছা করছেন...আইয়ে, গাড়ি উধার হ্যায়।...

অনুসন্ধিৎসাকে আপাতত চাপা দিয়ে বেয়ারাকে অনুসরণ করে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

নিউ আলিপুরে এক বহুতল বাড়ি। নামার পর ড্রাইভার নির্দেশ দিল পাঁচতলায় যেতে—বাঁয়া-সাইট ফ্লেট...লিফট্ উধার হ্যায়।

লিফটের ল্যাণ্ডিং-এর পাশেই ছোট্ট একটা কাঠের ফলকে নাম-নির্দেশিকা : Planet Plastics Ltd., Registered Office. Fifth Floor. শেষের শব্দ দুটো পরের লাইনে। বুঝলাম এই বাড়ির ফ্ল্যাটে ওঁদেরই প্ল্যাসটিক কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিস। তবে এখানে বোধহয় কেউ বসেন না—কাজকর্ম হয় সেই ফ্যান্সী লেনের মূল কার্যালয় থেকে।

ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়—বিজ্‌নিস্‌-তক্‌নিকেরই[১] অন্তর্ভুক্ত।

---

১. Technique-এর হিন্দি—ব্যবসায়ী মহলে সুপ্রচলিত শব্দ

রেজিস্টার্ড অফিস বলে সেখানে কোম্পানীর খরচায় লোকজন রাখা যায়, কোম্পানী থেকে ভাড়াও আদায় করা যেতে পারে, মেরামতির জন্যেও কোম্পানী থেকে টাকা আসে—টেলিফোন বিল, ইলেকট্রি-সিটি বিল সবই পাওয়া যায়। এই কারণে দেখা যায়, অনেক ব্যবসায়ীর বসতবাড়িই এক বা একাধিক কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিস—কোম্পানীর খরচায় গৃহস্থালি চালানোর এক অভিনব ব্যবস্থা। তা'ছাড়া লোকজন পাওয়াও সহজ হয়। যারা কাজ করে তারা পায় প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, বোনাস, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা—প্রাইভেট কাজে এসব বড় একটা পাওয়া যায় না। তাই তারাও কোম্পানীর খাতায় নাম লেখাতে চায়। আর কোম্পানীর খাতায় নাম লেখালে ইউনিয়নের আন্দোলনের ফলে প্রাপ্তির অংশও এসে জোটে, যা পেরাইভেট কাম লেনেসে মিলনা মুশকিল হ্যায়। সুতরাং সুবিধা উভয়ত এবং ব্যবস্থাটি পারস্পরিক।

দু'টো প্রাসঙ্গিক ঘটনা—

প্রথম : আগে দু-একবার আনুষ্ঠানিক অনুরোধ অবশ্যই করেছিলেন, সেদিন কিন্তু মোহনলালজী একরকম জোর করেই তাঁর কোঠিতে নিয়ে গিয়েছিলেন আমায় চা-পান করাবার জন্যে। মোহন-লালজী কোন কোম্পানীর কর্ণধার বা অংশীদার নন। একখানা রং-এর দোকানের মালিক। এই রং কেনার সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আলাপ, হয়তো কিছুটা মাখামাখিও।

বড় ছেলেকে দোকানে বসিয়ে মোহলালজী আমায় তাঁর প্রায় পার্শ্ববর্তী কোঠিতে নিয়ে এলেন। ঢুকেই শোনেন এক দুঃসংবাদ—নোকরানী ছুট গিয়া।

আমি যে পাশেই দাঁড়িয়ে আছি তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়ে মোহনলালজী বোমার মত ফেটে পড়লেন, দুঃসংবাদদাত্রী স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন : নোকরানী ছুটেগী নেহি, যেইস্যা না-মরদ লেড়কা তুমারা সব ! মেরা টাইমমে এইসি্য কভি হোতা থা ?

তারপর একটু সামলে নিয়ে ঘোষণা করলেন : আভিসে নোকরই রাখুঙ্গা—ঘরকা কাম করেগা, দুকানকি ভি কাম সামলেগা। —তারপর খনিকটা স্বগতোক্তির মত,—তলব থোড়া বাড়ানে হোগা।...

হঠাৎ আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আমাকেই সমর্থনের জন্য প্রশ্ন করলেন : কেয়া মুখার্জিবাবু, ঠিক বোলা নেই ?

তাঁর মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে কতটা ঠিক ছিল তা বুঝতে না পেরে আমি চুপ করেই ছিলাম।

দুই : আমাদের জমিদার-প্রধান শহরতলীর সেই ঘটনাটা।

গঙ্গার ঘাটে দুই বৃদ্ধের মধ্যে আলাপের টুকরো কানে ভেসে আসছিল।—

—রাতদিনের 'ঝি'[১] রাখা দায় হয়েছে মশায়,—মন্তব্য করলেন একজন।

—কেন কি হলো ?

—কি আর হলো ! এ মাসে একজনকে পাওয়া গেল—ও মাস থেকে সে আর থাকবে না—বলছে চলে যাবে।

—চলে ত' যাবেই।—যা দিনকাল পড়েছে (তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়)। আমরা যা মাইনে দিই তাতে আর ওদের কুলোয় না,—সরল সত্যই প্রকাশ করলেন দ্বিতীয় ভদ্রলোক।

—কিন্তু জমিদার-বাড়িতে ঝি-রা ত' ঠিক থাকে। সেখানে কি বেশি মাইনে পায় ?—প্রতিবাদ করেন দ্বিতীয় ভদ্রলোক।

—জমিদারবাড়িতে রসেবশে রাখে মশাই ! পারবেন আপনি ?

এবার দু-জনেই হো হো করে হেসে ওঠেন। হাসির মধ্যেও শোনা যায় বিক্ষুব্ধ বৃদ্ধের সমর্থন : যা বলেছেন মশায়—রসেবশে !

হাসিঠাট্টা শ্লীলতা-অশ্লীলতার ব্যাপার নয়, অর্থনৈতিক দৃষ্টি-কোণ থেকে এ হলো নীট সুবিধার[২] প্রশ্ন। নীট সুবিধার পরিমাণ যেখানে বেশি, শ্রমিক সেই দিকেই আকর্ষিত হয়—সেখানেই টিকে থাকে। জমিদার-বাড়িতে লোকজন টিকত। এখন মাড়োয়ারীদের বাড়িতে টেকে—কারণ একই।

লিফটে করে পাঁচতলায় উঠে বাঁদিকের ফ্ল্যাটটা খুঁজে বের করতে দেরি হলো না—সেখানেও কাঠের ফলকে বিজ্ঞপ্তি সাঁটা : Planet Plastics Ltd.

১. তখন 'ঝি' শব্দটিই প্রচলিত ছিল, 'কাজের লোক' কথাটি নয়।

২. নীট সুবিধা বা net advantages ধারণাটি প্রচলিত করেন নয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ অ্যালফ্রেড মার্শাল।

ভেতরে ঢুকে দেখি একখানা চমৎকার সাজানো বসবার ঘর, অফিসের সঙ্গে যার কোন সম্পর্কই নেই। দু-ধারের কোচ-সোফায় তিনজন বসে—খেমকাজী, তাঁর ছেলে বা জুনিয়র খেমকা এবং আরও একজন। তাঁকেও চিনলাম—আয়কর বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার, বর্তমানে খেমকাজীর আয়কর-পরামর্শদাতা—আংশিক, না পুরো সময়ের তা জানি না।

তিনজনে বেশ উচ্চৈস্বরে আলাপ করছিলেন—কারও মধ্যে কোন বিচলিত ভাব লক্ষ্য করলাম না। আমাকে দেখে খেমকাজীর প্রসন্নতা যেন আরও ফুটে উঠল। বললেন : আপ তব নেহি ঘুসা ! আচ্ছাই কিয়া।

—আচ্ছা কেন ?—জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

—আচ্ছা ইস লিয়ে,—ব্যাখ্যা করলেন খেমকাজী,—ঘুসনেসে নিকালনে নেহি দেতা। আপকো উইটনেস ভি বানানে সেকতা।···

তা হলে ত' ভালই হয়েছে। শুনেছিলাম, তল্লাসীর সময় অফিসের যারা থাকে তারা টয়লেট পর্যন্ত ব্যবহার করতে গেলে সঙ্গে যান তল্লাসীদলের একজন। প্রকৃতির বড় আহ্বানের আবেদন করলে দেহ-তল্লাসী করে তবে নাকি ঢুকতে দেওয়া হয়। যাক, এ যাত্রায় বেঁচে গেছি ! কিন্তু আমায় ডাকা কেন ? শুনলাম, ডাকা হয়েছে এই কারণে যে ওঁদের সিদ্ধান্ত আমি সমর্থন করি কিনা, তা জানবার জন্যে।

সিদ্ধান্তটা কি ? সিদ্ধান্ত হলো প্রয়োজন হলে ব্যাপারটাকে পরবর্তী স্তরেই সালটাতে হবে, এখানে নয়—দিল্লীতে, ট্রাই-ব্যুনালে, দরকার ও সম্ভব হলে হাইকোর্টেও। তল্লাসীর সময় সালটাবার চেষ্টা করা ভুল—উয় লোগকো থোড়া কাম দেখানেই পড়েগা—পেপার-উপার কুছ্ ত মিলেগা নেহি।···

পেপারের কথা বলেই খেমকাজী যেন একটু চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। কয়েক সেকেণ্ড পরেই জুনিয়র খেমকাকে জিজ্ঞাসা করলেন : উয় (শেয়ার) ব্রোকারকা পেপারঠো কাঁহা ?···আভি তক্ বুকস্‌মে নেহি উঠা ?

—কালই উঠায় দিয়া, —আশ্বাস দিলেন জুনিয়র খেমকা।

খেমকাজীর স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। সেই সোজা ব্যাপার—

শেয়ার কেনাবেচায় লোকসান দেখানো।

একটা প্রশ্ন মনে খোঁচা মারছিল, তা প্রকাশ না করে পারলাম না : আপলোগ কোই আজ অফিসে গিয়া নেহি—খবর মিলা থা কি আজ রেইড হোগা ?

—মিলা থা, —সামান্য হেসে জবাব দিলেন খেমকাজী।

—কেইস্যা মিলা ?

—That's our trade secret,—উত্তর এল জুনিয়র খেমকার কাছ থেকে। তবে একটু পরেই খেমকাজী সূত্রের ব্যাখ্যা করলেন—

বোম্বাই ব্যাঙ্গালোরে রেইড ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে—এক এক দিনে বিশ-পচাশ জাগামে। এবার নিশ্চয়ই কলকাতা মাদ্রাজ ইত্যাদির পালা। তাই সবাই মোটামুটি সতর্ক ছিলেন।

এই সব রেইড একসঙ্গে এত দপ্তর-হাবেলীমে হয় যে স্থানীয় স্টাফে কুলোয় না। তা'ছাড়া ল্যোকালি এত বড় তোড়জোড় করলে ইনফরমেশন ভি লিক্ কর যাতা হ্যায়। তাই অন্য শহর—বিশেষ করে দিল্লী থেকে অফ্সার লে আতা।

এই অনুমানের ভিত্তিতে ও'রা কয়েকজন মিলে এয়ারপোর্টে লোক রেখেছিলেন। তাঁরা চার-পাঁচদিন দিল্লী থেকে আগত হাওয়াই জাহাজের প্যাসেঞ্জারের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল।....এবং খবর সেই সূত্রেই পাওয়া গেছে—দেল্হী থেকে পচাশ আদমিকা পার্টি ইভনিং ফ্লাইটে দামদাম উতরে ছিল—নিশ্চয়ই রেইডিং পার্টি। সুতরাং আরও সতর্কতা, এবং সতর্কতাও ফলপ্রসূ—আজই ত রেইড হয়ে গেল।

সংবাদপত্রে পরিবেশিত সাধারণ তথ্য, সহজ আশ্রয়বাক্য বা প্রেমিস, নির্ভুল সিদ্ধান্ত—শার্লক হোমস, ফাদার ব্রাউন, ব্যোমকেশ বক্সী, পরাশর বর্মাকে হার মানায় কিনা জানিনা, তবে যে তারিফ করবার মত ডিডাকসান তাতে সন্দেহ নেই। মনে মনে তারিফই করলাম, বিশেষ করে অনুমানের পরবর্তী পর্যায়ের কর্মপদ্ধতিকে—পেপার-উপারের ব্যবস্থা করা, নিজেরা ঐ দিন কর্মভূমিতে না যাওয়া এবং তল্লাসীর সময় বাড়িতে না থাকা।

বাড়িতে ছিলেন না কেন? অনেক ক্ষেত্রে যে একই সময় বাড়িতেও তল্লাসী করা হয়। কি দরকার ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের ? অল-

ক্লিয়ার সিগন্যাল পেলেই আবার কোঠির দিকে রওনা হওয়া যাবে, আর অফিস-টাইম যদি অতিক্রান্ত না হয় তবে অফিসেও যাওয়া যেতে পারে। এমন ভাব নিয়ে অফিসে ঢুকতে হবে যেন কিছুই হয় নি। বরং নিজেদের থেকেই জিজ্ঞাসা করা ভাল : ক্যা হুয়া ?···ইনকাম-টেক্স রেইড হুয়া ? হোনে দেও—Let them mind their business, let's mind our own.

আমার ভাবনায় ছেদ পড়ল খেমকাজীর কণ্ঠস্বরে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : ক্যা শোচতা হ্যায়, প্রফেসার সাহাব ? —কোন কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আশ্বাস দিলেন : ডর কেয়া যব তক ভাড় সাহাব হ্যায়।

ভাড় সাহাব মানে মিঃ ভড়, একদা আয়কর বিভাগের অ্যাসিস-ট্যানট্ কমিশনার এবং বর্তমানে খেমকাজীর (অন্যান্যদেরও হতে পারেন) ইনকাম-ট্যাক্স কন্সালট্যাণ্ট।

কিন্তু ডর কার ? 'ডর কেয়া' আশ্বাসবাক্যটি নিশ্চয়ই আরোপিত ভাবের পরিচায়ক। ডর যদি কিছু থাকে তবে তা আমার নয়, ভড় সাহেবেরও নয়—খেমকাজীরই।

কয়েকদিন পরে সেই গল্পকার রাজচন্দ্রজীকেই এই তল্লাসীর বিবরণ দিয়েছিলাম। শুনে তিনি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছিলেন : ইসমে হ্যায় কেয়া ? দো-নম্বরি কারবার করনেসে কভি কভি রেইড হোতাই হ্যায়।

এবার কিছুটা অ-সচেতনভাবে প্রশ্ন করেছিলাম : কিন্তু দো-নম্বরি কারবার না করলেই নয়—এতনা রুপেয়া ত' আপলোগ বানায়া·· ।

—নেহি জী ! নেহি করনেসে এহি জমানামে কামকাজ নেহি চলেগা। ইসমে কিন্তু-পরন্তুকা বাত হ্যায় নেহি। —তারপর কয়েক সেকেণ্ড পরেই বলেছিলেন, একঠো কহানী শুনিয়ে—

এক ছোট রাজ্যের রাজধানীতে পানীয় জলের জন্যে দুটি মাত্র কুয়ো ছিল। একটা থেকে রাজা-মন্ত্রী-পাত্র-মিত্র-সভাসদদের জন্যে পানীয় জল আসত, এবং অপরটা থেকে প্রজাবৃন্দের।

অপর কুয়োটির জল একদিন দূষিত হলো—তার জল যেই পান

করে সেই পাগল হয়ে যায়। রাজধানীর প্রজাবৃন্দ সকলেই হয়ে গেল উন্মাদ।

উন্মাদ হয়ে তাদের দু-একজনের মাথায় প্রথম এল যে তারাও রাজা, ক্রমে সেই ভাবনা সবার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল—ম্যয় ভি রাজা হুঁ।

এই অবস্থায় একদিন তারা ঠিক করল, আমরা সবাই যখন রাজা তখন যাওয়া যাক সবাই মিলে রাজসিংহাসনে বসতে।

দল বেঁধে তারা এল রাজপ্রাসাদের সামনে, সুরু করে দিল সোরগোল।

প্রাসাদ থেকে সবাই ত' ব্যাপার দেখে অবাক। রাজাই চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমলোগ কেয়া মাংতা? উত্তর এল : ম্যয় সব রাজা হুঁ।

রাজা তখন আরও চেঁচিয়ে বললেন : তুম সব পাগল হো।···

—তুম পাগল হো, —বহুকণ্ঠে উত্তর এল জনতা থেকে। তারপর তারা শুরু করল তাদের পক্ষে যা স্বাভাবিক—নাচগান অঙ্গভঙ্গি।

রাজা হয়তো আরও কিছু বলতেন বা করতেন, কিন্তু মন্ত্রী তাঁকে থামিয়ে দিলেন। বললেন : মহারাজ, উয় লোগকা মাফিক আপভি পাগল বন যাইয়ে—নেহি তো আপকো গদ্দি চলা যায়গা।

মন্ত্রীর পরামর্শের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করতে মহারাজের দেরি হলোনা। তুরন্ত তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে নেমে গিয়ে জনতার শামিল হলেন—নাচাগানও সুরু করে দিলেন। জনতা খুব খুশি—এইস্যা রাজা কভ্ভি নেই দেখা। ···কিছুক্ষণ পরে তারা ফিরে গেল।

কহানী শেষ করে রাজচন্দ্রজী মন্তব্য করলেন : সমঝা প্রফেসার সাহাব, যো মুলুকমে—যো জমানামে আপ হ্যায় উসকি আদব আপকো মাননেই পড়েগা।···

ভাবলাম, সত্যিই ত, রোমে অবস্থানকালে রোমানদের মত আচরণ না করলে চলে না।··· এই দেশে, আজকের জমানায়··· বাধা পেলাম রামচন্দ্রজীর টীকাপ্রবাহে—

—ব্লেক মানি কৌনসে আদমিকো হ্যায় নেহি? ডাক্তার-উকিলরাই কি সব কামাই ইনকাম টেক্স ফারম্‌মে ভরেন? কোন দুকানি সাচ্চা

হিসাব দেতা? আপনারা টিচার লোক কি প্রাইভেট ট্যুইশান করেন না? তার হিসাব কি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টে দেন? দিলে আপনাদের চলবে না, আর আপনাদেরও লোকে বিশেষ রাখবে না—তারাও যে দো-নম্বরি রুপেয়া ইস্‌মে খর্চ করতা হ্যায়। কোন জমিন বা ফ্লেট পুরে হোয়াইট টাকায় পাওয়া যাবে না—আপনিও নেবেন কি? দহেজ[১] নেওয়াটা কি কালা রুপেয়া বানানোর নামান্তর নয়—কানুন কি বলে? তবে পার্থক্য হলো যে, যার বড়া পেট সে বেশি খেতে যায়, আর যার ছোটা পেট সে থোড়াসে খাতা—লেকিন খাতা সব্‌ভি।

(৪) ছোটা-পেট বড়া-পেট : খায় যখন সবাই তখন ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে খাওয়াটাকে মাড়োয়ারীরা সমর্থনই করেন, ছোট পেটের ক্ষেত্রে ত' বটেই। এই সমর্থন হলো উপযোগভিত্তিক—না খেতে দিলে কাম পাওয়া যায় না। বিপরীতপক্ষে খাইয়েই কাম বানাতে হয়। খাওয়ানো যে লগ্নিরই শামিল।

তবে ভুল লগ্নি হলে মাড়োয়ারী সম্প্রদায় চুপ করে বসে শুধু হা-হুতাশই করেন না, বিলগ্নির ব্যবস্থাতেও সচেষ্ট হন। শিরনি খাবে আবার ভরাও ডোবাবে, তা হবে না। যেমন—

ছেলেটি মোটর-গাড়ি চালাবার লার্নারস লাইসেন্সের পরীক্ষার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে বেলতলায় হাজির হয়েছিল। বন্দোবস্ত আগে থেকেই হয়ে গিয়েছিল যে তাকে নিয়মমত পরীক্ষা করা হবে না—একটু আধটু দেখেশুনেই ছাপ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে।

সামনে শরৎ বোস (ল্যান্সডাউন) রোডেই পরীক্ষা হচ্ছিল। পরীক্ষক তাকে খানিকটা সামনে যেতে নির্দেশ দিলেন। সে স্টার্ট দেবে এমন সময় এক সিনিয়র অফিসার এসে হাজির। হঠাৎ তাঁর উপস্থিতির কারণ যাই হোক না কেন, জুনিয়র অফিসার তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে বাধ্য হলেন—ড্রাইভারকে নামিয়ে নিজে পরীক্ষার্থীর পাশে বসলেন এবং সিনিয়র অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলেন : আসবেন নাকি স্যার?

সিনিয়র অফিসারও সামনে বসলেন। আবার সেই অনুজ্ঞা :

---

১. বিবাহে পণ

সামনে চালান। ছেলেটি কয়েক গজ সামনেই চালাল। তারপর আবার অনুজ্ঞা : এবার ব্যাক করুন। শুনে ছেলেটি গাড়ি থামিয়ে পেছন ফিরে করতল প্রসারিত করল।

—কি ব্যাপার? —সিনিয়র অফিসার বিস্মিত প্রশ্ন না করে পারলেন না।

তাঁর এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ছেলেটি পরীক্ষকের কাছে দাবি করল : টু হাণ্ড্রেড রুপিজ ব্যাক করিয়ে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য পরীক্ষককে দু-শ টাকা ব্যাক করতে হয়নি, ছেলেটিও গাড়ি ব্যাক করবার নির্দেশ থেকে রেহাই পেয়েছিল।

ঘটনাটি শুনেছিলাম ছেলেটিরই মুখে, এবং সে জ্ঞানও দিয়েছিল : I knew, sir, once he had swallowed, he wont disgorge it—ছোটা-পেট, স্যার।

(৪) ধর্মাধা : এই সব ছোটা-পেট যাতে নিয়মিত ভরে সে-সম্পর্কে মাড়োয়ারী সম্প্রদায় সদাসর্বদা সচেতন। এই উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক মাড়োয়ারী-ভবনে একটা-দুটো-তিনটে বা ততোধিক ট্রাস্ট থাকে—ট্রাস্ট থেকেই ছোটা-পেট ভরাবার ব্যবস্থা করা হয়। ট্রাস্টের টাকা আসে 'দান' থেকে—ট্রাস্টে দান করলে আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে রেহাই পাওয়া যায়।

বেশ কিছুদিন আগের কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আহূত রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলন। উদ্যোক্তাদের অনেক টাকা তুলতে হবে। বড় বড় শিল্পপতি ও শিল্প-ভবনের কাছে আবেদন করা হলো। কেউ কেউ সামান্য কিছু পাঠালেন, কেউ কেউ বা অপারগতা জানিয়ে দুঃখপ্রকাশ করলেন। বিড়লাদের কাছ থেকে আবেদনের প্রাপ্তি-স্বীকারও পাওয়া গেল না। তখন ঠিক হলো ভাইস-চ্যান্সেলরকে দিয়ে বিড়লা-অফিসে ফোন করান হবে।

তাই হলো। ভাইস-চ্যান্সেলর প্রয়াত সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রয়াত ব্রিজমোহন বিড়লাকে ফোন করলেন। ফল ফলল। কয়েক দিনের মধ্যেই বিড়লা অফিস থেকে পাঁচ হাজার টাকার করে দু-খানি চেক এল—একখানা হরিদ্বার ট্রাস্ট থেকে, অন্যটি বারাণসী ট্রাস্ট থেকে।

হরিদ্বার ও বারাণসী ট্রাস্ট থেকে চেক আসায় আমরা সবাই একটু বিস্মিতই হয়েছিলাম—রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনের সঙ্গে এই দুই ট্রাস্টের সম্পর্ক কীভাবে কল্পনা করা যেতে পারে তা ঠিক বুঝতে পারিনি। পরে কিন্তু ট্রাস্টের প্রকৃতি-পরিচয় পাবার পর ব্যাপারটা ভালভাবেই বুঝেছিলাম।

ট্রাস্ট থেকেই এই সব ছোটখাট অনুরোধ-উপরোধ রক্ষা করা হয়, ছোটা ছোটা পেট ভরানো হয়, কামমে লাগনে সেকতা—এইরকম ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে রাজীখুশি রাখার প্রচেষ্টা করা হয়। হয়তো স্থানীয় থানার দারোগা সাহেব অনুরোধ করে পাঠালেন তাঁর পরিচিত কোন দুস্থ ব্যক্তির কন্যাদায়ে সাহায্য করতে, হয়তো ঐ অঞ্চলের এম. এল. এ. বা এম. পি. এক পড়ুয়াকে পাঠালেন অর্থ-সাহায্যের জন্যে, কিংবা হয়তো কোন আই. টি. ও. বা ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার বা ফিনান্সিয়াল ইনস্‌টিটিউসনের কোন কর্তাব্যক্তি অনুরোধ জানালেন কারও চিকিৎসার খরচের জন্যে—তখন 'দিও কিঞ্চিৎ, কোরো না বঞ্চিত' নীতি অনুসরণ করে প্রার্থীদের নয়, তাদের মুরুব্বিদের সন্তুষ্ট রাখা হয়।

আর সন্তুষ্টিতে রাখা হয় নিজেদের ছোটা পেটবালা করমচারী-দের। তাদেরও ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজনের বিয়েশাদি হয়, পড়াই-এর জন্যে আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়, পোষ্যদের অসুখ-বিসুখের জন্যে খরচ করতে হয় (যা কোম্পানী থেকে পাওয়া যায় না), চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ঘরবাড়ি প্রায়ই পুড়ে যায়—ঝড়ে পড়ে যায়—বন্যায় ভেসে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া আছেন মুনিম, ক্যাশিয়ার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ও উচ্চদায়িত্বশীল কর্মচারীরা। তাঁদের ছেলেরা হয়তো ধান্ধা-নোকরিতে লেগে গেছে। কিন্তু তাঁদের নিজেদের ব্যবস্থা কি? পেন্‌সন্‌ ত নেই। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় কেউ কি হাত দিতে চায়? সুতরাং ব্যবস্থা হলো ট্রাস্ট থেকে নিয়মিত—মাসিকও হতে পারে, সাহায্য দান।

এক মাড়োয়ারী-ভবনে একজন ক্যাশিয়ার বহুদিন ধরে কাজ করেছিলেন। অতি বৃদ্ধ বয়সে তিনি অবসর নিয়ে মুলুক ফিরে যান। সেখান থেকে কর্তাদের কাছে আবেদন করেন যতদিন জীবিত আছেন ততদিন কিছু মাসিক সাহায্যের। কর্তারা বরাদ্দ করলেন

ট্রাস্ট থেকে একটা মাসোহারার।

অবসরপ্রাপ্ত ক্যাশিয়ারের কাছে সংবাদটা গেলে তিনি ব্যবস্থা-টিকে অপমানজনকই মনে করলেন, উত্তেজিত হয়ে লিখলেন—ক্যা, ধর্মাধা খায়গা ? ··

ধর্মাধা শব্দের অর্থ চ্যারিটি—দান। তিনি দান নিতে প্রস্তুত নন—বিশেষাধিকার বা প্রিভিলেজের দরুন যদি কিছু পাওয়া যায় তাই তিনি চান। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভবনটি সেই ব্যবস্থাই করেছিল—কর্তারা নিজেদের পকেট থেকে নিয়মিত টাকাটা পাঠাতেন।

ধর্মাধা বা ট্রাস্টের অপব্যবহারের (!) জন্যে সম্প্রতি আয়কর আইনে কড়াকড়ি করা হয়েছে। তবে আইনের ফাঁক সব সময়ই খুঁজে পাওয়া যায়। সেই ফাঁক দিয়েই—অর্থাৎ উল্‌টা-ফুল্‌টা করে মাড়োয়ারীরা তাঁদের ট্রাস্টের কাজ চালান। ফলে অনেকটা আগের মতই লোককে রাজীখুশি রাখা যায়, করমচারীদেরও কাজ ছেড়ে অন্য জায়গায় কাজ খোঁজার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় না। বলেছি, বর্তমানে বাড়িতে লোকজন বিশেষ টেকে না, কিন্তু মাড়ো-য়ারীদের বাড়িতে টেকে। প্রথমত তারা কোম্পানীতে নাম লিখিয়ে বাড়িতে খাটে, এবং দ্বিতীয়ত তারা ধর্মাধা খেয়ে চলে। এই ধর্মাধার জন্যেই ঐ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে আন্দোলন ইত্যাদি বড় একটা দানা বাঁধে না। অপরপক্ষে এই ধর্মাধা থাকার জন্যেই অছিরা উল্‌টা-ফুল্‌টা করার সুবিধা পান।

(৫) **কো-পার্শোনারী:** ট্রাস্ট অ্যাকাউন্ট থেকে ক্যাশ চেকে পাঁচ হাজার টাকা তোলবার নির্দেশ দিয়েছিলেন শ্রীরাধামাধব সাকসেরিয়া। খাজাঞ্চী মশায় জানালেন ট্রাস্টে অত টাকা নেই।—ক্যায়সা ? বিস্মিত না হয়ে পারেন না রাধামাধবজী, ব্যাংকের রিটার্নেই ত দেখেছেন আট হাজার টাকার মত আছে। ইতিমধ্যে তিনিও ত কোন চেক কাটেন নি ! তবে ?

জবাব খাজাঞ্চীই দিলেন : অশোকবাবু কাল পাঁচ হাজার রুপেয়া উঠায় লিয়া।

অশোকবাবু মানে তাঁর একমাত্র পুত্র। সে পাঁচ হাজার টাকা

উঠিয়ে নিয়েছে !—কিস লিয়ে ?

—সো মালুম নেহি, জবাব দিলেন খাজাঞ্চী।

—মুঝে মালুম হ্যায়,—বলে ইঙ্গিতে খাজাঞ্চীকে স্থানত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন রাধামাধবজী। খাজাঞ্চী চলে যাবার পর আমার দিকে চেয়ে রাধামাধবজী একটি ঘোষণা করলেন : অশোকসে ট্রাস্ট আলগ করনেই পড়েগা।

স্রোতের মুখ ফেরাবার প্রচেষ্টায় আমি বললাম, হয়তো অশোক বিশেষ কোন কারণে টাকাটা তুলেছে—হয়তো কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানে দান···

—নেহি বাবু,—আমার বক্তব্যের বিরোধিতা করে তাঁর সন্দেহটা ভাঙলেন রাধামাধবজী : রুপেয়া জরুর ওহি ছোকরীকী কোই নোকর-নোকরানীকী দিয়া হোগা।

'ছোকরীর' ব্যাপারটা জানতাম, কিন্তু সন্দেহটা আমার মনে উদয় হয়নি। রাধামাধবজীর লেড়কা নাকি কোন্ এক এয়ার-লাইন্সের এক সেলস্ গার্লে আসক্ত হয়ে পড়েছে। মহিলাটি বয়স্কা, তাঁর স্বামী-সংসার আছে। তবুও তিনি নাকি অশোকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক পাতিয়েছেন। বেশ কিছুটা নাকি দোহনও করেছেন। কিন্তু বাড়ির নোকর-নোকরানীর জন্যে যে তিনি অশোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারেন তা আমার চিন্তাতেও আসে নি।

এখন মনে হলো হতেও পারে। এ সেই ইংরেজী প্রবাদবাক্যের ব্যাপার : If you love me, love my dog as well—আমাকে ভালবাসতে হলে আমার নোকরানীকেও ভালবাসতে হবে।

কিন্তু অত টাকা !

পরিমাণের ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল রাধামাধবজীর কাছ থেকে : কোই বোলা হোগা লেড়কীকী শাদি হ্যায়—এক চেকসেই পাঁচ হাজার রুপেয়া উঠায় লিয়া, দেখা নেহি ?

বললাম, অশোককে জিজ্ঞাসা করুন না টাকাটা সে কি করেছে।

—কেয়া ফয়দা ? পুছনেসে ঝুট বোলেগা ; নেহি ত' বোলনে ভি সেকতা ট্রাস্টমে মেরা রাইট হ্যায় নেহি ?

অতএব, রাধামাধবজীর বক্তব্য হলো ট্রাস্ট আলগ করা ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু কারবার বাড়িঘর—সবই ত যৌথ থেকে যাবে, শুধু ট্রাস্ট আলগ করে লাভ কি ?

বললাম, ওগুলোও তাহলে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিন।

—নেহি জী,—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন শেঠ রাধামাধব সাকসেরিয়া,—উয় করনেসে টেক্সকা ফয়দা খতম হো যায়গা।

শেষ পর্যন্ত রাধামাধবজী ছেলের সঙ্গে কিছুই ভাগাভাগি করেন নি, নিশ্চয়ই ট্যাক্সের ফয়দা ওঠাবার জন্যেই।

মার্ক্স ঠিকই বলেছেন, আইডিয়া নয়, ম্যাটারই মানুষের কার্যাকার্যের প্রধান নির্ধারক।

মাড়োয়ারীদের উত্তরাধিকার, মালিকানা প্রভৃতি মিতাক্ষর[১] বিধিব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (আমাদের মত দায়ভাগ দ্বারা নয়)। সম্পত্তিতে পিতার সঙ্গে পুত্রের এবং পুত্রের সঙ্গে পৌত্রের সমানাধিকার। আয়কর আইনে ধরে নেওয়া হয় পিতাপুত্র একসঙ্গেই বাস করছেন, এবং এই রকম পরিবারকে বলা হয় 'হিন্দু অবিভক্ত পরিবার'—Hindu Undivided Family বা সংক্ষেপে H.U.F.

হিন্দু অবিভক্ত পরিবার আয়করের ব্যাপারে কিছুটা সুবিধা পায়, যার আকর্ষণে পরিবার অবিভক্তই থেকে যায়—অন্তত আনুষ্ঠানিকভাবে। এখানেও ফয়দা ওঠাবার—নীট লাভকে সর্বাধিক করবার প্রচেষ্টার ব্যাপার। ব্যবসায়ীর প্রধান মোটিভেসনই ত তাই। এই অনুপ্রেরণা থেকেই তাঁরা পুত্রসন্তান না হলেই গোদ নিয়ে থাকেন, এমনকি দোহিত্রকেও।

(৬) **হিসাব পাই পাই :** আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও কার্যত অনেক সময়ই বাপছেলে আলাদা হন—ভাইভাই ঠাঁই ঠাঁই ত' বটেই। ব্যবসা এক থাকে, স্থাবর সম্পদ ও সম্পত্তি এক থাকে, চৌকাও এক থাকতে পারে—অর্থাৎ নামে থাকে এইচ. ইউ. এফ., কেবল অস্থাবর সম্পত্তি ও আয়টা ভাগ হয়ে যায়।

ভাগ হয় আত্মীয়স্বজনের সালিসির মাধ্যমে। সাধারণত নিজ-

১. ওঁরা বলেন 'মিতাচ্ছরা'

বংশীয় বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে থেকেই সালিসদের বেছে নেওয়া হয়, এবং তাঁদের সালিসি দু-পক্ষই মেনে নেয়—কোর্ট-কাছারি বড় একটা হয় না!

স্থাবর সম্পত্তি ও আয় ভাগ নিয়ে কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু গোলমাল বাঁধতে পারে এবং বেঁধেও থাকে হিসাব-বহির্ভূত টাকা নিয়ে। কারণ, সাধারণত এই টাকা থাকে 'কর্তার'—হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের প্রধানের কাছে। 'কর্তা' পদটি আইনসম্মত ও আয়কর-বিধি স্বীকৃত। পরিবার যখন অবিভক্ত তখন পরিবারের মাথা—কর্তা একজন থাকবেনই। এক্ষেত্রে কর্তা হলেন স্বাভাবিকভাবেই পিতা মহাশয়।

ছেলের ধারণা হয়তো কর্তারূপী বাপ কিছু টাকা গায়েব করবার চেষ্টা করছেন, আর বাপের ধারণা সব টাকাটা এখনই ছেলের হাতে দেওয়া অযৌক্তিক—নয়া জমানার লেড়কা সব নয়ছয় করবে।

ছেলে কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। সে সালিসদের কাছে অভিযোগ করে : আওর রুপেয়া জরুর থা।

সালিসরা সে কথা কর্তাকে জানান। কর্তা দু'দিন ধরে ভেবে-চিন্তে আরও লাখখানেক টাকা বের করে পরের মিটিং-এ সালিসদের হাতে তুলে দেন ছেলেকে হস্তান্তরের জন্যে।

ছেলের হাতে টাকাটা দেওয়া হয়। সালিসদের সামনেই কভার-ফাইল খুলে ছেলে নোটের তাড়াগুলো গুণতে থাকে, এমন সময় শুনতে পায় কর্তা বলছেন : তেরা বকশিশ।

—বকশিশ!—ছেলে বিস্মিত না হয়ে পারে না। সালিসরা কিন্তু মোটেই অবাক হন না। একজন মন্তব্য করেন : সহি বাত।

—সহি বাত! কেইস্যা?

সেই সালিস ভদ্রলোকই উত্তর দেন : পাই পাই হিসাব ত' পইলে মিল গিয়া, আভি এক লাখ রুপেয়া বকশিশ।

ছেলেটিকে সম্বোধন করে আর একজন যোগ করেন : তুমকো ত' কভ্ভি কামানে নেহি হুয়া। বকশিশ ছোড়কে আওর কেয়া?

অকাট্য যুক্তিতে পরাস্ত হয়ে ছেলেটি পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনার মত এক লাখ টাকার কভার-ফাইলটি তুলে নিয়ে চলে যায়। তার দিকে চেয়ে কর্তা কতকটা স্বগতোক্তি করেন : ও রুপেয়াভি বরবাদ করেগা।

মাসখানেক পরের ঘটনা। কর্তা আমাকে তাঁর চেম্বারে ডেকে জানালেন : প্রফেসর সাহাব। ম্যয়নে বেঅকুফি কিয়া থা—ছোকরা ওহি লাখ রুপেয়া বরবাদ কর চুকা।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কর্তা তখন স্মরণ করিয়ে দিলেন : আপকো ইয়াদ নেহি, ছোকরা হিস্যাসে[১] লাখ রুপেয়া জায়দা লিয়া? ওহি রুপেয়া একদম খতম।

শুনে চুপ করে আছি এমন সময় কর্তা আবার বললেন : আভিসে দেখনে পড়েগা হিস্যাসে জায়দা না খিঁচে···আপকা কেয়া রায়?

আমি আর কি রায় দেব! বাপছেলের ব্যাপার—আবার একমাত্র পুত্র। চুপ করেই রইলাম। কর্তা তখন ঘোষণা করলেন : হিসাব পাই পাই করকে চুকায় দুংগা, লেকিন বকশিশ এক নয়াভি নেহি।

হিসাব পাই পাই সম্পূর্ণ আইনগত ব্যাপার। তবে এর মধ্যে ন্যায়নীতিও আছে।

এই ন্যায়নীতির একটা বিবরণ শুনেছিলাম প্রয়াত প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শীতলাচরণ সেনগুপ্ত ওরফে চুনিবাবুর মুখ থেকে। ঘটনাটি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

প্রথম জীবনে চুনিবাবু অন্যান্য অনেকের মতই গৃহশিক্ষকতা করতেন—ছাত্র (বা ছাত্রীর) গৃহে গিয়ে নয়, নিজগৃহে মাদুর-চেটাই পেতেও নয়—তাঁর নিজেরই অফিসে। তিনি ছিলেন একজন রেজিস্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট[২] এবং এক অডিট ফার্মের অংশীদার।

একদিন এক মাড়োয়ারী ছেলে তাঁর কাছে এল পড়বার জন্যে। —ভালো কথা,—চুনিবাবু জানালেন,—তিনি ছাত্রপিছু মাসিক দেড়শ টাকা করে নেন, এবং টাকাটা প্রতি মাসের ১লা তারিখে অগ্রিম দেয়।

—অগ্রিম কেন?—ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে।

—অগ্রিম এইজন্যে যে অনেকেই টাকা না দিয়ে কেটে পড়ে,—

১· ন্যায্য অংশ—হিসাবমত পাওনা

২· রেজিস্টার্ড অ্যাকাউন্যান্ট—R.A. বা, আরও সংক্ষেপভাবে বলতে গেলে, G.D.A. RA. পরে আইনের পরিবর্তনের ফলে এঁরা চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট আখ্যা পান।

চুনিবাবু ব্যাখ্যা করেন।

—রাইট,—ভাবী ছাত্রটি চুনিবাবুর যুক্তি অনুমোদন করে, কিন্তু তারপরেই করে নিজের যুক্তির অবতারণা : আপনিই যে অগ্রিম টাকা নিয়ে পড়াবেন তার নিশ্চয়তা কি ? আজ হয়তো বলবেন, 'শরীর খারাপ', পরের দিন হয়তো অফিসেই থাকবেন না, তার পরের দিন হয়তো···।

বাধা দিয়ে এবার চুনিবাবুই বলেন, 'রাইট', এবং তারপর উত্থাপন করেন ঐ জটিল ন্যায়ের প্রশ্নের মীমাংসার সূত্র : ধর যদি এইরকম করা যায়—আমি মাসে ১০ দিন পড়াব, আর নেব মাসে ১৫০ টাকা করে[১]। তাহলে দিনপিছু হলো ১৫ টাকা। তুমি প্রতিদিন পড়তে বসে ১৫টি টাকা টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রাখবে। পড়ানো শেষ হলে তাতে আমার অধিকার বর্তাবে—তখন আমি তা তুলে নেব। আর যদি তুমি কোনদিন না আসতে পার, আর আমাকে বসে থাকতে হয় তবে পরের দিন দ্বিগুণ টাকা নিয়ে আসবে। অপরপক্ষে তুমি যদি এসে ফিরে যাও তখন পরের দিন আমি 'ফি' নেব না। হ্যাঁ, পড়াব দেড় ঘণ্টা—কমবেশি।

—রাইট। পারফেক্ট অ্যারেঞ্জমেণ্ট, স্যার—ছেলেটি যুক্তিসংগত ব্যবস্হাটি সম্পূর্ণ মেনে নেয়।

পড়ানো চালু হয়। ছেলেটি চুক্তিমতই কাজ করে—পড়তে বসেই ১৫টি টাকা টেবিলের মাঝখানে পেপার-ওয়েট্ চাপা দিয়ে রেখে দেয়। পড়ানো শেষ হলেই চুনিবাবু তা (বোধহয় ছোঁ মেরেই) তুলে নেন।

একদিন তাই করতে যাচ্ছেন এমন সময় ছেলেছি তাঁকে বাধা দিয়ে বলল : Ten minutes still left, sir.

—তাতে কি হয়েছে—ঐ চ্যাপটারটা ত' শেষ হয়ে গেছে!—চুনিবাবু প্রতিবাদ না করে পারেন না।

—Contract is contract, sir.—ছেলেটি জোর গলাতেই বলে,—You will be entitled to that sum after ten minutes—now nine minutes, sir.

চুক্তির শর্ত মেনে নিয়ে চুনিবাবু হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বসে

১. তখনকার দিনে বিরাট টাকা।

থাকেন ৯ মিনিট অতিক্রান্ত হবার জন্যে।

এটা যদি ন্যায়শাস্ত্রের ব্যাপার হয় তবে পরেরটা হলো অন্যায়-শাস্ত্রের কাহিনী। এবার কেন্দ্রবিন্দু আরেক জন অধ্যাপক—প্রয়াত সুধাংশুকুমার গুপ্ত। এটাও তাঁর নিজের মুখ থেকে শোনা।

গুপ্ত মশায় ছিলেন ইংরেজীর অধ্যাপক, এবং তখনকার দিনে স্কুলকলেজে ইংরেজীর দাম ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মাস দুই আগে দু-জন মাড়োয়ারী ছাত্র গুপ্ত মশায়ের কাছে এসে জানালো যে তারা তাঁর কাছে পড়তে চায়।

—আমার বাড়িতে, না তোমাদের কারও বাড়িতে?—জিজ্ঞাসা করলেন গুপ্ত মশায়—তিনি ছিলেন উভচর।

ছেলেদুটির একজনের বাড়িতে পড়ানোই ঠিক হলো। পারিশ্রমিক নিয়ে কোন দরাদরি হলো না। মাত্র দু-মাস সময় বলে স্বাভাবিকভাবেই রেট একটু বেশি হলো।

পড়াতে গিয়ে গুপ্ত মশায় দেখেন পড়ার ঘরের একটু অদ্ভুত ব্যবস্থা—ছোট্ট পড়ার ঘর কিন্তু তাই-ই পার্টিসান করা। পার্টিসান ব্যবস্থা আবার একরকম উদ্ভাবিত প্রকৃতির—ঘরের মধ্যে তার দিয়ে তা থেকে সাদা চাদর ঝুলিয়ে বাচ্চাদের থিয়েটারের পর্দার মত। কিছুটা অস্বাভাবিকতা সন্দেহ করলেও গুপ্ত মশায় ব্যাপারটা প্রথম দিন ঠিক বুঝতে পারেন নি—পেরেছিলেন দ্বিতীয় দিন।

পড়বার সময় ছেলে দুটি বারবার গুপ্ত মশায়কে বলত : এ লিট্‌ল লাউডার, স্যার। ছোট ঘর, ছেলে দুটি পাশাপাশিই দু-হাত দূরে বসে, তবুও চেঁচিয়ে বলবার হেতু কি? ছেলে দুটোর কেউ কম শোনে বলেও ত মনে হলো না!

দ্বিতীয় দিনে গুপ্ত মশায় পড়াচ্ছেন এমন সময় পর্দার ও-পাশে এক হাঁচি, এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্দার পেছন থেকে একজনের ধমক : ইডিয়ট, ছিক্ কর দিয়া।

হতবাক গুপ্ত মশায় ছেলে দুটির মুখের দিকে তাকান। দুটি ছেলেই যেন বিভ্রান্ত।

নীরব প্রশ্নের কোন উত্তর না পেয়ে গুপ্ত মশায় উঠে দাঁড়ান, এগিয়ে যান পর্দার দিকে। হতভম্ব ছেলে দুটিও কোন বাধা দেয় না।

পর্দা সরিয়ে গুপ্ত মশায় দেখেন সেখানে একটা টি-পয় গোছের টেবিলের দু-পাশে আরও দুটি ছেলে বসে—টেবিলের ওপর দু-খানা খোলা খাতা। গুপ্ত মশায় বোঝেন, ঐ ছেলে দুটিও তাঁর পড়ানো শুনছিল এবং তা থেকে নোট করছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম : তারপর আপনি কী করলেন?

—আমি আর কী করব! রয়েই গেলাম,—জবাব দিলেন গুপ্ত মশায়,—তবে রেটটা একটু বাড়িয়ে দিলাম।

এরপর আমার প্রশ্ন ছিল : এতটা অন্যায় এত সামান্যতে মিটিয়ে নিলেন?

অন্যায়টা কি আমাদেরও নয়?—প্রতিপ্রশ্ন রেখেছিলেন গুপ্ত মশায়,—আমাদেরও কি প্রাইভেট পড়ানো আইনসঙ্গত—ন্যায়সঙ্গত?

অন্যায়শাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এরকম সত্যার্থপ্রকাশের দৃষ্টান্ত আর আমার মনে পড়ে না।

তবে মনে পড়ল রামচন্দ্রজীর সেই প্রশ্নাকারে উত্থাপিত অভিযোগ : উল্‌টা-ফুল্‌টা—ব্লেক কৌন্‌ নেহি করতা—ডক্টর সাহাব নেহি করতা, উকিল সাহাব নেহি করতা, আপ টীচার লোগ নেহি করতা?···

(৭) **ইকনমি** : পণ্ডিতরা অর্থনৈতিক কাজকর্মের দুটি লক্ষ্য নির্দেশ করে থাকেন : ব্যয়সংক্ষেপ ও নির্বাচন—ইকনমি ও চয়েস। ব্যয়সংক্ষেপ বলতে বোঝায় অপচয় পরিহার করে উৎপাদনের উপকরণ-গুলোকে যথাসম্ভব সুপ্রচুর করে তোলা, এবং নির্বাচনের অর্থ হলো এইভাবে সুপ্রচুর বানানো উপকরণগুলোর যথাযোগ্য নিয়োগ। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায় : অপ্রচুর মূলধনকে যথাসম্ভব সুপ্রচুর করা, এবং ঐ সুপ্রচুর-কৃত মূলধনকে ঠিকমত কাজে লাগানো।

এ দুটি লক্ষ্য সার্থকভাবে সাধন করা মাড়োয়ারীদের কুলধর্মের অংগীভূত—শুধু ব্যবসাবাণিজ্যে নয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রাতেও। প্রমাণ চান? তবে শুনুন সেই কম্বল-উম্বলের কথা।

কাঁথাকে, বিশেষ করে শিশুর কাঁথাকে যে কম্বল বলে, সে-ধারণা আগে ছিল না, ধারণা হলো একটা নার্সিং হোমে,—বা আরও

সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, একটা সাধারণ মেটারনিটি হোম বা প্রসূতি-সদনে।

যেখানে আমি গিয়েছিলাম সদ্য-প্রসূতি আমার এক আত্মীয়াকে দেখতে। ভিজিটিং আওয়ার তখনও শুরু হয়নি বলে ভিজিটার্স কর্ণারে অপেক্ষা করছিলাম। কিছুটা দূরে দাঁড়ানো দুটি যুবকের মধ্যে কথাবার্তা কানে আসছিল। তাদের একজন বাঙালী, অপরজন অবাঙালী—মাড়োয়ারী বলেই মনে হয়েছিল। তবে সেও মোটামুটি ভালই বাংলা বলে দেখলাম। বাঙালী ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল : তোমার স্ত্রীর কি হয়েছে বললে?

—ফ্যালোপিয়ান টিউবে সিস্ট।

—অপারেশনের পরে কেমন আছে?

—বুঝতে পারছিনা, whether the pregnancy can be saved.

—প্রেগ্‌ন্যান্সী!—বাঙালী ছেলেটিকে খুবই বিস্মিত মনে হলো,—বল কি জৈন?

জৈন আমতা আমতা করতে লাগল এবং তাতে বাঙালী ছেলেটি চটে গিয়ে একেবারে সংকোচহীন হয়ে উঠল : তোমার ছেলের বয়স মাত্র এক বছর, এর মধ্যে আবার প্রেগ্‌ন্যান্সী—একটুও আক্কেল-বিবেচনা নেই তোমার!

জৈন এবার মিশ্র ভাষায় কৈফিয়ত দিতে শুরু করল : We thought একটার কম্বল-উম্বল আর একটার কাজে লাগবে।…

—কম্বল-উম্বল! কি বলতে চাও তুমি?

—I mean প্রথমটার কম্বল-উম্বল দিয়েই…।

বাঙালী ছেলেটি ফেটে পড়ল : কম্বল-উম্বল দিয়ে!…কাঁথার হিসেব করতে গিয়ে বৌটাকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা!…

এমন সময় পড়ল ঘণ্টা—ভিজিটিং আওয়ার শুরু হওয়ার সংকেত। ছেলে দুটির সংলাপে ছেদ পড়ল—দু-জনেই একসঙ্গে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। বাকী আমরাও তাদের পেছনে পেছনে ভেতরে ঢুকলাম। ঢোকার সময় একজনের উক্তি কানে এল : হিসেব বটে। কাঁথার হিসেব…বেশ বলেছে ছোকরা। আর একজন সঙ্গে সঙ্গেই মন্তব্য করলেন : হবে না, হিসেবী জাত! ওরা

কাঠের দামের হিসেব করে তবে চিতেয় ওঠবার জন্যে তৈরি হয়।

এটা নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তি, কিন্তু ব্যয়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা এবং স্বল্প পুঁজির যথাযোগ্য নিয়োগের ব্যাপারে মাড়োয়ারীদের জুড়ি মেলা ভার।

বাগবাজারের ছোট ফ্ল্যাট ছেড়ে একটু বড় ফ্ল্যাটের খোঁজ করছিলাম। খোঁজও পেলাম পার্ক সার্কাস অঞ্চলে। নির্মাণকার্য প্রায় সমাপ্ত হয়ে হস্তান্তরের উপযোগী ফ্ল্যাট—দু-এক মাসের মধ্যেই গৃহপ্রবেশ সম্ভব। দামও যুক্তিসংগত।

খবরটা শুনে শ্রীকেদার বুবনাও আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন—তাঁরও ভবানীপুরের ছোট ফ্ল্যাটে মোটেই কুলুচ্ছে না, বিশেষ করে বড় ছেলের শাদি দেবার পর।

দু-জনে গিয়ে ফ্ল্যাটগুলো দেখলাম, পছন্দ করে নেবার ইচ্ছেও প্রকাশ করে এলাম। পরদিনই নামমাত্র টাকা অগ্রিম দেওয়ার কথা।

পরদিন ঠিক সময়েই বুবনাজী এলেন, কিন্তু জানালেন তিনি ফ্ল্যাট নেবেন না—আমি যেন তাঁর হয়ে প্রমোটারদের কাছ থেকে ছমা[১] চেয়ে নিই।

জিজ্ঞাসা করলাম : নেবেন না কেন? ফ্ল্যাট ত ভালই—আমাদের পছন্দমত। উপরন্তু দাম মোটেই বেশি নয়।

—রুপেয়া ফ্ল্যাটমে লাগানা ভুল,—বুবনাজী উত্তর দিলেন।

—বাত এইসি হ্যায়,—বুবনাজী ব্যাখ্যা করে চললেন,—আভি যো কিরায়ামে ময়লোগ হ্যায় উসকি কেপিট্যাল ভেলু[২] পচিশ হাজারের জায়দা হোবেনা। বলতে গেলে, মুফতেই আছি। ঐ পচিশ হাজার টাকা মার্কেটে লাগিয়ে বাকী রুপেয়া বিজনিসে ঢালাই ভাল—কেপিটাল খতম করকে ফ্ল্যাট লেনা বেওকুফি হ্যায়।

—কিন্তু আপনার যে ছোট ফ্ল্যাটে কুলুচ্ছেনা বলেছিলেন?

—কেয়া করুংগা? বড় কামরামে লকড়ীকা পার্টিসান কর লুংগা।
—জবাব দিয়েছিলেন কেদার বুবনা।

শুনেছিলাম মাস কয়েক মাস পরে ভবানীপুরের সেই ভাড়ার

১ ক্ষমা
২ ক্যাপিটালাইজড ভ্যালু

ফ্ল্যাটটাই বুবনাজী কিনে নিয়েছেন। নিশ্চয়ই পাঁচিশ হাজারের কাছাকাছি টাকাতেই! আর কেনার পরই ফ্ল্যাটটা বেচে দিয়েছেন অনেক বেশি দামে। খালি করে দিলে ফ্ল্যাটের দাম ত উঠবেই। তখন বেশি টাকায় একটা বড় ফ্ল্যাট কেনায় কোন অসুবিধা নেই— ক্যাপিটাল ত বিশেষ খতম হবেনা। বুবনাজী তাই করেছিলেন। সার্থক ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি একেই বলে।

দেবীলাল ছাপারিয়ার পরিবারের সভ্যসংখ্যা একটু বেশি—তিন লেড়কা, চার লেড়কী, দুটির অবশ্য শাদি হয়ে গেছে—এবং নিজে ও (প্রথম সন্তান) পারওতীকী[১] মা। তিন লেড়কার মধ্যে একজন বিবাহিত। যাই হোক, অন্তত চারখানা শয়নকক্ষ না হলে চলে না।

ওঁদের পাশাপাশি দুটি ফ্ল্যাটে চারখানি শয়নকক্ষই ছিল।

একদিন গিয়ে দেখি একখানা ফ্ল্যাট বিক্রি হয়ে গেছে, কিনেছেন সামনের ফ্ল্যাটের মালিক শ্রীহরিবাবু রুইয়া। একখানি ফ্ল্যাটে তাঁর বৃহৎ পরিবার নিয়ে আছেন ছাপারিয়াজী। লবি বলতে কিছুই নেই। ডাইনিং স্পেসের চেয়ার-টেবিল সব সরে গেছে।

ছাপারিয়াজীকে কিন্তু কোন রকম বিমর্ষ বা বিচলিত দেখলাম না! কথায় কথায় সবই প্রকাশ পেল—

হঠাৎ ছাপারিয়াজীর সামনে একটা দাঁও এসে গিয়েছিল, কিন্তু টাকার অভাব। ঐ রকম দাঁওয়ে ব্যাংক টাকা দেয় না, বাজার থেকেও কর্জ পাওয়া মুশকিল। তখন তিনি দিলেন একখানা ফ্ল্যাট বেচে। জোকিম[২] নিয়ে টাকাটা লাগালেন! এখন দেখা যাক কি হয়!···

ভালই হয়েছিল—তিন মাসের মধ্যে নাফা সমেত টাকাটা উঠে এসেছিল। কিন্তু এত ছোট ফ্ল্যাটে ত' চিরদিন থাকা চলে না। তাই তিনি বড় ফ্ল্যাটের খোঁজ করছেন, অন্যত্র হলেও আপত্তি নেই।

না, ছাপারিয়াজীকে অন্যত্র যেতে হয়নি, সেই বহুতল বাড়িতেই তিনি তিন কামরার বড় একখানা ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন। লাগোয়া না হলেও খুব একটা অসুবিধে হয়নি। ছোট ফ্ল্যাটটি বিবাহিত ও

১. পার্বতী
১. ঝুঁকি

অবিবাহিত পুত্রদের শয়নের জন্যে ছেড়ে দিয়ে তিনি স্ত্রী ও তিন কন্যা-সহ চলে গেছেন নতুন বড় ফ্ল্যাটে। সেখানেই খাওয়াদাওয়া পুজার্চনার ব্যবস্থা।

দেখলাম, সেখানে লবি আবার সুসজ্জিত, ডাইনিং স্পেসে চেয়ার-টেবিলও ঠিকমত এসে গেছে।

তুলাদণ্ড : গদি স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রীহরিনাম বাফনা—কটন স্ট্রীট থেকে সীনাগগ স্ট্রীটে। আবার শুধু গদি স্থানান্তরই নয়, গদিকে অফিসে রূপান্তরের ব্যবস্থাও করেছেন—গদির বদলে চেয়ার-টেবিলেরও বন্দোবস্ত করে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য দু'খানা শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষও থাকবে—একখানা নিজের, অপরখানা ছেলের জন্যে। গদি অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়নি, তা হবে গুদাম-ঘর। সেখানেও টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা, তবে সংখ্যায় কম এবং কিছুটা খেলো।

মুশকিল বাঁধল গদিখানাকে নিয়ে। ছেলে নির্দেশ দিয়েছিল : গদ্দা বেচ দেও—যো মিলে সো মিলে।

শুনে কর্তা বললেন : নেহি—নেহি বেচুংগা···ঐ গদ্দাসে ফিন কুর্সিকা কুসান বানায় লুংগা।···

শেষ পর্যন্ত তাই হলো—ঐ গদির ছোবড়া-তুলো দিয়ে নতুন অফিসের কুর্সির সাজসজ্জা হলো, আর গদির ফ্রেমের কাঠ লাগানো হলো অন্য কাজে। ছেলে নাকি এতে মন্তব্য করেছিল : ইসিসে লুকসানই হুয়া।

—লুকসান কিসিকা ?

—কেঁও, হামলোগকো।

—নেহি ভেইয়া,[১]—জানিয়েছিলেন হরিরামজী বাফনা,—লুকসান উনিকো হুয়া যো ছকলায়কে গদ্দিঠো লেনেকো লিয়ে চেষ্টা কিয়া।

শুনেছিলাম অফিসেরই একজন কর্মচারী বাফনাজীর ছেলেকে পটিয়ে নামমাত্র দামে গদিটা কিনে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই ভদ্রলোক যদি দাম একটু বেশি কবুল করতেন তাহলে বাফনাজী

১. স্মর্তব্য : ছেলেকেও ওঁরা 'ভেইয়া' বলে সম্বোধন করে থাকেন।

হয়তো তাঁকেই গদি বিক্রি করতে রাজী হতেন।

অন্য এক প্রসংগে বাফনাজীই উক্তি করেছিলেন : কেপিটাল বাড়ানেকো লিয়ে পাই পাই জোড়নে পড়তা—এক নয়া কমতি হোনেসে কুলমিলায়কে এক নয়া কমিই হোগা।

(৮) নারী বিবর্জিতা : প্রাচীন জীবনবেদের অন্যতম নীতি হলো নারীকে বর্জন করেই যাত্রাপথে চল। প্রবীন মাড়োয়ারীদের বিধান হলো ব্যবসায়ে নারীর উপস্থিতি পরিহার কর। স্ত্রী-স্বাধীনতা ও নারী-কর্তৃত্বের ক্ষেত্র গৃহস্থালির মধ্যে—কামাইকো জাগামে নেহি।

এই দৃষ্টিভংগির প্রতি বর্তমান প্রজন্মের মোটেই শ্রদ্ধা নেই, বরং আছে বিরোধিতার ভাব। ফলে প্রায়ই বাধে দুই প্রজন্মের মধ্যে সংঘাত। এমনি এক সংঘাতের কাহিনী—

—আমাকে নেবার জন্যে গাড়ি একটু আগেই এসেছিল—ইণ্টারভ্যু বেলা ১২ টায়। গাড়ির কাছে এসে দেখি তাতে প্যারেলাল পচিশিয়াজী নিজেই বসে। হয়তো গাড়ির কিছুটা অভাব ছিল, কিংবা হয়তো প্যারেলালজী ভেবেছিলেন আলাদা গাড়ি না পাঠিয়ে একটু ঘুরে আমাকে তুলে নিয়েই অফিসে যাবেন। ইকনমির ব্যাপার আর কি!

গাড়িটা যেখানে থেমেছিল তার পাশেই পোতা হচ্ছিল এক নলকূপ। শ্রমিকরা তাদের স্বভাবমত গান গেয়েই পাইপ পুতছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল মূল গায়েন, আর সব দোহার। তখন তারা শেষের চরণটিরই ধুয়ো ধরেছিল। আমি ওঠার পর গাড়ি স্টার্ট দিতে যাবে এমন সময় প্যারেলালজী ড্রাইভারকে রুকতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশের কারণ বুঝলাম না।…

ব্যাখ্যা পেলাম কয়েক সেকেণ্ড পরে। ড্রাইভার চলবার আদেশ পাবার পর আমাকে দ্বিবিধ প্রশ্ন করলেন প্যারেলালজী : মজদুর লোগকো গানা শুনা? মতলব সমঝা?

গানের কলিটা এখনও মনে আছে—

> আজকে আমি সকাল সকাল যাব ওখানে,
> আমার বধু বসে আছে চায়ের দোকানে।…

এই গানের মধ্যে শ্রীপ্যারেলাল পাচিশিয়া কি মতলব পেলেন জানি না। বললাম, গানা ত' শুনা, লেকিন মতলব নেহি সমঝা।

—মতলব এহি হ্যায়,—ব্যাখ্যা করলেন প্যারেলালজী : ঐ গানা-গায়েবালা মজদুরের ছোকরী কোন চায়ের দোকানে বসে তার দয়িতের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাই ছোকরা কাজ ছেড়ে তুরন্ত সেখানেই যেতে চায়।

ঐ সস্তা ফোক সংগীতের যে এত গূঢ় তাৎপর্য থাকতে পারে তা আগে বুঝিনি। এখন বুঝলাম। কিন্তু বর্তমানে এর প্রসঙ্গ কোথায়?

তার ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল—

নতুন কম্প্যুটারের কাজের জন্যে দুটি মেয়েকে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে আজই ইন্টারভ্যু—সকাল ১২টায়। সঙ্গে সঙ্গে বড়া লেড়কাও জিদ ধরেছে তার এক লেডি পার্সোনাল স্টেনো রাখবার জন্যে। ইন্টারভ্যুয়ে যে-সব মেয়ের আসবার কথা তাদের মধ্যেই স্টেনোগ্রাফি জানা দু-তিন জন আছে। লেড়কার ইচ্ছে তাদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নেওয়া।···প্যারেলালজী তা হতে দিতে চান না, এবং চান তাঁর ইচ্ছাপূরণে আমি যেন তাঁর সহায়তা করি।

—কীভাবে?

—আপ্‌ভি ত' ইন্টারভ্যুমে বৈঠেগা। সব কোইকো নাট দিজিয়েগা—বলিয়ে কোই ফিট নেহি হ্যায়।

এতক্ষণে মতলব বুঝলাম।

ইন্টারভ্যু শেষ হবার পর প্যারেলালজীর চেম্বারে এসে বসলাম। তাঁকে জানালাম কম্প্যুটারের জন্যে দুটি ভালই মেয়ে পাওয়া গেছে কিন্তু স্টেনোর কাজের জন্যে কাউকেই পছন্দ হয়নি।

শুনে প্যারেলালজী খুব খুশি, তবে নিশ্চিন্ত নন। জিজ্ঞাসা করলেন, আবার ছাপায়[১] বিজ্ঞাপন দেবে না ত?

জানালাম, আবার কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে আমি কী করব?

—আপনাকে এই খতরা-বন্দোবস্ত[২] রুকতেই হবে—প্যারেলালজীর আবেদন ঐকান্তিক হয়ে উঠল। সামান্য যতির পর তিনি

১. সংবাদপত্রে

২. বিপজ্জনক ব্যবস্থা

যুক্তিরও অবতারণা করলেন : আপকা ইস্টুডেন্ট থা, আপকা বাত জরুর শুনেগা।

—হয়তো শুনবে, কিন্তু আমি বলব কী?

—আপ সমঝাইয়ে, লেডি স্টেনোসে খতরা হ্যায়।

—কীরকম খতরা?

—তব শুন লিজিয়ে,—শুরু করলেন শ্রীপ্যারেলাল পচিশিয়া—

—আপ শেঠ মানেকচাঁদ মোহতাকা নাম জরুর শুনা হোগা। উনিকো কহানী।···

—শেঠ মানেকচাঁদ নিজের প্রচেষ্টাতেই স্বনামধন্য হয়েছিলেন— ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিলেন তাঁর শিল্প-সাম্রাজ্য—দো-তিন জুট মিল, কয়ঠো মাইকা মাইন,···চা-বাগিচা···আওর কেয়া কেয়া সব।···

—বুড়ো বয়সে শেঠ মানেকচাঁদজীকো বিমারি পাকড় লিয়া।···

—বিমারি!

আমার বিস্ময়ের উত্তরে প্যারেলালজী জোরের সঙ্গে পুনরাবৃত্তিই করলেন : হাঁ, বিমারি!—তারপর একটু থেমে অগ্রসর বলেন : কোই খুবসুরুত ছোকরীকী লেডি সিক্রিটারি রাখ লিয়া···

—তারপর?

—উসিকা বাদ লেড়কীকী সাথ মজা লেনা চালু কর দিয়া। ···কয় মাহিনা পর ছোকরী কাম ছোড় দিয়া···লেকিন শেঠকো আদত বিগাড়নেকো বাদ।···

—তারপর আর শেঠ মানেকচাঁদের লেডি সিক্রিটারি না হলে চলে না—একটা যায়, একটা আসে। তারপর একটাতেও কুলোয় না।·· দালাল লোগকো মউকা মিল গয়া—তারা বাজারসে সাজিয়ে গুজিয়ে আওরত এনে হাজির করে। শেঠের কিন্তু তাদের সবসময় পছন্দ হয় না। তখন দালালদের একজন এক নতুন মতলব ঠাওরালো—

—বড় রাস্তার ওপর শেঠ মানেকচাঁদ মোহতার অফিস-বাড়ি, আর চারতলায় রাস্তায় দিকে তাঁর চেম্বার।···সেই দালাল একদিন হন্তদন্ত হয়ে শেঠের চেম্বারে ঢুকে একেবারে তাঁর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কানে কানে কি বলল। ঘরে যে দু-তিনজন করমচারি ইত্যাদি ছিল শেঠ তাদের চলে যেতে বলে দালালের সঙ্গে

রাস্তার ধারের খোলা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।—হ্যাঁ, সত্যিই ত' নিচে খুবসুরত এক লেড়কী বস্ ধরার জন্যেই জানলার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে!... শেঠ নির্দেশ দিলেন: পইসাকো কোই পরোয়া নেহি—ওহি লেড়কীঠী চাইয়ে।...

ক্রমে ওহি কাম অন্যান্য দালালরাও শিখে নিল...প্রায় রোজই একটি করে ছোকরী এসে ঐ একই জায়গায় বস্ পাকড়াবার জন্যে দাঁড়ায় এবং সংশ্লিষ্ট দালাল জানলার ধারে নিয়ে গিয়ে শেঠকে দেখায়...কিছুটা দৃষ্টিহীন শেঠের কাছে সবাই মনে হয় সমুন্দর কা সুন্দরী।

—শেষ পর্যন্ত সুন্দরীদের জন্যে শেঠের প্রায় সবই গেল... প্রথমে বিক্রি হলো জুট মিল দুটো, তারপর বোধহয় মাইকা মাইন ...উসকা বাদ শেঠেরই ইন্তেকাল হয়ে গেল। নইলে হয়তো সবই যেত।...

কাহিনী শোনার পর আমি প্যারেলালজীকে বললাম: আপনি অতো ভাবছেন কেন—সবাইকি শেঠ মানেকচাঁদের মত হয়?...

—নেহি বাবু,—মাঝপথেই আমাকে রুকে দেন প্যারেলালজী এবং প্রশ্ন করেন: ইলাজকা পইলে রুকনা ঠিক হ্যায় না?—তারপর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আমার ডানদিকে কিন্তু তাঁর বাঁদিকে কাঠের পার্টিসান-দেয়ালে বিলম্বিত ১০টি মহাজন-বচনের দিকে, যার প্রথমটি হলো—Prevention is always better than cure.

শেষ পর্যন্ত প্যারেলালজী অবশ্য প্রতিরোধে সমর্থ হন নি—ছেলের চাপে তার জন্যেই একজন মহিলা স্টেনো রাখার অনুমতি তাঁকে দিতে হয়েছিল, একজন মহিলা রিসেপসানিস্ট এবং একজন মহিলা অপারেটরও। ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। অফিসের অন্যান্য অংশ ছিল প্রমীলা-শূন্য।

কারণ বোধহয় নারীসঙ্গের সংক্রামণ-ভীতি নয়, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। এবং তা শুধু প্যারেলালজীরই নয়, মোটামুটি মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের সবারই কর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছিলেন শ্যামলাল লোহিয়াজী। নারী-নিয়োগের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি-তালিকা ছিল এইরকম:

(১) কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া মেয়েদের কর্মক্ষমতা কম। (২) অফিসের মধ্যে নারী-কর্মীর উপস্থিতি পুরুষ-কর্মীদের অনেকেরই কর্মক্ষমতা হ্রাস করে—ব্যাঙ্কমে দেখা নেই কেইস্যা রঙ্গ-শালা বন গিয়া। (৩) নারী-কর্মীরা বেশি ছুটি নেন—মেটারনিটি লিভের কথাই ধরুন না কেন।

তবে কয়েক ক্ষেত্রে নারী-কর্মী যে বেশি উপযোগী তাতে সন্দেহ নেই,—স্বীকার করেছিলেন শ্যামলালজী,—যেমন চা-পাতা তোলা, কাপড়-জামায় বুটি তোলা—এবং কভি কভি টাইপিস্টকা কাম ভি।

যেখানে নারী-কর্মীর উপযোগ বেশি সেখানে ওদের নিয়োগের ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে। মজদুরিভি কামকা মাফিক হ্যায়। কান-স্ট্রাকসন্‌মে এক মরদানা বিশ ইটা উঠায়কে লে যায়গা, লেকিন জেনানা লেবার বারাসে জায়দা লেনে নেহি সেকেঙ্গী। সমান মজুরি কি করে দেওয়া যাবে?...কানুন বলে সমান কাজের জন্যে সমান মজুরি—ঠিক হ্যায়। লেকিন কাম কি একই হ্যায়?

অনেক রকম ফেরি করার ক্ষেত্রে অবশ্য মেয়েদের কাছ থেকে বেশি ও ভাল কাজ পাওয়া যায়। তাই সেসব ক্ষেত্রে তাদের নিয়োগের পরিমাণও বেশি, একচেটিয়া প্রকৃতিরও বলা যায়।

শাড়ি-সমাচার : ব্যবসা থেকে 'অবসর গ্রহণের' পর শ্যামলালজী তাঁর ফ্ল্যাট থেকে 'কোটা' শাড়ির নতুন কারবার খুলেছিলেন। বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলাম : রিটায়ার করনেকো বাদ আপ ফিন কামমে লাগ গিয়া!

—আউর কেয়া করুঙ্গা,—জবাব দিয়েছিলেন শ্যামলালজী,—ঘরমে বৈঠকর লেড়কা লোগোকো রোটি খায়ুঙ্গা আওর ঘরওয়ালীকী সাথ আপোসমে লড়ুঙ্গা?

মাস কয়েক পরে শুনি শ্যামলালজীর কারবার বেশ জমে উঠেছে। এক রবিবার গেলাম তাঁর ফ্ল্যাটে। গিয়ে দেখি একেবারে প্রমীলার রাজত্ব—আট-দশ জন মেয়ে শাড়ি নাড়াচাড়া করছে, গোছাচ্ছে, খাতায় কি সব লিখছে—আর বৃদ্ধ শ্যামলালজী এককোণে একটা টুলের ওপর চুপ করে বসে আছেন।

—ময় থোড়াদের বাদমে আতা হুঁ, বলে শ্যামলালজী আমাকে

নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেয়া সমাচার ?

সমাচার জ্ঞাত করালাম : আপনার কোটা শাড়ির দু-একখানা হয়তো বাড়িতে নিতে পারে। তাই…

—খুব ভালো কোথা,—জানালেন শ্যামলালজী,—আপকা যেতনা খুশি পছন্দকো লিয়ে লে যাইয়ে।…গাড়িমে আয়া ?

জানালাম : না, গাড়িতে আসিনি। রবিবার ড্রাইভারের ছুটি।

—তব ময় ভেজ দুঙ্গা। যো পছন্দ হোগা রাখ দিজিয়েগা। বাকি লেড়কী লোগই ওয়াপিস লে আয়গী। ভাও-এর কোথা পোরে হোবে।

ধন্যবাদ জানিয়ে চলে আসার আগে যে কথাটা মনের মধ্যে উঁকি মারছিল তা মন্তব্যাকারে প্রকাশ না করে পারলাম না : বহুৎ লেড়কী রাখ দিয়া দেখতা হুঁ !

—কেয়া কিয়া যায়গা ?—প্রশ্নাকারে উক্তি করলেন শ্যামলালজী, —শাড়ি বেচনা ত' জেনানাকীই কাম হ্যায়।…সাব কামিশনমে হ্যায়।

সেই পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথম ঘরটির সামনে করিডরে দাঁড়িয়ে শ্যামলালজী অনুচ্চস্বরে বললেন : শ্যামবাজারমে ফুটকে[১] উপর মেরা এক জানাচিনা আদমি কাটা কাপড়া বেচতা হ্যায়। ওহি আদমি তিনচার ছোকরাকো লাগায়া—ও কাম ছোকরীসে নেহি হোতা। যো কাম যিসকো হ্যায় ওহি কামমে উসিকো লাগানা চাইয়ে, মুখার্জিবাবু।…

সেদিন বিকেলেই দুটি মেয়ে দু-বাস্ক শাড়ি নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। ঠিক হিসেব করেই এসেছিল—দিবানিদ্রার পর কিন্তু টি. ভি.তে হিন্দি সিনেমা শুরু হওয়ার আগে। মেয়ে দুটিই বাঙালী।

গৃহিণী ও পুত্রবধূ দু'খানির জায়গায় পাঁচখানি শাড়ি বেছে নিলেন। স্ত্রীজাতির যা স্বভাব ! তাতে হয়তো মেয়ে দু'টির কিছুটা সেলস-ওম্যানশিপও ছিল।

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে একটা মতলব ঠাওরালাম—এখন কিছুটা দিয়ে বাকী টাকাটা পরে সহজ কিস্তিতে মিটিয়ে দেব।

১. ফুটপাতের

মতলব ভেস্তে গেল। পরের দিনই ওদের মধ্যে একটি মেয়ে ক্যাশমেমো কেটে নিয়ে এসে হাজির। তাতে দেখানো হয়েছে ডিস্কাউণ্ট ২০ শতাংশ—সত্যি সত্যি দাম কত তা অন্তর্যামীই জানেন।

দাম ও ডিসকাউণ্টের কথা নয়। অত টাকা একসঙ্গে মেটাই কি করে তাই হয়ে দাঁড়াল আমার সমস্যা। কিস্তির ক্ষীণ আশা তখনও রেখে মেয়েটিকে বললাম, আমি নিজে গিয়ে দাম মিটিয়ে দিয়ে আসব। মেয়েটি কিন্তু নাছোড়বান্দা। জানালো, তাতে তার কমিশনের হার কমে যাবে—শাড়ি গচানো আর টাকা আদায়—দুই মিলিয়েই তার পুরো কমিশন।

অগত্যা ঘরণীরই শরণাপন্ন হলাম—আমার কাছে যে পুরো টাকাটা ছিল না! অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে—দু-এক দিনের মধ্যেই ফেরত দেবার অঙ্গীকারে তাঁর কাছ থেকে বাকী টাকাটা নিয়ে মেয়েটির আনা ক্যাশমেমোর টাকা মিটিয়ে দিলাম—কিস্তির কথা দূরে থাক, দরদামেরও সুযোগ পেলাম না।

মেয়েটি চলে যাবার পর ভাবলাম, অনেক সময় শুধু বেচাতেই নয়, বিল আদায়েও মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি পারদর্শী—সর্বত্র না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সুন্দর মুখেরই জয় হয়। মাড়োয়ারী-সহ-সব ব্যবসায়ীই কর্মপদ্ধতির এই সূত্রটি ভালভাবেই জানেন—অনুসরণও করে থাকেন।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে শ্যামলালজী সুন্দর সুন্দর মুখ দেখেই নিয়োগ করেছিলেন।

Last Supper and Exodus : শনিবার বিকালে বাড়ি গিয়ে শুনলাম চিৎলাঙ্গিয়াজী—শ্রীপরশুরাম চিৎলাঙ্গিয়া ফোন করেছিলেন সেই রাত্রেই তাঁর ফ্ল্যাটে আহারের নিমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রণ নাকি ছিল সনির্বন্ধ—আমি যেন অতিঅবশ্য যাই এবং ওঁদের সঙ্গে খানা খাই। কিসের জন্যে খানার ব্যবস্থা তা কিন্তু চিৎলাঙ্গিয়াজী জানান নি।

একে শনিবার, তার ওপর আবার অতদূর—যাব কি যাব-না তাই নিয়ে দোটানায় রয়েছি এমন সময় আবার ফোন এল। এবার আমাকে পেয়ে চিৎলাঙ্গিয়াজী তাঁর অনুরোধকে ঐকান্তিক করে তুললেন :

খানামে আনেই হোগা, মুখার্জিবাবু। হোনে সেকতা, ফিন আপকো খানামে বুলানেকো চানস্ নেহি মিলেগা।…

অনুরোধের ধরন কিছুটা বিস্ময়কর এবং রহস্যপূর্ণও বটে। জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না : ভবিষ্যতে আমার খানায় বুলানোর চানস্ মিলবে না কেন ?

—আইয়ে ত। আনেসে মালুম হোগা,—জবাব দিলেন চিৎলাঙ্গিয়াজী।

কতকটা অনুরোধের প্রগাঢ়তার দরুন এবং কতকটা কৌতূহলবশেই শেষ পর্যন্ত চিৎলাঙ্গিয়াজীর ফ্ল্যাটে খানা খেতেই গিয়ে হাজির হলাম।

পেঁৗছে দেখি খানার চেয়ে অবাক ব্যাপার—জিনিসপত্র সব বাঁধাছাদা—যেন চিৎলাঙ্গিয়া-পরিবার বাইরে কোথাও যাবার জন্যে প্রস্তুত !

—কি ব্যাপার !—বিস্ময় প্রকাশ না করে পারলাম না,—কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন নাকি চিৎলাঙ্গিয়াজী—কোন তীর্থেটীর্থে ?

—আইয়ে, ভিতর চলিয়ে—সবকুছ বাতাতা হুঁ।

ভেতরে তাঁর শয়নকক্ষে আমাকে নিয়ে গেলেন চিৎলাঙ্গিয়াজী। সেখানেও সব বাঁধাছাদা, শুধু বিছানায় হাত পড়েনি।

সেই বিছানায় বসেই ব্যাপারটা জানলাম—মোটামুটি সপরিবারে পরদিনই চিৎলাঙ্গিয়াজী কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আপাতত এখানে থাকবে শুধু তাঁর বড় ছেলে বিনোদ তার বাচ্চাবাচ্চি নিয়ে। চিৎলাঙ্গিয়াজীরা যাচ্ছেন হরিয়ানার গুরগাঁওয়ে। সেখানে একটা ছোট কারখানা কিনেছেন, তাই চালাবেন ! ছোট ছেলে সমীরকে আগে—এডভান্সমে সেখানে ভেজে দিয়েছেন। বিনোদ এখানে থাকবে কোন ধান্ধার খোঁজে। গুরগাঁও-এর ছোট কারখানা থেকে এখনই পুরি ফেমিলির পরবস্তি হওয়া সম্ভব নয়। তাই বিনোদ থেকে যাচ্ছে, নিজের সংসার চালিয়ে যদি কিছু পাঠাতে পারে। তা'ছাড়া বিনোদের ছেলেমেয়ে এখানকার স্কুলে পড়ে। গুরগাঁওয়ে তেমন ইংলিশ (মিডিয়াম) স্কুল নেই, আর সীজনের এহি টাইমমে ঘুসানাভি মুশকিল হ্যায়।…আপকা পাশ এহি আনুরোধ ··

চিৎলাঙ্গিয়াজী অনুরোধ বিবৃত করার আগেই বিনোদ এসে

খবর দিল : আদবানিজী আ গিয়া।—আমাকে সঙ্গে নিয়ে চিৎলাঙ্গিয়াজী বেরিয়ে এলেন।

(ডাইনিং স্পেস সংলগ্ন) লবিতে এসে দেখলাম এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ডিনার টেবিলের পাশের চেয়ারে বসে। অভ্যর্থনার পর চিৎলাঙ্গিয়াজী একতরফাই পরিচয় করিয়ে দিলেন : ইয়ে হ্যায় কমলেশজী আদবানি—মেরা ফিনাইল ফ্যাক্টরী খরিদ লিয়া।

শুনেছিলাম চিৎলাঙ্গিয়াজী তাঁদের ফিনাইলের কারখানাটি বিক্রির চেষ্টা করছেন, কিন্তু তা যে বিক্রি হয়ে গেছে তা জানতাম না, এবং ক্রেতা যে একজন সিন্ধি তা মোটেই অনুমান করতে পারিনি।

পরিচয়-পর্ব শেষ হতে না-হতেই আদবানি সাহেব বললেন : চিৎলাঙ্গিয়াজী! ম্যয় আজ আপকো ইধার খানা খানে নেহি পায়ুঙ্গা—পাঞ্জাব ক্লাবমে এক পার্টি হ্যায়।

—বড়া আপসোসকী বাত, বলে চিৎলাঙ্গিয়াজী ভদ্রতা রক্ষা করলেন।··· 'কালই যাচ্ছেন শুনলাম', 'গুরগাঁয়ে ফ্যাক্টরী কি কেনা হয়ে গেছে?' ইত্যাদি দু'একটা মামুলি ধরনের কথা বলে এবং ফিন মিলুঙ্গার আশ্বাস দিয়ে আদবানি সাহেব বিদায় নিলেন।

মনে হলো আদবানি সাহেব চলে যাওয়াতে চিৎলাঙ্গিয়াজী যেন খানিকটা স্বস্তিবোধ করলেন।

পরে বুঝলাম আমার অনুমানই ঠিক এবং কারণটাও তখন জানলাম।

নৈশভোজনে আর কেউ আসেনি, আর আদবানি সাহেব ত' চলেই গেছেন। সুতরাং সম্পূর্ণ ঘরোয়া ব্যাপার।

ঘরোয়া নৈশভোজনের পর চিৎলাঙ্গিয়াজী আবার আমায় নিয়ে গেলেন তাঁর শয়নকক্ষে। বুঝলাম, অসমাপ্ত অনুরোধটা সমাপ্ত করবার জন্যে—বিনোদ এখানে থেকে গিয়ে চিনির দালালি করবে। চিনির কারবারের অলিগলি পাকা সড়কের সঙ্গে তার ভালই পরিচয় আছে। এই ত দো সাল পইলে চিৎলাঙ্গিয়ারা ছিলেন নর্থ বিহার শ্যাম সুগার কোম্পানীর হাফ-মালিক—পার্টনার। উয় চলা গিয়া ভেইয়াকো হিস্যামে···এখন বিনোদ চিনির দালালি করাই ঠিক করেছে···বহুত বেপারীকা বিনোদ আচ্ছাতরে জানতা, তবে মালিক লোগোকো সাথ এতনা জানাচিনা নেহি। আগে হয়তো ছিল কিন্তু

এখন তাঁরা কি পাত্তা দেবেন! তাই যদি আমি দু-এক জন মালিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—আমার সঙ্গে ত বেশ কয়েক-জনের টাচিং[১] আছে।...

চিৎলাঙ্গিয়াজী যখন তাঁর ছোট্ট অনুরোধের বিস্তারণ করছিলেন তখন আমি খানিকটা অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিলাম—ভাবছিলাম তাঁর উত্থানপতনের কথা—

বনেদি মাড়োয়ারী বংশের সন্তান তিনি—অন্তত চারপুরুষ ধরে কলকাতায় বাস। তবে পূর্বপুরুষরা ছিলেন বেপারী এবং নিজের প্রচেষ্টায় ও নিজের প্রজন্মেই চিৎলাঙ্গিয়াজী হয়েছিলেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট—বিহারে চিনিকলের অংশীদার, ভাদোহিতে নিজস্ব কার্পেট ফ্যাক্টরী, তিলজলায় সাবুনেরও এক কারখানা এবং সালকিয়ার ফিনাইলের।

একে একে সবই গেল, নিজের বাড়ি বিক্রি করে ফ্ল্যাট ভাড়া করতে হলো—শেষে ফিনাইলের কারখানাও বিক্রি হলো সিন্ধির কাছে। বিনোদই এই ফিনাইলের কারখানা দেখত। এখন সে বেকার—চিনির দালালি করতে চায়।

সংবিৎ ফিরে পেলাম চিৎলাঙ্গিয়াজীর প্রশ্নাকারে অনুরোধের পুনরুক্তিতে : কেয়া মুখার্জিবাবু, বোল দিজিয়েগা তো?

—অবশ্য। সোমবারই ফোনে দু-জনকে বলে দেব,—প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্দেশ দিলাম,—বিনোদ যেন মঙ্গলবার দিন সকালে আমার সঙ্গে দেখা করে। তারপর একটা দুঃখের কথা না বলে পারলাম না : ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকা লেড়কা দালালি করেগা! মেরা ত আচ্ছা নেহি লাগতা।

আমাকে ভুল বুঝলেন না চিৎলাঙ্গিয়াজী, বললেন : আওর কেয়া করেগা? সিন্ধিকা পাশ নোকরি?

আমাকে চিন্তা-অনুমানের অবকাশ না দিয়েই ব্যাখ্যার অবতারণা করলেন চিৎলাঙ্গিয়াজী—

বিনোদ ফিনাইল কারখানার আতিপাতি সবই জানে—সেই কারখানা চালাত। এখন কারখানা কিনে নেবার পর আদবানি সাহেব প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিনোদকে ম্যানেজার কারবার।—বলিয়ে ত'!—

১. জানাশোনা—দোস্তি

ইয়ে কভি হোনে সেকতা, না এইস্যা প্রোপোজাল কোই কভি দেনে সেকতা।… একদফে মালিক, দ্সরে দফেমে উসি জাগাপর নোক্রি? শোচিয়ে ত!

হ্যাঁ, মেনে নেওয়া কঠিন, সন্দেহ নেই। কিন্তু সিন্ধির কাছে নোকরি করার কথা তুললেন কেন?

তার ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল পরমুহূর্তেই।—কোই মারবারী (মাড়োয়ারী) অহি অফার দেনেসে শোচনেকী বাত থী,—স্বীকার করে ফেললেন চিৎলাঙ্গিয়াজী।

গোষ্ঠী-সংঘাত যে কতদূর সম্প্রসারিত হতে পারে তা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম।

অনুধাবন সুস্পষ্টতর হলো পরদিন—হাওড়া স্টেশনে। সেখানে গিয়েছিলাম চিৎলাঙ্গিয়াজীদের বিদায় জানাতে।

উপনিবেশ: চিৎলাঙ্গিয়াজীরা যাচ্ছিলেন রাজধানী এক্সপ্রেসে। ট্রেন ছাড়তে তখন মিনিট পনের দেরি। চিৎলাঙ্গিয়াজীর সঙ্গে তাঁদের টু-টায়ার স্লিপার কম্পার্টমেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে বিদায়-আলাপ করছি এমন সময় দেখি ব্রীফকেস হাতে বেশ একটু জোরেই পা চালিয়ে সামনে দিয়ে যাচ্ছেন একদা চিৎলাঙ্গিয়াজীদের ফিনাইল কারখানার বর্তমান মালিক শ্রীকমলেশ আদবানি। সঙ্গে অনুরূপ এক ব্রীফকেস হাতে আর একজন ভদ্রলোক।

চিৎলাঙ্গিয়াজীকে দেখে তাঁরা গতি একটু মন্থর করলেন মাত্র। চিৎলাঙ্গিয়াজী সঙ্গী-সহ গতিশীল আদবানি সাহেবকে প্রশ্নসূচক সম্বোধন করলেন: আপলোগোকোভি দেহ্লি যানা হ্যায়?

—হাঁ, থোড়াসে কাম পড় গিয়া।—এইটুকুতেই শেষ করে আদবানি সাহেব সঙ্গীর পিঠে হাত দিয়ে এগিয়ে গেলেন। তখন চিৎলাঙ্গিয়াজী আমায় জিজ্ঞাসা করলেন: আদবানিকা সাথ আওর যো জেনটিল্ম্যান থা উনকা আপ জানতা?

জানালাম, না—আগে কখনও দেখিনি।

—উনকা নাম হরিভাই আম্বানি—এক গুজরাতী[১]—আদিবানিকা পার্টনার,—সংবাদ পরিবেশন করলেন চিৎলাঙ্গিয়াজী। আমি

১. গুজরাটীকে মাড়োয়ারীরা গুজরাতীই বলেন।

নিরুৎসুকভাবে চুপ করে রইলাম, কিন্তু লক্ষ্য করলাম চিৎলাঙ্গিয়াজী বিড়বিড় করে কি বলছেন। তারপর তিনি উত্তেজিতই হয়ে উঠলেন—চেঁচিয়েই মনের ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন : মারবারীরাজ খতম···উয় সিন্ধি গুজরাতী কা সাথ নেহি সেকেঙ্গে,—তারপর একটু সামলে নিয়ে আমাকেই সম্বোধন করে যা বললেন তার মর্মার্থ হলো এইরকম :

—দেখেন নি ওরা চেয়ার-কারে যাচ্ছে, আর আমি—স্লিপারকা টিকিট লে লিয়া। এই আমিরি চালের দরুনই মাড়োয়ারীরা খতম হয়ে যাচ্ছে।···আর ঐ পাকিস্তানি[১] সিন্ধিরা বেড়ে চলেছে···· গুজরাতীরাও ওদের শামিল হয়ে গেছে।···

ট্রেন ছাড়ার সময় হলো। চিৎলাঙ্গিয়াজী আমার সঙ্গে বিদায়-করকম্পন করে গাড়িতে উঠলেন—গাড়ির দরজা বন্ধ হলো। আমি গেটের দিকে পা বাড়ালাম।

চারপুরুষের কর্মস্থল কলকাতা ছেড়ে শ্রীপরশুরাম চিৎলাঙ্গিয়া চললেন হরিয়ানার নতুন উপনিবেশ স্থাপনের আশায়। কলকাতার উপনিবেশ নাকি পরিপক্ক হয়ে গেছে, এখানে আবার অনুপ্রবেশ কঠিন কাজ। তা ছাড়া আছে হরিয়ানার হাতছানি—হরিয়ানা সরকার নানা সুযোগসুবিধা দিচ্ছে, যা বাংগালমে দূর অস্ত। কিন্তু ওখানেও যদি সিন্ধি-গুজরাতী গিয়ে জোটে? ব্যবসায়ে গুজরাতীরা উঠতি, আর সিন্ধিদের আছে ছিন্নমূল সম্প্রদায়ের উদ্যম—জীবনী-শক্তি। ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। যদি হরিয়ানায় হতাশ হতে হয়—তবে কি আবার চারপুরুষ বাদে ফিরে রাজস্থানে?

হরিয়ানা-রাজস্থান জাতীয় রাজপথ ত' রয়েছেই—বাসে মাত্র কিছুটা পথ—Business of businessmen is business.

১. বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সিন্ধুপ্রদেশ থেকে আগত

বদলতে ওয়ক্ত মে হমকদম

স্বনামধন্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অটোগ্রাফের সঙ্গে বাণী দিতে অনুরোধ করা হলে তিনি সাধারণত লিখতেন : "গতিই জীবন, গতির দৈন্যই মৃত্যু।" আমাকেও ছেলেবেলায় এই বাণী-সহ অটোগ্রাফ দিয়েছিলেন। পরে বড় হয়ে জেনেছিলাম এ এক সুপরিচিত দার্শনিক তত্ত্ব—জীবন কি?—এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সম্পূর্ণ উত্তর এই তত্ত্বটিতেই পাওয়া যায়। এবং জীবন বলতে ব্যক্তি-জীবন, গোষ্ঠী-জীবন, সামগ্রিক সমাজ-জীবন—সব কিছুকেই বোঝায়।

এখন প্রশ্ন হলো : মাড়োয়ারীদের, বিশেষ করে কলকাতার মাড়োয়ারীদের ক্ষেত্রে গতির দৈন্য ঘটেছে কি? গতি বলতে যদি বোঝায় অভিযোজন—adaptation তবে তা মাড়োয়ারীদের মধ্যে বিশেষ পরিস্ফুট—ঐ সম্প্রদায় সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলবারই চেষ্টা করছেন। তবে হয়তো সবাই নয়, কিন্তু যে বেশ একটা বড় অংশ তাতে সন্দেহ নেই। অপর মেরুপ্রান্তে আছেন সেই সব সনাতনী যাঁদের কাছে যুগধর্ম অধর্মেরই শামিল, এবং ধর্মই সমাজকে ধারণ করে বলে অসামাজিক কাজও বটে। আবার এই দু-এর মধ্যে আছেন তাঁরা যাঁদের বলা যায় না-ঘরকা, না-ঘাটকা—দ্য মিড্‌ল অফ দ্য রোডারস্‌। কলকাতার বাণিজ্যিক সভ্যতার মধ্যে কয়েক পুরুষ ধরে বাস করলেও এর জলহাওয়া এখনও তাঁদের ভালভাবে সয় নি।

সম্প্রদায়ের উক্ত প্রথমাংশ—যাঁরা বদলতে ওয়ক্ত হমকদম—সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলছেন তাঁরাও যুগ-পরিবর্তনকে হয় সরাসরি মেনে নিতে পারেন নি, না হয় গতিবেগে পরিবর্তনকে অনেক আগেই অতিক্রম করেছেন। তবুও কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন কোন ব্যাপারে সনাতনের ছাপ সুস্পষ্টভাবে পরিদৃশ্যমান। খাদ্য-স্বভাবের কথাই ধরা যাক না কেন।

মাড়োয়ারীরা—তা তিনি সনাতনী হোন বা জৈনীই হোন—এখনও বহুলাংশে নিরামিষাশী। বহুলাংশে বললাম এইজন্যে যে অনেকেরই ভোজ্য-তালিকায় চিকেন ও আণ্ডা ঢুকে পড়েছে, তবে ঠিক কোঠিতে নয়—ভোজনালয়ে। অনেক কোঠিতে ডিমও চালু,

বিশেষ করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমত পুষ্টিকারিতার জন্যে বাচ্চাদের আধসেদ্ধ বা কাঁচা ডিম খাওয়ানো হয়।

এই নিয়ে শ্রীগজানন মুরারকা বিশেষ মুশকিলে পড়েছিলেন। তাঁর দুই পুতির[১] পর এক পোতা[২] হয়েছে। তাঁর নিজের এক-মাত্র ছেলে। সুতরাং নবজাত পোতাই হলো তাঁর একমাত্র বংশধর। ভবিষ্যতে যে বংশধরের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটবে তারও সম্ভাবনা নেই। কারণ, (তাঁর সম্মতি নিয়েই) বহুর বন্ধ্যাত্বকরণ করানো হয়েছে।

বংশধরটি কিন্তু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নয়—রিকেটি না হলেও পাতলা-দুবলা, আর প্রায়ই অসুখে ভোগে। অ্যালোপ্যাথি, হোমিও-প্যাথি, কবিরাজি কিছুই বাদ যায় নি, তবুও কিন্তু কোন ফল হয় নি। গজাননজীর মাঝে মাঝে ভয় হয় বংশধরটি বাঁচবে ত!

অবশেষে এক বাঙালী শিশু-চিকিৎসক নির্দেশ দিলেন পথ্য-সহ খাদ্য-তালিকা পালটাতে—দৈনিক আধসেদ্ধ একটা মুরগির ডিমের কুসুম অংশটা খাওয়াতে।

শুনে গজাননজী স্তম্ভিত—এ কেইস্যা হোনে সেকতা? ঘরমে আণ্ডা ঘুসানা! মেরা বাপদাদা এইসি কাম কভি নেহি কিয়া।

ছেলে-বৌ দু'জনেই বোঝান: উপায় নেহি বাবু—মুন্নাকো জান বাঁচানেকো লিয়ে ইয়ে কাম করনাই পড়েগা।

নিরুপায় গজাননজী রাজী হলেন, কিন্তু এক শর্তে—মুন্না ভাল হলেই বাড়িতে আণ্ডা ঢোকা ফিন বন্ধ করতে হবে।

ছেলে-বৌ রাজী হলো।

এর ছ-মাস পরের ঘটনা।

দোতলা বাড়ি। একতলায় থাকতেন বিপত্নীক গজাননজী, আর দোতলায় সন্তানসন্ততি আয়া-দাইয়া নিয়ে তাঁর ছেলে-বৌ।

রবিবার দিন ছেলে-বৌ এবং তাদের দুই কন্যা একসঙ্গে দোতলার লবিতে প্রাতভোজন সারত। সেদিনও তাই করছিল। কি কারণে গজাননজী দোতলায় উঠে এসেছিলেন। দেখেন সেণ্টার টেবিলে কয়েকটা ডিম-সিদ্ধ, কয়েকটা বোধহয় ইতিমধ্যেই গন্তব্যস্থলে পেঁছে গিয়েছে।

---

১. পৌত্রী
২. পৌত্র

কিন্তু কার? তা ভাববার মনের অবস্থা অবশ্য গজাননজীর ছিল না। ধীরে ধীরে তিনি নিচে নেমে এসে বাথরুমে ঢুকে মাথায় জল দিলেন।

আমি একবার বন্ধু-সহ অতিথি হিসেবে শিবসাগরের কাছে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের চা-বাগানে গিয়েছিলাম বেড়াতে। মালিকের (মাড়োয়ারী) শ্যালকই ম্যানেজার। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সহকারী ম্যানেজারের বাংলোয়।

মালিক গেছেন তাঁর চা-বাগান পরিদর্শনে। তাঁর সঙ্গে আমাদেরও ম্যানেজারের বাংলোয় নৈশভোজনের ব্যবস্থা। সহকারী ম্যানেজার এবং তাঁর স্ত্রীও নিমন্ত্রিত।

ভোজ্যদ্রব্য টেবিলে সাজানো হয়েছে। মালিক হঠাৎ একটি বোলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞেসা করলেন: উয় কেয়া?—

—আণ্ডা কারি,—উত্তর দিলেন হোস্টেস্—অর্থাৎ ম্যানেজার-পত্নী। একবার আমাদের, একবার শ্যালক ও শ্যালকপত্নীকে পর্যবেক্ষণ করে মালিক মন্তব্য করলেন: Meat haven't yet found its place on the table, I suppose.

—No, Jiyaji—উত্তর দিলেন ম্যানেজার সাহেব।

—Don't say, no.—হেসেই ভুল শুধরে দিলেন মালিক,—Say, not yet.

ম্যানেজার ও তাঁর পত্নী চুপ করেই রইলেন।

সল্ট লেকের বৈশাখী বাজার। 'বাজার' আখ্যা দেওয়া বোধহয় কিছুটা অতিশয়োক্তি। তবে তরিতরকারি সবই বেশ টাটকা পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় চাষীর ঘরের ডিম—পোলট্রির নয়।

বেপারীরা ও চাষীরা সামান্যসংখ্যক ডিমই আনে এবং অধিকাংশ দিন তার সবগুলোই বিক্রি হয়ে যায়।

রবিবার দিন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে এক অবাঙালী ভদ্রলোক সব্‌জি বাজার সেরে ঘুরে ঘুরে ডিম সংগ্রহ করছিলেন। চেহারা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় মাড়োয়ারী। এক জায়গায় বাজারের থলি হাতে দুটি ছেলে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ডিম কেনা দেখছিল। কেনা শেষ

করে ভদ্রলোক পা বাড়াচ্ছেন এমন সময় ছেলে দুটি তাঁকে থামাল। একজন বলল : শেঠজী আপকা সাথ একঠো বাত থা।

শেঠজী তাদের পর্যবেক্ষণ করে অনুমতি দিলেন : বলিয়ে, কেয়া বাত।

—বাত হলো কি,—অপর ছেলেটি তার অননুকরণীয় হিন্দিতেই বলল,—আপলোগ ফিস আর মীট খানা কবসে চালু করেগা ?

প্রশ্নের মর্মার্থ বুঝুন আর নাই বুঝুন, শেঠ একবার তাদের দিকে বিতৃষ্ণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভৃত্যকে আদেশ দিলেন—চলো।

ওল্ড ফক্স : আমিষের চেয়ে কোহল পানীয় মাড়োয়ারী ঘরে বেশি চলে। তার বিস্তারণেও অবশ্য প্রতিবন্ধক হলেন গজাননজীর মত বর্ষীয়ান্‌রা।

এক ক্লাবে আমাদের থেকে একটু দূরের টেবিলে তিনজন মাড়োয়ারী তরুণ বোধহয় সান্ধ্যভোজনই সারছিল। ভোজ্য তালিকায় কি কি ছিল জানি না, তবে দুটি রঙিন বোতল টেবিলের ওপর রাখা ছিল। জলপথ-যাত্রার নিখুঁত নিদর্শন।

একটু পরে দেখলাম, তরুণদের মধ্যে দু-জনের হাতে পানীয় ভর্তি গ্লাস, একজন শুধু ঐ ব্যাপারে দর্শক। একজন সেই হাতখালি তরুণকে অনুরোধ করল : You also have a sip.

—No, I can't.—জবাব দিল তরুণটি। সঙ্গে সঙ্গে কারণও ব্যাখ্যা করল : The old fox will know about it.

—How ? জিজ্ঞাসা করল একজন,—Is he still awake ?

—No. But he maintains an espionage system. সুবেমেই নোকর-দ্বারোয়ানসে সব মালুম হো যায়গা।

—But you took non-veg. !—ছিদ্র দেখিয়ে দিল একজন।

—Yes, I did. But it doesn't emit odour—বদ্বু মারতা নেহি—কোই সমঝ নেহি পায়গা।

অপর তরুণটি মন্তব্য করল : তেরা ঘরকা বুড্‌ঢা বহুত চালু আদমি হ্যায়।

—তেরা ঘরকা নেহি ?—প্রশ্ন করল কোহল-পরিহারী তরুণটি।

—হাঁ, মেরা ঘরকা বুড্‌ঢাভি,—স্বীকার অপর তরুণটি,—তব

থোড়াসে কম।

এবার একজনের সামান্যীকরণ কানে এল : These old foxes কো লিয়ে সবকুছ বরবাদ হো যাতা হ্যায়।

সামান্য জড়িত কণ্ঠে পান-নিরত অপর তরুণটি এবার বলল : Yes. You are right. They are unfit for this computer age.

পানভোজনের সঙ্গে কম্প্যুটার যুগের কী সম্পর্ক তা ঠিক না বুঝলেও বুঝলাম রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কর্তাস্থানীয় বৃদ্ধদের সম্পর্কে আধুনিকদের মনোভাব কী। এই বুড়োরাই যে প্রগতির প্রতিবন্ধক সে বিষয়ে বর্তমান প্রজন্ম মোটামুটি একমত। ফলে তাদের মধ্যে রয়েছে বিদ্রোহের ফল্গুধারা, যা প্রায় প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর মাড়োয়ারী পরিবারে সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়।

কেনই বা হবে না? বর্তমান প্রজন্ম বহির্বিশ্বকে দেখছে—এখনতখন বিদেশে যাচ্ছে, বই ততটা না হলেও পত্রপত্রিকা পড়ছে—নাড়াচাড়া করছে, কথাকথিত সাহেবী স্কুলকলেজে শিক্ষালাভ করছে—অন্তত কথ্য ইংরেজীতে রপ্ত হচ্ছে এবং চলতি দুনিয়ার গোষ্ঠীকে অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজে মিশছে।...এ অবস্থায় তারা পরম্পরাগত গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে কি করে? এ অবস্থায় বিদ্রোহই কি স্বাভাবিক নয়?

তবে অনেক সময়ই বিদ্রোহ স্নায়ুযুদ্ধেই আবদ্ধ থেকে যায়—ঠিক গোলাগুলি বর্ষণের পর্যায়ে পেঁছোয় না। সন্ধিক্ষণের সূচক হিসাবে এ-অবস্থা বিশেষ প্রতিভাত।

সন্ধিক্ষণ : অতি-অভিজাত এবং ততোধিক রক্ষণশীল পরিবারের এক তরুণ সদস্য নিজেদের ব্যবসায়ের ব্যাপারে বিদেশযাত্রায় তার পত্নীকে সঙ্গে নেওয়াই স্থির করেছিল। পাশপোর্ট-ভিসা প্লেন-টিকিট হোটেল-বুকিং—কোনকিছুই বাকি নেই। পিতামাতারও সম্মতি পাওয়া গেছে। এখন শুধু যাত্রার দিন গোনা।

কথাটা কর্তার কানে গেল। তিনি প্রথমে তলব করলেন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে--যার পুত্রই পত্নী-সমভিব্যাহারে বিদেশযাত্রার ব্যবস্থা করেছে। কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি শুনেছেন লছমীনারায়ণ আওরাত

সাথ লেকর ফরিন যানেকো লিয়ে বন্দোবস্ত কিয়া—বাত কি ঠিক ?

পুত্র জানালেন, আপনে ঠিকই শুনা।

—কেতনা দিনকো লিয়ে ?

—দো-হপ্তা,—জবাব দিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র।

—আজীব বাত! দো হপ্তাকো লিয়ে জেনানা ছোড়কে নেহি রয়নে সেকতা ?

এই বিস্ময়সূচক প্রশ্নের কি জবাব দেবেন জ্যেষ্ঠ পুত্র তা ঠিক করবার আগেই কর্তার নির্দেশ এল : বোল দেও জেনানা সাথ লেকর যানা নেহি চলেগা—ইস ঘরমে ওইসি রেওয়াজ আভিতক চালু নেহি হুয়া।....

পরের দিনই কিন্তু কর্তা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিজেই জানিয়ে দিয়েছিলেন : যানে দেও—জেনানাকী সাথ যানাই আচ্ছা হ্যায়।

কি ঘটেছিল একদিনের মধ্যে যার দরুন কর্তার এইরকম আকস্মিক ও সম্পূর্ণ মত-পরিবর্তন ? কারণ সেই জ্যেষ্ট পুত্রের মুখ থেকেই শুনেছিলাম : সেইদিনই কর্তার শুভানুধ্যায়ী দোস্তদের একজন কর্তাকে বুঝিয়েছিলেন—শাদির পর বউ সঙ্গে না নিয়ে বিদেশ গেলে খতরার আশঙ্কা—কাঁহা কাঁহা ফরিন লেড়কীভি পাকাড়নে সেকতা—ঐরকম সব লেড়কী হোটেলমেভি আ যাতী।

কর্তা এইরকম ব্যাপারস্যাপার অপরের মুখেও শুনেছিলেন। ব্যস—কর্তার একেবারে ভলট্‌ফাস।

আরও একটি কারণ কর্তা জানিয়েছিলেন : জেনানা সঙ্গে থাকলে সরাব লেনার ব্যাপারে থোড়াসে হেজিটেট জরুর করেগা।

—Thus, at long last the old fox had to give in,—উক্তি করেছিল ছেলেটি নিজেই—আমার সামনেই ট্রাভেল এজেন্টস্‌-এর এক প্রতিনিধির কাছে।

সমগোত্রীয় ও সমপর্যায়ী আর এক ভবনের কাহিনী।

প্রথম শ্রেণীর মাড়োয়ারীদের বাড়িতে মোটর-গাড়ির সংখ্যা বহু—৫/৭ থেকে শুরু করে ১৫/১৬-তেও গিয়ে পেঁছোয়। পরিবারের সভ্যাপিছু এক বা একাধিক গাড়ি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু (কিছু

পরিমাণে স্বয়ংচালনের ব্যবস্থা সত্ত্বেও) চালকের সংখ্যা গাড়ির সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। কারণটা অতি সহজবোধ্য—যে হারে গাড়ি অচল হয়, চালকদের কামাই-এর হার তার চেয়ে বেশি। আর গড়ে দু-বছর অন্তর যখন নতুন গাড়ি পুরোনোর স্থলাভিষিক্ত হয় তখন গাড়ি খুব-একটা বিগড়োয় না।

পুরোনো গাড়িগুলো যায় আধিকারিক বা কোম্পানীর অফিসারদের কাছে, অথবা বিক্রি হয় সাদা-কালো মিশিয়ে। সাদা টাকা বুকস্-এ জমা পড়ে। আর কালো টাকা ?···যাক সে কথা।

যেহেতু গাড়ির সংখ্যা বহু এবং চালকের সংখ্যা ততোধিক সেই-হেতু গাড়ির একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকা অবশ্যই প্রয়োজন, এবং এই প্রয়োজন মেটানোই হয়। পারকিন্সন আইন অথবা অর্থনীতির ব্যয়সংক্ষেপের সূত্র দ্বারা ব্যবস্থাটি সমর্থিত কিনা জানি না, তবে এর যে ব্যবহারিক উপযোগ আছে তাতে সন্দেহ নেই। যথাসময়ে যথাযথ অবস্থায় গাড়ি তৈরি থাকে, চালকও থাকে হাজির। (সমরবিদ্যার) লোজিক্‌টিকস্‌ অনুসারে এ এক কাম্য ব্যবস্থা, সন্দেহ নেই। বোধহয় সমষ্টিগত অর্থনীতি—ম্যাক্রোইক্‌নমিক্‌স অনুসারেও ব্যবস্থাটি সমর্থনীয়—এতে অন্তত একজনেরও ত' অতিরিক্ত নিয়োগসংস্থান হয়। পারকিন্সন এদিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন কিনা জানি না।

এ হেন এক (গাড়ির) তত্ত্বাবধায়ক একদিন সকালে কোঠির অফিস-ঘরে এসে বিশেষ কুণ্ঠার সঙ্গে জানাল, ফরিন কারের একভি গ্যারাজে নেই।

শুনে বড়াবাবু—কর্তার জ্যেষ্ঠপুত্র খানিকটা বিস্মিত হলেন। পাশে-বসা কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন : কে'ও ? কৌন কৌন লে গিয়া ?

কে কে নিয়ে গেছে তা তত্ত্বাবধায়ক জানায় কি করে ? সেখানেই যে তার কুণ্ঠা ! শেষ পর্যন্ত অবশ্য জানাতেই হলো—একখানা নিয়ে গেছেন বড়ী বিন্নীজী, একখানা সুশীলবাবুকা বিন্নিজী, আর একখানা ছোটী বিন্নিজী। অর্থাৎ, লিমুজিন তিনখানা নিয়ে কর্তার তিন নাত-বৌ বেরিয়ে গেছে।

এত বড় দুঃসংবাদ কর্তার পক্ষে সহজে পরিপাক করা সম্ভব নয়। প্রাথমিক দোষারোপটা গিয়ে পড়ল তত্ত্বাবধায়কেরই ওপর :

আপ রূকা নেহি কেঁও ? আপকা মালূম নেহি থা, এয়ারপোর্টমে একঠো ফরিন কার ভেজনা হ্যায় ।

তত্ত্বাবধায়ক অতি মৃদু প্রতিবাদ করল : ম্যয় কেইস্যা রূকনে সেকতা থা বাবুজী ?

সত্যিই ত মালিকদের কাউকে রূকবার ভার তত্ত্বাবধায়কের ওপর নেই। কর্তা তার যুক্তি মেনে নিলেন। কিন্তু এখন কি করা যায় তাই নিয়ে দাঁড়াল সমস্যা। বড়াবাবু পরামর্শ দিলেন, কণ্টেসা ক্ল্যাসিকখানাই পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

—নেহি,—সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করলেন কর্তা,—দেশী কার ভেজনা বেওকুফি হ্যায়। কোলাবোরেটর সমঝোগে হমলোগ থার্ডক্লাস পার্টি।

বড়াবাবু এ-যুক্তি মেনে নিলেন, বললেন : তব ? এবার কর্তাই নির্দেশ দিলেন : কোঠারি কোঠিমে ফোন কর—একঠো ফরিন কার মাঙায় লেও।

কোঠারিরা ওঁদের সঙ্গে বৈবাহিক ও ব্যবসায়িক—দু-সূত্রেই আবদ্ধ।

কোঠারিদের টেলিফোন করা হলো। জানতে পারা গেল অনতি-বিলম্বেই গাড়ি এসে পেঁছুচ্ছে। বড়াবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কর্তার কিন্তু কোন ভাবান্তর ঘটল না। তিনি নিশ্চয়ই তখন অন্যকিছু ভাবছিলেন।

কি ভাবছিলেন তখনই তা বুঝতে পারলাম তত্ত্বাবধায়কের প্রতি তাঁর প্রশ্নবাণে : বিন্নিজী লোগ্ কাঁহা কাঁহা গাড়ি লে গিয়া আপকো মালুম হ্যায় ?

মাথা চুলকে তত্ত্বাবধায়ক 'জী, হাঁ' বলেই চুপ করে গেল। কর্তা তখন তাকে ধমক দিলেন : বলিয়ে।

এবার তত্ত্বাবধায়ক ধীরে ধীরে বিবৃত করল : বড়ী বিন্নিজী গাড়ি নিয়ে গেছেন মিডল্টন স্ট্রীটে লোরেটো হাউসে, সুশীল-বাবুকা বিন্নিজী ল্যান্সডাউন রোডে বাল বানানেকো লিয়ে…

তত্ত্বাবধায়ক আর কিছু বলবার আগেই কর্তার অনুপূরক সওয়াল বন্দুকের না হলেও, পিস্তলের গুলির মত বেরিয়ে এল : লোরেটো হাউসমে কিস লিয়ে ?

এবার জবাব দিলেন বড়াবাবু: অপর্ণাকী ভর্তিকো লিয়ে ইণ্টারভ্যু।

কর্তা ব্যাপারটা ঠিক বুঝলেন বলে মনে হলো না—বড়াবাবুর মুখের দিকে চেয়েই রইলেন। বড়াবাবুকে তখন বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে হলো—এইসব আংরেজী স্কুলে ভর্তির জন্যে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফল হওয়াই যথেষ্ট নয়, স্কুলের পক্ষে ছাত্র বা ছাত্রীর পিতামাতাও গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। এইজন্যেই পেরেণ্টস্ ইণ্টারভ্যু।···

—তব ত' কিষণভি সাথ গিয়া হোগা?—প্রশ্নাকারে উক্তি করলেন কর্তা।

শুধু 'হাঁ' বলে বড়াবাবু চুপ করে গেলেন, কর্তা কিন্তু উষ্মা প্রকাশ করেই বললেন: লোরেটোমে লেড়কী ডালনেকো কেয়া জরুরৎ থা?···শ্রীশিচ্ছায়তন আচ্ছা নেহি হ্যায়?···আংরেজী স্কুল একদম বরবাদিকা সড়ক।···কর্তা হয়তো আরও অনেক কিছু বলতেন, কিন্তু একটা কথা মনে পড়ায় প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হলেন: কিষণ ত জেনানা লেকর লেড়কী ডালনে গিয়া, তবে এয়ারপোর্ট যায়গা কৌন?

হাঁা, একটা সমস্যা বটে। কিষণ মেয়েকে ভর্তি করতে গেছে, কর্তার আর দুই নাতি কলকাতার বাইরে। এই তিনজনই যে ইংরেজী বলিয়ে-কইয়ে। এদের একজনকেই কোলাবোরেটরকে আনবার জন্যে এয়ারপোর্টে পাঠালে ভাল হোত।···এখন উপায়?

হঠাৎ সামনে-বসা আমার কথা কর্তার মনে পড়ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ: প্রফেসর সাহেব, আপনি এয়ারপোর্ট যেতে পারবেন?—কর্তার প্রজন্মের প্রতিনিধিরা মোটামুটি ভালই বাংলা বলেন—ওঁদের যে বাঙালীদের সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে মেলামেশা করতে হয়েছে।

অনুরোধটা ভাল না লাগলেও ঘুরিয়ে বললাম: আপনার কোন অফিসারকে পাঠিয়ে দিন না কেন।

—নেহি প্রফেসর সাহেব,—কর্তা জানালেন,—এই কাম কোন করমচারীকে দিয়ে হোবে না।

কেন কর্মচারীকে দিয়ে এই ধরনের কাজ হবে না তার কারণ একাধিক। প্রথমত, এতে ঠিক প্রোটোকল বজায় থাকে না। দ্বিতীয়ত,

কোলাবোরেটর কর্মচারীর পেট থেকে কিছু কথা বের করে নিতে পারেন। তৃতীয়ত, কর্মচারীও কোলাবোরেটরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে নিজের আখের গুছোবার চেষ্টা করতে পারে।

মুনিমজী অবশ্য অন্য জাতের। কিন্তু তাঁকে এ কাজের উপযুক্ত বলে কল্পনাই করা যায় না। তাঁর পোশাক, ইংরেজী-জ্ঞান, এয়ার-পোর্ট সম্বন্ধে জ্ঞানভাণ্ডার—কোনটাই কার্যোদ্ধারের অনুকূল নয়।

আমি চুপ করে আছি দেখে কর্তা মীমাংসার আশ্রয় নিলেন : অশোককো আপনার সঙ্গে নিয়ে যান প্রফেসর সাহেব। অশোক হলো ছোটাবাবু—কর্তার দ্বিতীয় ও ছোট ছেলে।

এবার রাজী না হয়ে পারলাম না। ছোটাবাবুকে বি. বা. দী. বাগের অফিস থেকে ডেকে পাঠানো হলো।

কর্তা নিশ্চয়ই অশোকের কথা আগে ভেবেছিলেন, কিন্তু তাকে একলা পাঠানো যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি—কারণ তিনি ইংরেজীতে ততটা পটু নন, আর বেশ খানিকটা তোত্‌লাও বটে।

দ্বারোয়ান এসে খবর দিল, কোঠারি কুঠিসে গাড়ি এসে গেছে। গাড়ির তত্ত্বাবধায়ক এবার বেরিয়ে যাবার উপক্রম করল—তাকে দেখে নিতে হবে গাড়ির সব ঠিকঠাক আছে কিনা—তেল ভরতে হবে কিনা।

সে এক পা বাড়াতেই শুনতে পেল কর্তার হুকুম : আজ বিকালসে পরশো সামতক একখানা ফরিন কার সব সময়েই সাহেবের জন্যেই থাকবে—কেউ যেন বাল বানাতে বা মজা মারতে নিয়ে না বেরোয়।

এয়ারপোর্টের দিক যাত্রা করার আগে আমাকে কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার ভিজিটিং কার্ড সঙ্গে আছে ত ?

হ্যাঁ, বলাতে কর্তা উপদেশ দিলেন : দেখা হবার পরই একখানা ভিজিটিং কার্ড সাহেবের হাতে দেবেন।

ছোটাবাবুর সঙ্গে ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে এয়ারপোর্ট যেতে যেতে কর্তার কথাই ভাবছিলাম : তাঁর নাতিরা ঠিকই বলে—চালু বুড্‌ঢা—দ্য ওল্ড ফক্স, দ্য ওল্ড ফুল নয়।

ফুল ত নয়ই। কীভাবে কার্যোদ্ধার করতে হয় তা এই বৃদ্ধেরা

ভালভাবেই জানেন। এয়ারপোর্টে কোলাবোরেটরকে যথোচিত অভ্যর্থনা করবার জন্যে ইংরেজী-জানা উপযুক্ত লোকের দরকার, সেখানে নিজ ভবনের মর্যাদার পরিচায়ক লিমুজিনও পাঠানো প্রয়োজন, যত উঁচু পদেরই হোক না কেন, কোন আধিকারিককে পাঠানো যুক্তিযুক্ত নয়। ভবনের সঙ্গে জড়িত আমাদের মত এক্সট্রাকেও পাঠানো যেতে পারে—এতে ইম্প্রেশন ভাল বৈ খারাপ হয় না। না, ব্যবসা-দুনিয়ার রীতিনীতির সঙ্গে এই সব বৃদ্ধের ঘরে বসেই পরিচয় ঘটেছে—তাঁরা কূপে বাস করেও কূপমণ্ডূক হয়ে পড়েন নি।

অপরদিকে আবার ব্যবসায় জগতের বাইরের পরিবর্তনকেও তাঁরা ঠিক মেনে নিতে পারেন নি। ইংরেজী শেখা নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু এর জন্যে কি বিধর্মীর স্কুল-কলেজে পড়া অপরিহার্য? জাতভাইরাও ত কয়েকটি ইংরেজী স্কুল এবং কলেজও গড়েছে। বাল বানানোর জন্যে বিউটি পার্লারে যাবারই কী প্রয়োজন—আর মেয়েদের কেশকর্তনের আবশ্যকতাই বা কোথায়? ফরিন কার নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু তাতে করে বহুদের বেরোবার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? তাদের জন্যে আলগ প্রিমিয়ার অ্যামবাসাডার মারুতি ত আছেই।...

কোলাবোরেটরের সঙ্গে নৈশভোজের (নৈশভোজনের নয়) ব্যবস্থা চুক্তিপত্র সাক্ষরের পরই। পঞ্চাঙ্ক দেখে সময় ঠিক হয়েছে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। সাতটার মধ্যেই (এবার) কিষণ সাহেবকে নিয়ে কোঠিতে আসবে—তারও বন্দোবস্ত হয়েছে। সব আয়োজনই সম্পূর্ণ। আমিও আমন্ত্রিত হয়েছি। হঠাৎ কর্তার মনে হলো সাহেব পানাসক্ত হতে পারেন। জিজ্ঞাসা করলেন বড়া বাবুকে: কোলাবোরেটের সাহাব পিতা ত নেহি?

—জরুর পিতা হোগা—আমেরিকান সাহাব,—জবাব দিলেন বড়াবাবু।

চিন্তিত হয়ে পড়লেন কর্তা—সাহেবকে খুশি রেখে সইটা করিয়ে নেওয়া দরকার। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্যার সমাধানও অবশ্য করে ফেললেন—নির্দেশ দিলেন: হোটেলমে পিলায়কে তব লে

আনা। কয়েক সেকেণ্ড পরে যোগও করলেন : সাহাবকো গ্রাণ্ডকা চৌরঙ্গি বারমে লে যানা—কলকাত্তাকা সবসে বড়িয়া পিনেকা জাগা, শুনা হ্যায়।—দেখলাম, কর্তা সে খবরও রাখেন।

—ঠিক হ্যায়,—সম্মতি জানালেন বড়াবাবু,—আভি কিষণকো বুলাতা হ্যায়।

শুনে এক সমস্যা থেকে আর এক সমস্যায় উপনীত হলেন কর্তা। বড়াবাবুকে থামতে বলে কয়েক সেকেণ্ড কি ভাবলেন, তারপর বললেন : কিষণকো মৎ যানে বোলো। প্রফেসর সাহাব যায়েঙ্গে।—তারপর আমার দিকে অনুনয়ের ভঙ্গিতে : আপ সাহাবকো লে আনেকো লিয়ে যাইয়ে না, প্রফেসর সাহাব!

অনুনয়ের পশ্চাতে প্রেরণা বুঝতে আমার মোটেই দেরি হয় নি। সাহেবকে নিয়ে বারে বসার তাৎপর্য সহগামীকেও বার-এ বসার সুযোগ দেওয়া। কিষণকে এ-সুযোগ দেওয়া বিপজ্জনক নয় কি? সে কি আর বসে বসে সাহেবের পানই দেখবে? তারও যদি একটু-আধটু অভ্যেস থাকে! তার চেয়ে প্রফেসর সাহেবকে পাঠানোই নিরাপদ ব্যবস্থা। তিনি যদি সাহেবকে পুরোপুরি সঙ্গই দেন তবে খর্চ কিছুটা বাড়বে মাত্র, ঘরকা লেড়কাকো ত আর বিগড়োবার সুযোগ দেওয়া হবে না। An old fox indeed, কিন্তু প্রজাতি-বহির্ভূত নন।

গাই-বলদে : প্রথম সারির না হলেও সুপরিচিত মাড়োয়ারী পরিবারের যুবক। উত্তরপ্রদেশের এক বড় চিনিকলের মালিক। মালিক মানে কণ্ট্রোলিং শেয়ারের মালিক। পরিচালকমণ্ডলী অবশ্যই আছে। তবে তার সদস্যরা নিজেরদেই লোক—চেনাজানা বিশ্বস্তদের মধ্যে থেকে মনোনীত, অবশ্য অর্থ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের[১] প্রতিনিধিরা ছাড়া। তাঁদের যে মনোনয়ন করে পাঠায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

আগে চিনিকলটি ভালই চলত। শেয়ার-হোল্ডাররা প্রত্যাশামত ডিভিডেণ্ড পেয়ে খুশি থাকতেন, অর্থ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকালীন এবং ব্যাংক স্বল্পকালীন ঋণ দিতে দ্বিধা করত না।···

১. **Financial Institutions—যেমন IDBI, IFCI ইত্যাদি**

হঠাৎ চিনিকলটির অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। পর পর দু-বছর কোনও ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হলো না, সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দীর্ঘকালীন মূলধনের জন্যে আবেদনের কোনো প্রশ্নই রইল না, এমনকি ব্যাঙ্কও চলতি মূলধন যোগানোর সময় নানারকম ওজর-আপত্তি দেখাতে সুরু করল। এককথায় কনসার্ণের স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ।

এহেন অবস্থায় পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন তথাকথিত মালিকের চাচাজী, এবং তাঁর পরিত্রাণ-পদ্ধতি ছিল একরকম বৈপ্লবিক প্রকৃতির—মাড়োয়ারী সমাজের পক্ষে অভাবনীয়ও বলা চলে।

মালিকদের ছিল যৌথ ব্যবসা—প্রথম পুরুষের কাপড়ার বিজ্‌নিস্ থেকে সেদিন পর্যন্ত ছিল এই চিনিবল, ফরিদাবাদে ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরি, একটা চা-বাগান, কিছু বাড়িঘর, পোশাক রপ্তানির ব্যবসা—আর অবশ্যই হুণ্ডি-বেয়াজের কারবার।

যৌথ ব্যবসা বাঁটা হলো বা বাঁটতে হলো এই ক-বছর আগে, এবং বন্টনে চিনিকল পড়ল পিতৃহীন রাজকুমারের হিস্যায়। রাজকুমারের বয়স অবশ্য বেশি নয়, তবে ব্যবসা চালানোর পক্ষে যথেষ্ট—৩৫-এর মত।

বানিয়াকা বেটা হলেও—ছেলেবেলা থেকে ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও কর্ণধার হিসেবে কিছুদিনের মধ্যেই রাজকুমারের মধ্যে একটা গুরুতর ত্রুটি লক্ষ্য করা গেল, ব্যবসায়-শাস্ত্রে যাকে বলে প্রয়োগ-ঘাটতি—application deficiency. যখন সে চাচার তত্ত্বাবধানে চিনিকলের কাজকর্ম দেখত তখন তার এই দুর্বলতা ধরা পড়েনি। কারণ বোধহয় তখন তার ছিল রুটিন-মাফিক ও নির্দেশমত কাজ—কম্যাণ্ডের ভার তার ওপর ছিল না।

কম্যাণ্ডের ভার পাওয়ার পরই তার দুর্বলতা—ত্রুটি সুপরিস্ফুট হতে লাগল। আগেকার দিনের সহরবাসী জমিদারদের মতই সে কর্ণেন পশ্যাতির মাধ্যমে মিল চালাতে লাগল। আর খুব বেশি অশোভনীয় বা আপত্তিকর না হলেও মৌজমজা ত' ছিলই।

উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পোয়াবারো। মিলে ম্যানেজার এবং কলকাতার অফিসে মুখ্য কর্মসচিব হয়ে উঠলেন অপরিমেয় কর্তৃত্বের অধিকারী। অধস্তন আধিকারিকরাও বাদ গেলেন না। লর্ড

অ্যাক্টনের সেই যে উক্তি—ক্ষমতা অধিকারীকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে, তা ঐ চিনিকলের কার্যসম্পাদনে উত্তরোত্তর বর্ধমান পরিমাণে প্রতিফলিত হতে লাগল। প্রতিষ্ঠান পাহাড়ী পথে গড়িয়েই নিচে চলল।

রাজকুমারের চাচাজী অনেক দিন ধরেই ব্রেক কসার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু কীভাবে তা ভেবে ঠিক করতে পারছিলেন না। অবশেষে তাঁর মস্তিষ্কে উদয় হলো এক উদ্ভাবনের : রাজকুমারের স্ত্রী ললিতার ওপর পরিচালনার অন্তত আংশিক ভারার্পণ করলে কেমন হয়?

পিতার মৃত্যুর পর রাজকুমার এই চাচারই অভিভাবকত্বে বড় হয়েছিল—ব্যবসাও শিখেছিল (!) তাঁরই তত্ত্বাবধানে। এবং বণ্টনের সময় রাজকুমারের হিস্যায় চিনিকলটা যাতে পড়ে তার-জন্যে চিনি স্বতস্ফূর্ত ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এবার রাজকুমারকে বাঁচাবার ভার তিনিই নিলেন।

তাকে ডেকে বললেন : Have Lalita involved in management.

রাজকুমার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। বিনীতভাবেই জিজ্ঞাসা করল : How?

চাচাজী তখন ধীরে ধীরে প্রস্তাব বিস্তারিত করলেন : ললিতা—তোমার বউ, অফিসে যাক, কাজকর্ম দেখতে শিখুক, আর তার সঙ্গে পরামর্শ করে তবেই গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিও—Two heads are always better than one, you know.

শেষের কথাগুলো হয়তো রাজকুমারের কানে ভাল যায় নি। সে শুধু বিস্ময়সূচক উক্তি করেছিল শুনেছিলাম : ঘরকা বহু অফিসমে।—তারপর একটু থেমে প্রশ্নও করেছিল : লেকিন তাউজী লোগ?

হ্যাঁ, তাউজী লোগদের আপত্তি ছিল, আর আপত্তি ছিল রাজকুমারের বিধবা মায়েরও। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কারও আপত্তি টিকল না—ললিতা অফিস যাওয়া সুরু করল।··· ক্রমে সম্পূর্ণ পরিচালন-ভার এল তার হাতে—রাজকুমার মৌজমজার টাকা পেয়েই সন্তুষ্ট রইল।

চিনিকলের স্বাস্থ্যোদ্ধার হতেও বেশি দেরি হলো না।

পরিবারের এই ইউনিটে পরিবর্তন অন্যান্য ইউনিটের ওপরও ছায়া ফেলল। তাউজী-ঘরের বহুরাও বাইরে চলে এলেন। কেউ বা স্বামীর দপ্তরে গিয়ে বসতে লাগলেন, কেউ বা পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে কোন সাইড বিজ্‌নিস্‌ যোগ করলেন—পরিবারের সব ইউনিটই গাই-বলদে চষতে লাগল। বদলতে ওয়ক্ত মে হমকদম। বড়া তাউজীর নাতবৌ করল এক নতুন ধরনের পার্শ্বিক সংযোজন বা ল্যাটারাল ইনটিগ্রেশন—ইকিবনের বিজ্‌নিস্‌। মাস্টার ফ্লোরিস্টকে সঙ্গে নিয়ে সে জাপান থেকে তিন মাসের ট্রেনিংও নিয়ে এল। অফিসের ঢোকবার মুখেই একটা নতুন কাষ্ঠফলক সাঁটা হলো : 'শোভা'—ফ্লাওয়ারস বুকেস গারল্যান্ডস অ্যান্ড ফ্রেমস।

তাঁদের বনফিল্ড লেনের অফিসে একটা বড় টিফিন কেরিয়ার হাতে নিয়ে ছাওছরিয়াজীর ছোটী বহুকে ঢুকতে দেখে একটু অবাক না হয়ে পারিনি।

ছাওছরিয়াজীদের কেমিক্যালসের কারবার। কারবার বেশ কিছুদিনের হলেও সবে তাঁরা জাতে উঠেছেন—বাসস্থান বড়বাজার থেকে স্থানান্তরিত করেছেন সেক্সপিয়ার সরণির এক নবনির্মিত বহুতল বাড়ির একটা ফ্ল্যাটে।

সেই ফ্ল্যাটে ছাওছরিয়াজী আমাকে একদিন মধ্যাহ্নভোজনের জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ফোনে বলেছিলেন : মাইটিকা জনম্‌ দিন—খানা খানে আইয়ে না!—মাইটি ছাওছরিয়াজীর (তখন পর্যন্ত) একমাত্র পোতা।

সেদিন কোন ছুটির দিন ছিল না, আমন্ত্রণে বিশেষ আন্তরিকতাও হয়তো ছিল না—তবুও আমি গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি একরকম যেন যজ্ঞি হচ্ছে—ঢোকার মুখেই চৌকায় কর্মকাণ্ড ত' নজর এড়াতে পারে না। নাতির জন্মদিনে এইরকম এলাহি কাণ্ড!—অবাক না হয়ে পারিনি। একটা অসঙ্গতিও অবশ্য লক্ষ্য করেছিলাম : রসুই প্রায় শেষ বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু আর কোন নিমন্ত্রিত তখনও এসে পেঁছোন নি। তবে কি অনুষ্ঠান সন্ধ্যায়? তা হলে দিনে—এত বেলা থাকতে রসুই-এর প্রয়োজন কি?

হঠাৎ দেখি চৌকা থেকে নানা সাইজের টিফিন কেরিয়ার নিয়ে এসে লবিতে আমাদের সামনেই জড়ো করছে ছাওছরিয়াজীর দুই বহু। পাত্রগুলো যে ভর্তি তাও সহজে বুঝলাম। সবই জড়ো হবার পর বহুদের একজন অন্তরালবর্তিনী শ্বশুর[১] উদ্দেশ্যেই জানালেন : সব তৈয়ার মাজী।

—আ রহা হুঁ,—বলেই বেরিয়ে এলেন তাদের শ্বশুঠাকুরাণী—গৃহকর্ত্রী দুর্গাদেবী ছাওছরিয়া। তিনি টিফিন কেরিয়ারগুলো এক বহুকে দিয়ে তিন শ্রেণীতে সাজালেন—প্রত্যেক শ্রেণীতেই বড় মাঝারি ও ছোট—সব সাইজের কেরিয়ার, আর প্রত্যেকটার গায়েই হিন্দিতে ১, ২, ৩—কোন-না-কোন একটা সংখ্যা লেখা। আবার এক এক শ্রেণীর প্রত্যেকটি কেরিয়ারে নীল লাল বা কালো রবার ব্যাণ্ড—সুস্পষ্টভাবে পরিচয়-নির্দেশক।

দুর্গাদেবীর তদারকি শেষ হতে না হতেই একজন অপরিচিত ভৃত্যজাতীয় লোক এসে হাজির। সে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে দাঁড়িয়ে রইল। তদারকি শেষ করে দুর্গাদেবী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : ড্রাইভার আ গিয়া ?

—হাঁ, মাজী,—জবাব দিল লোকটি।

বলতে বলতে খোলা দরজা দিয়ে লবিতে ঢুকল আর একজন লোক। তাকে চিনলাম—ছাওছরিয়াজীদের ড্রাইভার—আগেও দেখেছি।

দু-জনে মিলে টিফিন কেরিয়ারগুলো বাইরে নিয়ে যাওয়া সুরু করল। কেরিয়ারগুলো অপসারিত হলে ছাওছরিয়াজীর কণ্ঠস্বর কানে এল : মেরে দোনোকো খানা লাগাও।

সব ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করছিলাম কিছুটা অবাক হয়েই—শেষ পর্যন্তও বুঝতে পারছিলাম না, এত টিফিন কেরিয়ার গেল কোথায়! মাইটির জন্মদিনে কি বাড়ি বাড়ি খানা পাঠানো হলো ? আর বড় মাঝারি ছোট সাইজের টিফিন কেরিয়ারেরই বা তাৎপর্য কী ?

ব্যাখ্যা পেলাম আহার করতে করতে—ছাওছরিয়াজীই জানালেন :

---

১ শাশুড়ী

ওঁর মালকানি[1] ও বহুরা মিলে এক সাইড বিজনিস খুলো—দপ্তর-দুকানমে টিফিন[2] সাপ্লাই-এর। পঁচিশ, তিশ গাহক ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, পরে নিশ্চয়ই বাড়বে। তখন কাছাকাছি একখানা ঘর খুঁজতে হবে, একজন পার্ট-টেম মহারাজও রাখতে হবে—এখন অবশ্য খানা দুই বহুই বানায়। আর ডেলিভারির কাজের জন্যে একজন লোকও রাখতে হতে পারে—তাঁর দপ্তরকা আদমি একলা এত জায়গায় টিফিন পেঁছে দিতে পারবে না। আধ ঘণ্টাটাক সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ কবতে হবে যে!

সেদিনের পর আজকের ঘটনা—বিরাট টিফিন কেরিয়ার হাতে নিয়ে ছোটী বহুর অফিসে আগমন।

টিফিন কেরিয়ারটা টেবিলের ওপর রাখার সঙ্গে সঙ্গে ছাওছরিয়াজী জিজ্ঞাসা করলেন: চার আদমিকা খানা লে আয়া ত? মুখার্জিবাবু ভি খায়েঙ্গে।

—মালুম হ্যায়। আপ ফোনসে বাতায় দিয়া না, মুখার্জিবাবু ভি খায়েঙ্গে,—জবাব দিল ছোট পুত্রবধূ। এবং তারপরেই সে বেরিয়ে গেল।

ব্যাপারটা আমার কাছে অবাক হবার মত হলেও ছাওছরিয়াজী দেখলাম ভাবলেশহীন। কারণ, পরে জানলাম, এটা তাঁর কাছে অন্যতম নৈমিত্তিক ঘটনা আর কিছু নয়।

খেতে খেতে সবই জানলাম—

ছাওছারিয়াজী কিছু রপ্তানির কাজও সুরু করেছেন। তার জন্যে মাঝে মাঝে দু-একখানা স্বতন্ত্র ধরনের চিঠি লিখতে হয়, এবং সেই সূত্রেই ছাওছরিয়াজীর আহ্বানে আমার আসা। যেহেতু সময়টা ছিল মধ্যাহ্ন সেইহেতু ছাওছরিয়াজী আমার জন্যে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থাও করেছিলেন। অন্যান্য দিনের মতই খানা আসবার কথা তাঁর বাড়ি থেকে এবং তা নিয়ে এসেছিল তাঁর ছোটী বহু।

কিন্তু সে কেন, ড্রাইভারই ত' আনতে পারত! না, তা পারত

১. মালিকানি—গৃহিণী

২. ওঁরা দুপুরের খাওয়াকে অনেক সময় টিফিনই বলেন

না। কারণ, আরও সবার টিফিন সরবরাহ করার প্রয়োজন ছিল—আজ যে বাঁটনেওয়ালা নোকর আয়া নেহি। উয় বদমাস লোগ হরবখত এইসি করতা হ্যায়—মাহিনামে তিনচার রোজ ছুট্টি মারতা পইলে নেহি বোলকে। এতে দপ্তরের কাজেও ছতি[1] হয়—লোকটি অফিসে পিওনের কাজও করে কিনা।

পিওনঠো যেদিন না আসে সেদিন ছোটী বহু বন্দনাকেই কুরিয়রের কাজ করতে হয়—টিফিন কেরিয়ারগুলো যথাস্থানেই পেঁীছে দিতে হয়। ভোজনের বেলায় ত ফেল করা চলেনা! এইজন্যই বন্দনা হিঁয়া টিফিনটো[2] ছোড়কে জলদি নিকাল গিয়া।

জিজ্ঞাসা করলাম : বড় বহু কভু আতি নেহি?

—উঃ কেয়সী আয়েগী? দুসরী কুরিয়ার সার্ভিস জইন কর লিয়া না!

—দুসরী কুরিয়ার সার্ভিস!—আবার আমার অবাক হবার পালা, এবং তার ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল—

ছাওছরিয়াজীর কোন এক পরিচিত ভদ্রলোক কলকাতা-শিলিগুড়ির মধ্যে (ডাক) কুরিয়ার বা স্পীড পোস্ট সার্ভিস খুলেছেন। সেখানে বীণা লাঞ্চের পর থেকে বসে। তখন সব মুন্নামুন্নীর দেখভাল্ করে ছোটী বহু—বন্দনা। যেদিন দুজনকেই বেরিয়ে যেতে হয় সেদিন তাদের দাদী—মেরা বুড্ঢীর ওপরই ঐ ভার পড়ে।

—বীণা হুঁয়া নোকরি লিয়া?—আমার এই অসঙ্গত প্রশ্নের উত্তরে এসেছিল ছাওছারিয়াজীর প্রতিবাদসূচক জবাব : নেহি জী, পার্টনারশিপমে জইন কিয়া।

সত্যিই ত মাড়োয়ারী ছেলেমেয়েরা নোকরি করতে চায় না—মেয়েরা ত' নয়ই। বিজ্‌নিস্‌ই যখন তাদের বিজ্‌নিস্ তখন তারা পর্দা ছাড়ার পর বিজ্‌নিস্‌ই করবে।

ওরা থাকে ওধারে : এরা জাতে উঠলেও ওরা কিন্তু ওধারেই থাকে—এ ধারের সঙ্গে ঠিক অন্তরঙ্গতা করতে চায় না—কুটুম্বিতা

১. ক্ষতি

২. টিফিন কেরিয়ার

বা আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন ত নয়ই। এর ফলে মাঝে মাঝে নাটক জমে উঠলেও পরিণতিতে তা হয় বিরস—বিয়োগান্ত। এও মোজেইকের একটা দিক। দিকটির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল খাস কলকাতায় নয়, জগন্নাথধামে—পুরীতে। কথক অবশ্য ছিলেন কলকাতারই।

পারিবারিক ব্যবসায়ের প্রতিনিধি হয়ে কলকাতা থেকে পুরী গিয়েছিল সৌরভ মোহতা। ব্যবসা হলো বাড়িঘর তৈরির—সাধারণত যাকে বলা হয় কনস্টাক্‌সনের কাজ। পুরীতে তারা এক হোটেল-বাড়ি তৈরির কনট্রাক্ট পেয়েছিল।

পুরীতে সৌরভ ও আমরা এক বাড়িতেই থাকতাম—হোটেলে নয়। বাড়িটা ছিল এক মাড়োয়ারী পরিবারের অতিথি-নিবাস। বেশ বড় দোতলা বাড়ি। একতলায় দুটো ঘর পেয়েছিলাম আমরা, আর বাকী দুটোর মধ্যে একটা সৌরভ মোহতা। সে আমাদেরই মত মালিকদেরই কারও কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে এসেছিল, তবে আমাদের মত এক সপ্তাহের জন্যে নয়—অনির্দিষ্ট কালের জন্যে। হোটেল-বাড়ি তৈরির কাজে তার অনির্দিষ্ট সময় থাকবার কথা যে!

বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে সৌরভ ছিল সুদর্শন—ফিল্মস্টার হওয়ার মতই চেহারা। আর আচরণেও কোন ত্রুটি নেই—ইংরেজীতে যাকে বলে fair and square in dealings—সকাল-সন্ধ্যা যখনই দেখা হোক না কেন, অভিবাদন না করে চলে যেত না।

সকালেই সে সাইটে বেরিয়ে যেত, ফিরত সন্ধ্যার পর। তারপর অনেক যোগানদার-ঠিকাদার তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। মোটকথা সারাদিনই সে তার কাজে ব্যস্ত থাকত।

তবুও কিন্তু ফাঁক পেলে এবং সামনের বারান্দায় রাখা পৃষ্ঠ-সমন্বিত কাঠের বেঞ্চে আমায় বসে থাকতে দেখলে আমার কাছে এসে বসত, গল্পগুজব করত—ভেতরে থেকে চা এলে তাও পান করত।

এইভাবে সে আমার খানিকটা অন্তরঙ্গও হয়ে উঠেছিল। এই অন্তরঙ্গতা পুরোপুরি প্রকাশ পেল আমাদের ফিরে আসার আগের দিন, এবং তা অতিথি-নিবাসের বারান্দায় নয়—বীচে।

অধিকাংশ পর্যটকের মত আমরাও সন্ধ্যার মুখোমুখি—অর্থাৎ গরম বালি একটু ঠাণ্ডা হলে সোজা বীচে গিয়ে হাজির হতাম। বীচের এই অংশটা হলো দক্ষিণ-পূর্ব রেল-হোটেলের সামনাসামনি। সুতরাং অপেক্ষাকৃত নির্জন।

বীচে পেঁছুবার পর আমি সাধারণত বসেই থাকতাম এবং পরিবারের আর সবাই—স্ত্রী-কন্যা-জামতা-দৌহিত্রী স্বর্গদ্বার অভিমুখে পা বাড়াতেন। সেখানেই যে সব দোকান-পশার!

এমনিভাবে সেদিন বীচে বসে আছি—কি ভাবছিলাম মনে নেই, হঠাৎ দেখি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সৌরভ মোহতা।

—You are here!—সামান্য বিস্ময় প্রকাশ না করে পারিনি। উত্তরে সে বলেছিল মনে আছে, মাঝে মাঝে বীচে বেড়িয়ে তবেই সে গেস্ট-হাউসে ফেরে।

আমি আর কিছু বলবার আগেই সে আমার পাশে বসে পড়ে বলল : Let me sit for some time here, sir—বাদমে গেস্ট-হাউস যায়ুঙ্গা।

পাশে বসলেও সে কিন্তু কথাবার্তা সুরু করল না—সমুদ্রের দিকেই তাকিয়ে রইল। আমিও নীরব রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে সে আচমকা এক প্রশ্ন করে বসল : আচ্ছা, স্যার! এটা তো বে অফ বেঙ্গল, ইণ্ডিয়ান ওশানে গিয়ে মিশেছে। তাতে ওশান আপত্তি করেনি?

অদ্ভুত প্রশ্ন! বোধ হয় দার্শনিক গোষ্ঠীভুক্ত। প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ সৌরভের দিকে তাকিয়েই রইলাম। তারপর ব্যাখ্যা টেনে বের করবার জন্যে বললাম : What do you mean? I don't quite get you.

আমার প্রচেষ্টা সার্থক হলো—ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। একবার সামনের দিকে তাকিয়ে সৌরভ বলল : Then listen, sir.—সৌরভ মোহতা সুরু করল তার জীবন-কাহিনী—

সৌরভরা আর্কিটেক্ট অ্যাণ্ড বিল্ডার্স। সেই সুত্রেই তার ঐ বিজ্‌নিস্ হাউসের মালিকদের বাসস্থানে যাতায়াতের সুযোগ ঘটেছিল। তাঁদের বাসস্থানের কিছুটা সংযোজন-বিযোজন—অদলবদল হচ্ছিল, তাই ঠিকাদারি পেয়েছিল সৌরভদের ফার্ম। এবং

তদারকির ভার পড়েছিল সৌরভেরই ওপর।

অপরদিকে ঐ পরিবারের অবশিষ্ট অবিবাহিতা কন্যার ওপর অর্পিত হয়েছিল কাজ ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা দেখে নেবার দায়িত্ব। এইভাবেই দু-জনের মধ্যে আলাপ হয়েছিল। মেয়েটি শিক্ষিতা—লরেটোয় পড়াশুনো করত। আধুনিকাও বটে—জিনস্ পরত, বিউটি পার্লারে গিয়ে কেশবিন্যাস করে আসত, নিজে ড্রাইভ করতে জানত এবং করতও। তার আবরণ-আচরণে কোনরকম জড়তা ছিল না—really very smart she was.

আলাপের ফলে হলো ঘনিষ্ঠতা—তারা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল (অন্তত সৌরভের তাই মনে হয়েছিল)। দু-জনে একসঙ্গে রেস্তোরাঁয় যেত, স্ট্রাণ্ডে বেড়াত···কোন কোন দিন কলকাতার বাইরেও পাড়ি দিত।

সৌরভের কাজের দেখাশুনায় ফাঁকি পড়তে লাগল, মেয়েটিরও ওভারসিয়ারিংও অনুষ্ঠানে পরিণত হলো।—To cut a long story short,—বলেছিল সৌরভ,—I at least thought we had fallen in love···

প্রণয় তার পরিণতি খুঁজবেই। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। একজন স্ট্রাণ্ডে সৌরভ প্রস্তাবই করে ফেলল : এতদিন ত হলো, এবার let's be united—শাদির ব্যবস্থা করা যাক।

শুনে মেয়েটি কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল। তারপর করল অতি সংক্ষিপ্ত—একটি শব্দের এক প্রশ্ন : নিজেরাই?

—তাছাড়া আর কি?—বোঝাল সৌরভ,—জানতে পারলে তোমার বাড়ি থেকেই আপত্তি উঠবে। তোমার ঘরানা নিশ্চয়ই আমার খানদানে শাদি দিতে আপত্তি করবে।···

—খুবই সম্ভব,—যুক্তি মেনে নিয়েছিল মেয়েটি। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল : কবে শাদি করতে চাও? রেজেস্ট্রী করতে হলেও নোটিশ দিতে হয় শুনেছি।

—সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও,—বলেছিল সৌরভ,—নোটিশের বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে যাবে।···ধর পরশু যদি আমরা রেজেস্ট্রী করি? কালই আমি সব বন্দোবস্ত করে ফেলব—আমার এক দোস্ত এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

—ঠিক আছে,—জানিয়েছিল মেয়েটি।

—কিন্তু পরশু দিন তোমাকে পাব কোথায় ?

প্রশ্নের জবাব না পেয়ে সৌরভই নির্দেশ দিয়েছিল মেয়েটি যেন পরশু সকাল ১০টায় স্ট্র্যান্ডের এই জায়গাতেই হাজির থাকে, সৌরভ তার বন্ধুদের সঙ্গে এসে তাকে যথাস্থানে নিয়ে যাবে। বন্ধুরাই হবে সাক্ষী। মেয়েটি যদি সঙ্গে করে তার কোন বন্ধুকে আনতে পারে ত আরও ভাল—কন্যাপক্ষেরও একজন সাক্ষী থাকা সমীচীন।

—দেখবো,—সংক্ষিপ্ততম উত্তর দিয়ে সেদিন চলে গিয়েছিল মেয়েটি।

নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিস্ট দিনে কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা আগেই পৌঁছেছিল দলবল-সহ সৌরভ। ঠিক ১০টার সময় এল মেয়েটির কণ্টেসা ক্ল্যাসিক। গাড়ি থেকে কিন্তু মেয়েটি নামল না, নামল ড্রাইভার। মেয়েটি আসেই নি—(মাত্র) ড্রাইভারকে পাঠিয়েছে।

ড্রাইভার সৌরভের হাতে একখানা খাম দিয়ে বলল : বাঈ আপকো চিঠ্ঠি ভেজা।

তখনিই খামখানা খুলল সৌরভ। কারও লেটার-হেড নয়, সাদা কাগজে হিন্দিতে টাইপ করা চিঠি—কোন দস্তখতও নেই। চিঠির মর্মার্থ—

—আপনার প্রস্তাব আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। বাড়িতে আপত্তি উঠবে কিনা সে-প্রশ্ন অবান্তর। মোটকথা, দারিদ্র্যকে আমি মেনে নিতে পারব না। সুতরাং ব্যাপারটার এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটুক।

আর একটা কথা। এ নিয়ে আপনি কোন গোলমাল করবার বা স্ক্যাণ্ডাল ছড়াবার চেষ্টা করবেন না। আমাদের পরিবার তা মোটেই বরদাস্ত করবে না। এ চিঠির কোন জবাব দেবেন না। আর আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টাও করবেন না।

পড়া শেষ করে মুখ তুলে সৌরভ দেখে মেয়েটির ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে গেছে।

সৌরভের কাহিনী শেষ হলেও জিজ্ঞাসা না করে পারিনি : তারপর ?

—Nothing thereafter, sir, সৌরভ জবাব দিয়েছিল।

তারপরও অবশ্য কিছুটা ছিল যা সে বিবৃত করেছিল অতিথি-নিবাস যেতে যেতে—

সেদিনই সৌরভ তার কর্তাদের জানিয়েছিল যে তার পক্ষে আর ঐ বাড়ির নির্মাণকার্যের তত্ত্বাবধান করা সম্ভব নয়। সুতরাং নিযুক্ত হয়েছিল তারই একজন কাজিন। —না, কামটা বাতিল হয়নি—মেয়েটির বাড়ির কেউই হয়তো ব্যাপারটা জানতই না। তবে সৌরভ তার সেই কাজিনের কাছে শুনেছিল, মালিকদের পক্ষে কেউই কাজের তদারকি করত না।

তারপর সৌরভের ওপর পড়ল পুরীর এই হোটেল-বাড়ি নির্মাণের ভার। সেই থেকে সে আর কলকাতায় যায়নি—তা বোধহয় সাত-আট মাস হবে।

অতিথি-নিবাসে পৌঁছে সৌরভ সোজা তার ঘরের দিকে না গিয়ে গেল বাগানের দিকে। আমাকেও অনুরোধ করল সঙ্গে যেতে।

বসার পর সৌরভ হঠাৎ বলে উঠল যে সে ভাবছে এই পুরীতেই আস্তানা গাড়বার কথা—I think I would settle here.

—পুরীতে কেন?

—না, কলকাতা স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে, উড়িষ্যায় এখনও অনেক সুযোগসুবিধা—তাই ভাবছি,—বলল সৌরভ।

বুঝিনি তার মন-পরিবর্তন ব্যর্থ প্রেমের জন্যে, না কলকাতা সত্যিই স্যাচুরেটেড হয়ে যাওয়ার দরুন—যেমন হরিয়ানাভিমুখী চিৎলাঙ্গিয়াজী মনে করেছিলেন।

নির্ধারিত পরের দিনই আমরা চলে এসেছিলাম। সৌরভের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তার বাড়িতে দুবার ফোন করেছিলাম খবরের জন্যে। জেনেছিলাম সে পুরীতেই আছে—স্থায়ী, না অস্থায়ী ভাবে তা জানতে পারিনি।

হয়তো প্রায় দেড় শতক আগে দু'ভাই রামকুমারজী-শ্রীকুমারজী যে হাওড়া স্টেশনে এসে নেমেছিলেন সেই হাওড়া স্টেশন থেকেই যাত্রা করে এক মাড়োয়ারী যুবক সম্প্রসারণশীল ব্যবসা-কেন্দ্র পুরীতে গিয়ে অবস্থিত হলো। এখান থেকে সে নিশ্চয়ই আবার

নয়া ঘরানা বানাবার প্রচেষ্টা করবে। প্রচেষ্টা সফল হলে বঙ্গোপসাগরের জল সহজেই ভারত মহাসাগরে গিয়ে মিশবে—তখন আর মহাসাগরের কোন আপত্তি থাকবে না।

চিৎলাঙ্গিয়াজীরাও হয়তো গুরগাঁও-এর ঘর গুছিয়ে আবার কলকাতায় আসবেন লুপ্ত সমৃদ্ধির পুনরুদ্ধারে। সল্ট লেকে তাঁদের বাড়ি আধা-তৈরি হয়ে পড়ে আছে, সেইটেই হয়তো শেষ করে সেখানেই থাকবেন। তখন ত আর ছোট ফ্ল্যাটে কুলুবে না।

সেদিন অবশ্য চিৎলাঙ্গিয়াজী সল্ট লেকের এই বাড়ির উল্লেখই করেন নি, আমিও না। মন যে দু-জনেরই ভার ছিল।

—০—